হৃদয়ের খোঁজে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

হৃদয়ের খোঁজ

শ্রাবনী পূর্ণিমা। নদী প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। কোথাও মেঘ নেই আকাশে এক ফোঁটা। যেন রাতটা দিনের মতো। দিন বললে ভুল হবে এটা দিন নয়, রাতও নয়। দিনরাত কিংবা রাতদিনের কতটা সংমিশ্রণ বলাও যাবে না। কারণ সে গণিতজ্ঞ যেমন নয়, তেমনি প্রকৃতি বিশারদও নয়। তবে এই সংমিশ্রণ অদ্ভুত, যেটা মানুষকে ভাবতে, দেখতে ভাল লাগায়। বিশেষ করে মালভূমি নয় নদীর কিনারে। এখান থেকে দেখতে পাওয়া দূরে পাহাড় শ্রেণী রাতে যেন মনে হয় জননী সন্তানের শিয়রে বসে আছে, রাতের আলো আঁধারিতে। নদী বয়ে যায় ছল ছল শব্দে, বিশেষ করে নদী এখানে উচ্চগতি সম্পন্না। পাহাড়ের উপর বন্ধুর পথ তাতে নামছে। নদী জলে যেমন ছল ছলাৎ শব্দ তেমনি তরঙ্গে হাজারো চাঁদের ঝিলমিল। আরও অদ্ভুত লাগে ক্ষয়জাত জনস্ত পাহাড়ের হাজাব সৈনিকের উদ্ধত ভঙ্গিমা, যারা পিছু হটতে জানে না, উদ্ধত সৈনিকরা স্রোতের কাল প্রবাহে হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে, লেগে যাবে হাজার বছর, তবুও এখন নির্ভীক সৈনিক। কাল প্রবাহকে বাধা দিতে চায়। জায়গাটা আরও রমনীয় আরও মোহময় হয়ে উঠেছে কারণ অদূরে, সামান্য দূরে একটা বন মিশেছে নদীর কিনারে। বিংশ শতাব্দী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এই অরন্যও যেন ভীষণ তৃষগ্রর্ত। বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, মাটিতেও যেন নেই এক ফোঁটা রস বিংশ অথবা একবিংশ শতাব্দীর নগ্ন সভ্যতার রসে নিরস। গ্রামটা নদী তীরে, ওপারে পাহাড় আর বন এপারে গ্রাম, চার পাশে আছে বন, আর বনটা ঢালু পথ বেয়ে মিশেছে নদীতে। নদীর তীরে শ্মশান আর আছে গোটা চারেক বটগাছ। বটের নীচে শ্মশান। এখানে শেষ হয়ে গেছে কত অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়ীত মানুষেরা। অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়ীত বলার কারণ এরা ভীষণ নিঃস্ব। সভ্যতার আলো বোধ করি এখন সেখানে ঠিকমত পৌঁছায়নি। টর্চের আলোর মতো কখনও যদিও দুই এক ঝলক ঝলকায় — তাতেই এই গ্রামবাসীরা ধন্য। এখন প্রকৃতি মায়াময় মোহময় এই নদী কিনারে। ঘুম আসছে না কালু ভিখারীর। এই রাতে কি ঘুমানো যায়! এই রাতেই তো পরীরা স্নানে আসে নদীতে। একটু পর, আর একটু রাত গভীর হলে, পরীরা আসবে, জল কেলি করবে, হাসি গান নাচে ভরিয়ে দেবে নদী প্রান্তর। দড়ির খাটে শুয়ে শুয়ে দেখবে পরীদের অবগাহন স্নান, শুনবে

গান, নাচের ছন্দ ভরিয়ে দেবে অন্তর। যেহেতু একটু পর, অপেক্ষা করতেই হবে, না ঘুমিয়ে। চেয়ে থাকে রূপালী আকাশের দিকে মন ভেসে ভেসে যায় স্রোতের উজান বেয়ে, উপল বন্ধুর পথে। অতীতে, বর্তমানে ভবিষ্যতে। কি পেয়েছি, কি পাচ্ছি, আর কি পাইনি, আর কি পাব . . .। ভিখারী জীবনে শুরু ছিল শূন্য, শূন্য ভিক্ষার ধনে ভরিয়ে দিতে চায় ভিক্ষার ঝুলি। কালু ভিখারী শুধু কি ভিক্ষা নিয়েই যাবে, দেবে না কিছু। না কি সব ভিখারী শুধু নিয়েই যায়, দেয় না কিছু। কেউ কেউ দেয় না, আবার অনেকেই দেয়। অনেকে স্বপ্ন দেখে এই বৃহৎ জগৎ একটা বৃহৎ সংসারে পরিণত হোক . . . প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা ও চোখের জলের পবিত্র স্পর্শে। সোনা হয়ে যাক্ মানুষের মন - প্রেমপ্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, মায়া মমতার ভিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার মাঝে। ভুলে যেতে দাও- দেনা-পাওনার, লাভক্ষতির সূক্ষ্ম হিসাব। জীবনে যে হিসেবের খাতা মেলানো বড়ই কঠিন।

কালু, ভিখারী ছিল না। ভিখারী করে গেছে তার স্ত্রী জবা। ক'বছর আর ঘর করেছে, মেরে কেটে দুটো বছর। সন্তানের মা হতে গিয়ে, মারা গেল। ওর মাও হওয়া হোলনা, আর কালুরও বাপ হওয়া হোল না। বাড়ীতে মা, বাপ, দুই দাদা বৌদিরা, পিসিমা সবাইকে ছেড়ে সংসার থেকে সেও হারিয়ে গেল। জবা ছাড়া সংসারে কিছু ভাল লাগে না, সংসার অসার মনে হয়। কাজে যায় না। ভালভাবে খায়-দায় না। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। মা, পিসিমা, পাত্রী দেখতে থাকে। কেন জানি না জবাকে ছাড়া আর কোন মহিলাকে 'জবা' করতে চায় না। 'জবা জবাই'। ভালও লাগে না সংসারের রাজনীতি, কাজ না করলে কেইবা আর বসে খেতে দেবে। একটা চাকুরী হয়তো পেতে পারতো। পেটে তার বি.এ পাশের বিদ্যেও আছে। কিন্তু সে বিদ্যেতেও হয়নি ছোট স্কুলের একটা মাষ্টারী। তাই বাধ্য হয়ে নেমেছে কৃষিকাজে। কৃষিকাজেও মন লাগে না, আধা শিক্ষিত, আধা চাষার, মাঠে ফসল ফলাতে দাদাদের সাহায্য করতে না পারায় ঘরে অশান্তি। শেষে মাঠেই যেত না আর দাদা বৌদিদের টীকা টিপ্পনি শুনতে হোত। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হোত। একদিন সে অনুভব করে সে যদি গৃহ না ছাড়ে তাহলে সংসার টুকরো হয়ে যাবে, মা, পিসিদের কি যে হবে ভাবতেই পারে না। আর অহরহ শুনতে হচ্ছে তাকে লেখা পড়ার জন্যই সংসারের এই হাল। কিন্তু কালুর ভীষণ দুঃখ। কোন স্কুলে বেকারের ভরা কম্পিটিশিনে চাকরী না পাওয়ার জন্য। সাথে আবার আছে ঘুষের কম্পিটিশনও। কম্পিটিশনে সে হেরে যাচ্ছে। বুঝতে পারে। চাষও ভাল করতে পারে না। একটু বিদ্যে পেটে থাকলে কায়িক পরিশ্রম করা যে কত কঠিন যারা ভুক্ত ভোগী তারা একমাত্র জানে। চাকুরী পাওয়া যতটা কঠিন ততটাই কঠিন চাকরী ছাড়া অন্য কাজে নামা। বিশেষ করে কৃষিকাজে কিংবা অন্য কোন শ্রমে। তবে লেখা পড়া শিখেছে কিজন্যে, মাটিতে মলদ্বার দিয়ে মাটি ঢোকাবার জন্য? লেখাপড়া শিখে, কিংবা রাজনীতি করে, সংগঠন করে নিজেদের আরামে থাকার ব্যবস্থা যদি না করতেই পারলো তবে শিক্ষা কিজন্য? চাকুরী স্থলে কিংবা রাজনীতিতে সংগঠন ও রাজনীতি করে বোকাদের অর্থাৎ চাষীদের ও কর্মীদের না যদি ঠকাতেই পারলো তাহলে শিক্ষা কিসের, কিসের রাজনীতি? শোষক ও শোষিতের ধোঁওয়া তুলে সাধারণ মানুষকে শোষণ না করে, কিংবা মানুষকে স্বর্গের বাসিন্দা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নরকের পথে যদি

না. ঠেলে দিতে পারলো তাহলে রাজনীতি কিজন্য, শিক্ষাইবা কিজন্য . . .? জি. ডি. পি. কিংবা মূল্যমান সূচকের অর্থনৈতিক কারসাজি শুনিয়ে নিজেদের ডি. এ, বেসিক এসব বাড়িয়ে ছেলে বৌকে সুখে না রাখতে পারলে লেখা পড়া কিজন্য, রাজনীতি কিজন্য . . .? এভাবেই তো শোষক শোষিতের - সীমারেখা মুছে ফেলতে প্রয়াসী সকলেই। ডুবন্ত শ্রমিক, চাষাদের, কে বাঁচাবে? বাঁচাবার কেউ নেই। যারা ডুবছে তাদেরকে আরও ডুবিয়ে দিয়ে নিজে সুখে থাকবেন এটাই শিক্ষারই ফল আর রাজনীতিরই মূল লক্ষ্য এমনকি ধর্মেরও একই লক্ষ্য। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। এটাই এখন ধ্যান জ্ঞান। এটাই হাল হকিকৎ।

সংসার বাঁচাতে, সংসার ত্যাগ করে কালু। চোখে যত স্বপ্ন ছিল সবকিছু মুছে দিয়ে পথে নামে। পথই তাকে পথ দেখায়। হাতে যা ছিল তা দিয়েই, গেরুয়া ভেক্ ধরে। এখানেও রাজনীতি, শিক্ষানীতি - ভেক্ না ধরলে, ভিক্ষা পাওয়া যায় না। কালুর অলস প্রকৃতি তাকে আর একটা বিষয়ে পারদর্শী করেছে। বাঁশী বাজায় ভালই। বাঁশীতে তার নাম আছে। হাতে বাঁশী, পরনে গেরুয়া, কাঁধে ঝুলি, মানিয়েছে ভালই। কোঁচকানো চুল। এখন চুল ছোঁট। চুলটা বাড়লে, কাঁধ পর্যন্ত নামলে চুড়ো করে যদি চুল বাঁধতে পারে, তাহলে একবারে কৃষ্ণ। রংটা আবার চিকন কালো। রংয়ের সুখ্যাতি তার বহুদিনের। ঘোর অন্ধকারে তার অবস্থান পাওয়া শক্ত। সে ভাবছে সে কি কৃষ্ণ হতে পারবে? হতে মন চায়, পারবে কি? এতবুড়ো বয়সে চুড়ো করে চুল বাঁধতে পারবে কি? হাসি পায়। হরিতো কোন দিন বলতে শেখেনি। কি ভাবে 'হরিবল' বলবে ভেবেই পায় না, হরি না বললে কে আর কাঁড়া চাল দেবে। বাড়ী থেকে তো অনেক দূরে এসে পড়েছে। বাস থেকে নেমে দোকানে চা খায়। খিদেও পেয়েছিল। এখন থেকে খিদেকে একটু জব্দ করতে শিখতে হবে। বাসে একটানা একটা বাসে সে আসেনি, এসেছে দু'তিনটে বাসে, না হলে দৃষ্টিকটু দেখায়। একটা বাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা ভাড়ার আর কতটা না দিয়ে ভাল দেখায়। একটা বাসের কনডাক্টর বেশ খিস্তি দিল। মাথাটা মাটিতে মিশে যায়। ভিখারী হতে গেলে বোধ হয় সবার আগেই লজ্জাটা ত্যাগ করতে হয়। কনডাক্টরের খিস্তিতে নির্বাক থাকে, দৃষ্টি নীচে রেখে। অথচ মনের চোখে দেখতে পায় সারাবাস তাকেই দেখছে। টিপ্পনি কাটে "আজকাল কাজ করতে কেউ চায় না।" আবার একজন বলে "আমার সাথে যাবে গরু বাছুর দেখবে।" কালু চুপ করে থাকে - ওরা জানে না সে শিক্ষিত, আর কাজের ভয়েই সে বাড়ীছাড়া। ঘরেরই সে কাজ পারে না, সেকিনা অপরের চাকর হয়ে থাকবে। শুধু নীরবে হজম করে বাক্যবান। একজন বলে "রান্না বান্না করতে পার কি? তাহলে আমার সাথে চল, আমাদের মেসে থাকবে, হাতেও পাবে কিছু।" চোখে জল আসে, জলও পড়ে ভীড়ের মাঝে। লজ্জায় বার বার মাটিতে মিশে যায়। ভাগ্যিস বাসগুলো ভিড়ে ভর্ত্তি। সকলে মুখটা ভালভাবে দেখতে পায় না। এভাবেই বাস পালটাতে পালটাতে এই দোকানে। আন্দাজে বোঝে বাড়ী থেকে প্রায় কম করে একশ মাইলের উপরে এসে পড়েছে। বাসের টিকা টিপ্পনি এখনও কানে বাজছে। বাসের মধ্যে না থেকেও কানটা যেন গরম হয়ে যায়। যদি একটা কান অপর কানটা দেখতে পেত, তাহলে দেখতে কালো দুটো কানই লাল হয়ে আছে, তখনও। চা খেতে খেতে আলাপ হয় দোকানীর সাথে, বেলা দুপুর। কাছেই দোকানীর বাড়ী, এরপর তার দোকান বন্ধ করে,

বাড়ীতে খেতে যাবে। কালু বসে আছে বটের ছায়ায় সরু সরু শাল কাঠের বেঞ্চিতে। কি করা যায় ভাবছে। কোথায় যাবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে। দোকানী দোকান বন্ধ করলো, লোক বেশী নেই। ওর দোকানে একমাত্র কালুই আছে। বাড়ী যাওয়ার পথে কি ভেবে জিজ্ঞেস করে — "ভাই তুমি যে এখনও বসে রইলে?"

— কোথায় যাওয়া যায় ভাবছি!

— কেন তোমার ডেরা কোথায়?

— বুদ্ধি করে বলে, শুনেছিলুম এখানে কাছাকাছি একটা আখড়া ফাঁকা আছে।

— দাঁড়াও দাঁড়াও একটু ভেবে দেখছি। সেদিন কে বলছিল বটে, কাঁসাই নদীর ধারে একটা ফাঁকা আখড়া আছে। যে সাধু ছিল সে কোথায় যেন চলে গেছে। গ্রামটা এখান থেকে ক্রোশ দুই তিনেক দূরে। বনের মধ্যে পথ আছে। বিকেলে এখানে ছানা দিতে আসে এক গোয়ালা, তাকে ব্যাপারটা বলবে। তোমার তো ভাই - খাওয়া দাওয়া হয়নি এখনও। আমার সাথেই চল। আমি যা খাব তুমিও তাই খেয়ে নেবে চল।

— না আপনি খেয়ে আসুন। অসময়ে হঠাৎ গিয়ে আপনাকে অসুবিধেয় ফেলবো আবার।

— দেখ ভাই, গৃহস্থের বাড়ীতে পাড়াগাঁয়ে সব সময় দু'একজনের ব্যবস্থা হয়েই যায়। তুমি কিছু ভেব না। আমার স্ত্রী খুব ভাল, তোমাকে দেখেই ভাতে ভাত চাপিয়ে দেবে। কতক্ষণ আর লাগবে। বাড়ীতে সবসময় একসেট হাড়ি কুড়ি থাকে। রাঁধবে না বেঁধে দেবে!

— রাধারাঁধির দরকার নেই। আপনাদের হেঁসেলেই চলবে, এব্যাপারে আমার কোন বাছবিছার নেই।

— দেখুন, আলাদা রান্নার আমার সব ব্যবস্থা থাকে।

— ওনিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

আস্তে আস্তে দোকানীর পিছু নেয়। হাঁটতে হাঁটতে কথা হয় অনেক। কেন বৈষ্ণব হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সংক্ষেপে প্রায় সব কিছু সত্যিই জানিয়েছে। আসল কারণ বলেছে তার স্ত্রী জবার ও সন্তানের মৃত্যু। তাই সে বৈরাগী। আর বেশী কিছু জানায়না। দোকান থেকে বাড়ী মিনিট দশেকের পথ। গ্রামটাও ছোট তার মধ্যে চা এর দোকানীর অবস্থা মোটামুটি - একটা টিনের বাড়ী, একটা রান্নাচালা। বাড়ীটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দোকানী থাকে বেশ ভালই মনে হল। যত্ন সহকারে জল টল দেয়। স্নান সারা হয় একটা বাঁধে। এখানে সব গ্রামেই এক আধটা বাঁধ আছে। দুটো ডাঙ্গার মাঝে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়। ডাঙ্গার নীচে জমিতে চাষের জন্য অসময়ে জল পাওয়া যায় রবি চাষও ভাল হয়। বাঁধটা বেশ বড়ই। বেশ কালো জল আছে এখনও এই জ্যৈষ্ঠেতেও অনেকে স্নানে এসেছে - দোকানীর সাথে কথা হয় - সেই আখড়ার ব্যাপারে। মোটামুটি আলোচনায় বোঝা যায়, সেখানে থাকার অসুবিধা হবে না, তবে জায়গাটা শ্মশানের ধারে। একটু ভয় ভয় করে। আবার মনে হয় শ্মশানেই ভাল, শ্মশানে থাকলে, লোকেদের ভক্তি বাড়বে বই, কমবে না। তবে একটু ঐ ভুতের ভয়। সে ভাবে ভুত বলে তো কিছু নেই। মনের মধ্যেই ভুত। সাহস আনতে হবে, না হলে চলবে কেন? স্নান সারা হয়। বাড়ী ফিরে দেখে আসন পাড়া হয়েছে।

আসনগুলোও বেশ সুদৃশ্য, হাতে তৈরী করা, নানা ফুলে, পাখীতে ভরা। অজান্তে মুখ থেকে বের হয়, "আসনগুলো বেশ সুন্দর তো।" দোকানী জানায় তার বৌ-ই সেলাই করেছে। মনে পড়ে যায় জবার আসনগুলোর কথা। জবারও সেলাই ফোঁড়াই বেশ ভাল ছিল, টেন পর্য্যন্ত পড়েছিল। ভীষণ মিশুকে ছিল।

— কি এতো ভাবছেন, হাতে জল নিন।

— হ্যাঁ, বসছি। আপনি বসবেন না?

— ওগো আমাকেও এখানে একটা জায়গা করে দাও।

— দিচ্ছি।

বসার জায়গা হয়। দুজনেই একসাথে খেতে বসে, খেতে খেতে কথা হয়। দোকানী আবার বলে।

— জায়গাটা নদীর ধারে শ্মশানে। তবে ভীষণ মনোরম জায়গা - গোটা চার-পাঁচ বট গাছ। একেবারে নদীর ধারে। নদীতে সবসময় সাঁতার জল থাকে। গত বছর, একটা কুয়া দিয়েছে পঞ্চায়েত থেকে। জলের সমস্যা নেই। একটা খড়ের চালে ছিঁটে বেড়া ঘরে কালীঠাকুর আছে. আর ঠাকুরের পাশেই একটু সামান্য দূরে খড়ের ছিঁটে বেড়া তৈরী ঘর. মোটামুটি ভালই হবে।

— কালীঠাকুর আছে?

— কেন? অসুবিধে আছে?

— না অসুবিধে আবার কিসের?

— মনে করে ছিলুম. আপনারাতো সব কৃষ্ণ ভক্ত। কালী পুজোতে বাধা থাকতে পারে।

— যে কালী. সেই কৃষ্ণ, তফাৎ কোথায়?

— শুনে ভাল লাগলো, অনেকে আবার ঠাকুরের ব্যাপারে ছুঁইফিং করে।

— সেটা ঠিক নয়। আগেই বললুম, যে কালী, সেই কৃষ্ণ, শিব, দূর্গা সবকিছু। মায়ের ছেলে মায়ের কাছে থাকবে ভয়কি?

- না ভয়-টয়ের ব্যাপার নেই। আর ভূত-টুত সব কু-সংস্কার।

— ঠিক। ভয় করলেই ভয়।

— ভয় মনে।

— সেকথা ঠিক।

গল্পে গল্পে খাওয়া শেষ হয় পরম তৃপ্তিতে। দোকানী বৌ এর আতিথিয়তায় মুগ্ধ। ভদ্র মহিলার সাথেও কথা হয়। কথায় বোঝা যায় শিক্ষিতা ও মিশুকে। মহিলার মুখখানি করুণায় ভরে যায়। যখন শোনে সন্তান স্ত্রী বিয়োগের কথা। অনুরোধ জানায় আবার বিয়ের। কিন্তু কালুর স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা এখন অটুট আছে, সেটার সে মূল্য দিতে চায়। মহিলা বোঝে - স্ত্রীর গভীর ভালবাসাই তাকে বিবাগী করেছে। সেজন্য মহিলার একটা স্নেহের সঞ্চার হয়েছে। মহিলা বয়সে আনেক বড়, তাই তাকে কালু. দিদি বলে সম্বোধন করে। সম্বোধনে দিদি জামাইবাবু আরও আন্তরিক হয়। দিদি অনুরোধ করে জানায় তার স্বামীকে সব ঠিক করে পাঠাতে। না হলে রাতে এখানেই যেন নিয়ে আসে। ঠিক আছে বলে বেরিয়ে

পড়ে উভয়ে। মহিলা কালুকে বলে - অসুবিধে হলে চলে আসতে। আসার সময় একটা ভাল সতরঞ্চি দেয়। বেডিংপত্র কিছু নাই। সত্যিই তার বেডিং বলে কিছু নেই। সদ্য রাঙানো দুখানা কাপড়, দুটো পাঞ্জাবী, একটা গেঞ্জী, একটা গামছা। রাতেই সে বসন রাঙিয়েছে। ভোররাতেই সে বেরিয়েছে। এই তার প্রস্তুতি। হাতে মাত্র গোটাকয়েক টাকা। পথের সম্বল। এখন তার মনে হচ্ছে, পথই পথের সম্বল। বেশতো দুপুরের খাবারও জুটে গেল, বাসেও চলে আসা গেল, লজ্জার মাথা খেয়ে; সবচেয়ে পথের সম্বলসূত্র পাওয়া গেলে, পথের পরিচয়ে। যেমন এখন পাওয়া গেল দিদি জামাইবাবু। এরকম সম্বল - জব্বর সম্বল। যখন ওরা ফিরলো, তখন ওরা দেখতে পায় একটা লোক বসে আছে, আর দোকানের ধারে একটা সাইকেল ঠেসানো, সাইকেলে একটা বালতি। দোকানটা ছোট, দিনে কাটতি কেজি খানেক ছানার মিষ্টি। রাতে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি করে। সাড়ে সাতটার বাস চলে গেলে জায়গাটা একেবারে চুপচাপ। জনচার দোকানী থাকে। মোট গোটা আষ্টেক চা মিষ্টি ছোট মনিহারী ও সাইকেল সারাবার দোকান। আর একটা আছে যাত্রার যোগাযোগ কেন্দ্র। এখানে যাত্রার পাট করার জন্য সুরপাটি, যাত্রার মহিলা, ড্রেসের বাইনা নেওয়া হয়। সকালের দিকে ভিড় হয়। একটা মোড়ের মতো - এখানে মেন রাস্তা থেকে আর একটা রাস্তা অরন্য ভেদ করে রাইপুর দিকে গেছে। মেন রাস্তা বাঁকুড়া ঝিলমিল।

দোকানী জিজ্ঞেস করে, তোমাদের গ্রামের আশ্রমটা ফাঁকা আছে?

— কেন বলতো, শিবুদা?

— এই ভায়ার জন্য, বলছিলুম।

— নমস্কার - আপনিই থাকবেন?

— নমস্কার। হ্যাঁ আমিই থাকবো।

— থাকতে পারবেন তো, শ্মশানে?

— হ্যাঁ।

— মাস চার পাঁচ ফাঁকা পড়ে আছে। কালী ঠাকুরটা একটু জলও পায় না। ভালই হোল, ঠাকুরের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। দেখবেন দু'চার দিন পর যেন আবার ডেরা তুলবেন নাতো?

— তোমরা সব সহযোগিতা করলে উনি থাকবেন না কেন? আজকের রাতটা তোমাদের বাড়ীতে রেখে দিয়ে, পরেরদিন আশ্রমটাকে পরিষ্কার গোছ করে নিও। যতদিন ঠিক না হয়, ততদিন একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও। তোমার কথা তো গাঁয়ের লোক বেশ ভালো শোনে।

গোয়ালার ভাল লাগে প্রশংসায় - তাই সে উৎসাহিত হয়ে বলে থাকুন না উনি আমারই বাড়ীতে দিনদুই। আমি ছেলেদের নিয়ে সব পরিষ্কার করে ঠিক করে দিব। যতই হোক একটা মানুষ থাকবে তো। দেখবেন মশায় কালীমাকে একটু জল দেবেন।

— ওখানেই থাকবে আর মাকে দেখবে। তাছাড়া ওখানে মা ছাড়া আর কেউ নেই।

— নিন আর দেরী করিয়ে দেবেন না, অতটা পথ যেতে হবে। ছানাটা ওজন করে রেখে দিন। সাইকেলে, হেঁটে, চলে যাব মশায় অত চিন্তার কারণ নেই।

— তোমরা কথা বল, আমি ছানাটা ওজন করে নিই।

— দেখতে হবে না সবঠিক আছে। বরং বেশীই আছে।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

— তো, গোঁসাইজীর বাড়ী কোথায়?

— সাধুদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।

— যা বাবা, আমি কি পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করলুম? আর উনি বলছেন, পূর্বাশ্রম।

— আরে বাবা পূর্বাশ্রম সাথে আদি বাড়ীর ঠিকানা।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। সত্যিই তো সাধুদের আবার ঠিকানা।
দাঁড়াও বিড়ি খাই। আপনি খাবেন বাবাজী?

— না - আমি বিড়ি খাই না।

— অন্য কিছু খান?

— না অন্য কিছুই খাইনা। কোন নেশা নাই।

— ভালই হোল। তাহলে ওখানে মদ মাতালের আড্ডা হবে না। কি হোল শিবুদা?

— হয়ে গেছে, তোমার বালতিটা নাও। সাইকেলে কষ্ট করে যেও। অল্প একটু, হেঁটে যেও।

— চলুন গোঁসাইজী।

ওরা চলে গেল যাবার সময় শিবু অর্থাৎ দোকানী বলে অসুবিধা হলে চলে আসতে। পথের পরিচয়ে শিবুদা ও ওণার স্ত্রীকে কালুর অতি আপন বলে মনে হয়। পথ এখন মাইল চারেক পাকা রাস্তা। পরে বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সাইকেলে যেতে যেতে মাঝে মধ্যে, কথা বার্তা হয়। মিনিট পনেরো পরে একটা বাঁকে গোটা দুই তিন ঝুপড়িতে দোকান গজিয়েছে, দুটো চায়ের আর একটা সাইকেল সারাই এর। একটা মোড়ের মতো হচ্ছে। এখানে বাসের স্টপেজ, সারাদিনে, দুখানা বাস দু বার আসে যায়, এটাই একমাত্র ভরসা। এখানের সবই মরাম, রাস্তা বলতে দুপাশের মরাম কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তা আবার জমানো কাঁকর - পাথরের উপর দিয়ে চলেছে, সেখানে রাস্তা নেই, রাস্তা বলতে গাড়ীর গোল বা লিগ্। সাইকেল এখন ডাউনে। বেশ গড় গড়াচ্ছে। এরপর চড়াই শুরু হয়। সামনে ছোট টিলা। টিলার পাশ দিয়ে যেতে হবে। টিলার চুড়োতে গাছ পালা নেই। গোটা কয়েক বড় বড় কালো কালো পাথরের চাঙড় রয়েছে। আর চার পাশে শাল পিয়াল পলাশ মহুয়ার জঙ্গল। মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাসের ও সোনাঝুরির জঙ্গল। একটা ফাঁকা জায়গা। বিকেলের পড়ন্ত রোদের আভাটা এখন আছে। ওখানে ওরা পাথরের উপরে বসে একজন বিড়ি ধরায়। জায়গাটা অপূর্ব মনে হয়, কালুর ভাল লাগে পড়ন্ত বেলায় — ঘুঘুর ডাক, স্থানটার নির্জনতা আরও বাড়িয়ে তুলছে। কি মনে করে কালু টিলাটায় উঠতে থাকে। প্রায় ওঠার মুখে দূরে একটা নদী দেখা যায়। আর এখানে ওখানে দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। ওগুলোকে নীল দেখায়। পাহাড়গুলো যেন ঢেউএর আকারে সারিবদ্ধ। বেশ ভাল লাগে প্রাকৃতিক দৃশ্য মনভোলায়। নদীগর্ভে ক্ষয়জাত সাদা, কালোপাথরের সারিবদ্ধ রূপ তার মাঝেই ফাল্গুনের স্রোতের ধারা বয়ে যায়। কোথাও বালীর চড়া। ওপারে একটা বন এসে মিশেছে নদী কিনারে। একটা পাথরের উপরে বসে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ভাল লাগে বন্য প্রকৃতিকে।

সঙ্গী তাড়া দেয়। নেমে আসুন দেরী হয়ে যাবে? এখনও মাইল খানেক যেতে হবে। পথে নদী দেখতে পাবেন। আর পথেই আপনার ডেরা দেখতে পাবেন। অগ্যতা নামতে হয়। টিলার উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রূপ ভোলার নয়। সোনালী বিকেলে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তাকালে মনে হয় নীল সমুদ্র বিরাট বিরষ্ঠ ঢেউ নিয়ে কারও নির্দেশে স্তব্ধ হয়ে আছে। এরকম সমুদ্র আর কোথায় দেখা যাবে। স্কুলের হোস্টেলে যেখানে থেকে পড়তো সেখান থেকে একবার দীঘা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানের ঢেউ কত ছোট, এখানে কত বিরাট বিশাল, আর মৌনমুখর। অজান্তে, মৌনমুখর সমুদ্র কত কথা বলে। বলে আমারি মতো তোমরা তোমাদের জীবনে ধীর স্থির থেকো। আমারি মতো স্তব্ধ, অচল, অনড় হয়ে ধ্যান করে যাও সেই মহান সৃষ্টিকর্তার। টিলা থেকে নেমে ওরা হাঁটা দেয় কিছুটা উঁচু পথ বেয়ে উপরে উঠে, পরে ঢালু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে। পথ, মাঝে মাঝে যেন হারিয়ে যাচ্ছে ছোট শাল ও কুটুসের বনে। পথের পাশে ছোট শাল গাছের নরম ডগা দিয়ে পা আটকে দেয়। মনে হয় ওরা বলে যেতে নাহি দিব। বলে যেন এখানেই থেকে যাও, আমাদের সাথে। সত্যিই কালুর জায়গাটা ভাল লাগে। ওখান থেকে যেতেই মন চায় না। যেতে তো হবেই। মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব না! সমাজে না থাকলে চলবে তার কেমন করে। যদিও বর্তমান মানুষের মতো নিঃসঙ্গ আর কেউ নেই।

আর মানুষ নিজের সুখের জন্য কেঁদে আকুল। বিশেষ করে যখন টিভির পর্দায় চোখ রাখে। তাদের টিভি ছিল না। লোকের বাড়ীতে দেখতে যেতো। ডিডি ওয়ান, কেবল এখনও ঢুকেনি। রাতের টিভি চ্যানেলে হিন্দি সিরিয়াল দেখতে দেখতে মনে হয় গল্পের প্লট নেই বিশ্বজগতে শুধু রাজনীতি, বন্দুক, রিভলবার, গুলি আর হত্যা ছাড়া। কথায় কথায় খুন জখম। আর মনে হয় সব সময, টিভি দেখতে দেখতে কাপড়ের দাম আকাশ ছোঁয়া, তা নইলে মহিলারা এতো কম পোশাকে থাকে কেন? কিংবা ওদের গায়ে অ্যালার্জি বের হয় বস্ত্রে। হয়তো বা অন্য কিছু ব্যাপার আছে, চলমান সভ্যতার মাপকাঠির বিষয়ে, যত বস্ত্র কম তত বেশী সভ্য। যত বেশী গুলিগালা তত বেশী সুখ ও শান্তি। শান্তির সূচক গুলিগালা, কম বস্ত্র। মনে হয় যেন ছেলেরা রিভলভার নিয়েই জন্মাচ্ছে। সত্যিইতো কথাটা পদের পদে সত্যি, সভ্যতার মাপকাঠির ব্যাপারে তাইতো ওরা জন্মের সময় কোন বস্ত্র না নিয়েই জন্মায়। তাই হয়তো টিভিতে আমরা এই সব দেখি। মেলায় দেখি। মেলার দোকানে ছেলেরা বিভিন্ন শব্দে বন্দুক ও রিভলভার কেনায় ব্যস্ত সত্যিই রাজনীতিবিদরা ও ব্যবসায়ীরা কি খেলায় মেতেছে কে জানে। টিভি চালায় ওরা, ওদের স্বার্থ দেখতে হবে বৈকি। তাতে সমাজ, সংসার ধ্বংস হয় ক্ষতি নেই, ব্যবসা তো রমরমিয়ে চালাতে হবে বাণিজ্যিক অ্যাড্ভার্টাইজের স্পনসর্ড করা ছবির মাধ্যমে। সরকারকেও টিভি চ্যানেল চালাবার পয়সা লাগবে না বরং এতে সরকারের দু'পয়সা আসবে। যেমন চলছে "ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।" ঘরে ঘরে বেকারদের জন্য কর্ম সংস্থান মদের দোকানে লাইসেন্স। সরকারের বুদ্ধি আছে দেশের মানুষগুলোকে এমন শান্তিতে রাখার পথ আর আছে কি?

— কি সাধুবাবা - কথা বলছেন না কেন?

আনমনা থেকে বলে বেশ ভাল লাগছে গাছ গাছালি দেখতে।

— তা বটে এই জায়গাটাতো বেশ সুন্দর। এছাড়া, বন, নদী এখান থেকে নদীটাকে

কত সুন্দর দেখায়। আমার ভালো লাগে এই জায়গাটা। এদিকে যেতে যেতে মনটা উদাস হয়ে যায়।

— আমার মনে হচ্ছে, গাছ গাছালি প্রকৃতি বলতে চাইছে চুপ্। আমাদের ধ্যান ভঙ্গ হবে পাহাড় ধ্যান গম্ভীর, গাছেরাও দেখাদেখি একপায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান মগ্ন।

— আসুন সাইকেলে চড়ি। এবার বেশ ঢালু।

— না চলুন না হেঁটে হেঁটেই যাই। এসব দেখতে দেখতে হাঁটতে খুব ভাল লাগছে।

— তবে চলুন। আর অবশ্য বেশী দূর নয়। সন্ধ্যের আগেই পৌছে যাব, আপনার ডেরায়। দিনের আলোয় ডেরাটাকে দেখে নেবেন।

পথ চলতে চলতে অনেক কথা হয়। বাড়ীর দেশের, বাস পথের এবং এই পথ ধরার কারণেরও। যখন স্ত্রী জবার কথা আসে তখন বেশ আনমনা হয়। পথে একটা সাঁওতাল গ্রাম পড়বে, গাঁয়ের গ্রাম্য দেবতারও স্থান দেখা দিল। শাল গাছ ঘেরা, আর শাল গাছ গুলো, বিশাল মোটা, এরকম গাছ কোথাও দেখেনি। শালগাছ যে এত মোটা হতে পারে সে কোন দিন ভাবেই নি। গাঁয়ের দুপাশে বাড়ী। গিরিমাটি আর খড়িমাটি নিকানো, তার সাথে খড় পুড়িয়ে কালো রংয়ের রাঙানো মেঝে পিঁড়ে যেন কালো সিমেন্ট বাঁধানো। দেওয়ালে হরেকরকম নক্সা, যেন যামিনী রায়ের আঁকার মতো। মনে হয় যেন এগুলোই শান্তির নীড়। পথের পাশে পাশে ছাগল, গরু, মহিষ বাঁধা আছে। মাঝে শুয়োরও দেখা যায়। পিছন ফিরে আবার দেখতে ইচ্ছে হয় বিরাট বিশাল শাল গাছগুলোকে, মনে হয় যেন হাজার হাজার বছর ধরে গ্রাম্য দেবতাকে প্রহরীর মতো পাহারা দিয়ে চলেছে। তারপর মনে হয়, গাছগুলোকে গ্রাম্য দেবতাই নিজের প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রেখেছেন কালের যুদ্ধে।

গোয়ালা বাবুর তো নামটাই জানা হয়নি। নাম গোপাল ঘোষ। নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারে। কালু তাকে ডাকে - গোপাল বাবু না বলে গোপাল দা বলে। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। বয়সে তো আট দশ বছরের বড়। পথে বেরিয়ে এই আত্মীয়তার সম্বোধন পথিককে অনেক সহায়তা দেয়। গোপালদাও কালুকে ভাই হিসেবে মেনে নেয়। পথ চলেতে চলতে ওরা এখন তুমিতে এসেছে। নানা গল্পের মাঝে নদী কিনারে পৌছে যায়। ওরা হেঁটেই চলেছে, একটু হাঁটতেই একটু দূরে একটা বিশাল ঝোপ দেখা যায়। ওরা যে পথে হেঁটে চলেছে সেটাও বনের মধ্যে দিয়েই। একটুপর দেখা যায় গোটা চার পাঁচ বট গাছের সমাবেশ। একটা বটগাছের নীচে একটা দাওয়ায় উঁচু খড়ো ঘর দেখা যায়। গোপাল বলে এইটা আমাদের কালী মন্দির। এখানেই মা সারা বছর থাকে। আখড়ার হারু বাবাজীর চলে যাওয়ায় নিত্যি সেবা হচ্ছে না। এতে গাঁয়ের অমঙ্গল হচ্ছে। আর একটু দূরে অপর বট গাছের নীচে আর একটা খড়ো ঘর। ওটাই হারু বাবাজীর আশ্রম ছিল। একটা দড়ির খাট ঠেসানো রয়েছে। দরজাটা শিকল দেওয়া। বাড়ীটা নদীর দিকে মুখ করা। বাড়ীটা একেবারে তীর ঘেসে, হাত কুড়ি গেলে প্রায় একতাল গাছ নীচে নদী গর্ভ। এখানটাতেই পাড়টা খাড়া, অন্যত একটু দূরে ঢালু, আর ঢালু জায়গাটাতেই নদীতে নামার পথ। কালী মন্দিরের পাশে একটা কুয়ো রয়েছে প্লাটফরমটা বাঁধানো, দেখে বোঝা যায় বেশী দিন হয়নি। টিউবওয়েল এখানে হয়না, মাটিতে পাথর থাকায়। এখানেও বিশত্রিশটা শাল গাছ

রয়েছে, তবে আগের গ্রামের থানের মতো এত বিশাল মোটা নয়। তবে মোটা। পাশে কয়েকটা জমা আর টগরের গাছ রয়েছে। গাছটা বেশ বড়ই। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। লাল লাল ফুলে ভরে আছে জবা ফুলের অন্য গাছটা। ফুল দেখে পূজার বাসনা জাগে ব্রাহ্মন.সন্তান, কালুর। আর একটু দূরে পথের দুটো বটগাছের নীচে শ্মশান, শ্মশানটা শ্মশান হয়ে আছে, ছেড়া কাঁথা কাপড়, আর হাড়ি কলসীতে। গাটা ছম্ ছম্ করে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ বেশ ভাল লেগে যায় কালুর। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে ফিরে আসে সেখানে, থাকার বাড়ীটার নিকট। শ্মশান টাকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে, কালী মন্দির পাশাপাশি। সবচেয়ে ভাল লাগে আস্তানাটা: দাওয়াটা বেশ উঁচু। কাছেই কালো কালো পাথর নিয়ে মাটির সাথে গাঁথা দেওয়াল সহ দাওয়া। খড়ের ছাউনি। খড়ের ছাউনিটা অর্ধেকটা ঘর বানানো হয়েছে, আর অর্ধেকটাতে পিঁড়ে, পিঁড়েতে উনুনও রয়েছে। সে স্থির করে বৃষ্টি বাদল ছাড়া কোনমতেই রান্না করা চলবে না পিঁড়েতে। পিঁড়ে থেকে দেখা যায় কংসাবতীকে বা কাঁসাই নদীকে। সুন্দর প্রকৃতি তাকে মুগ্ধ করে।

— ভাই কালু কেমন দেখলে?

— ভালই তো, তবে নির্জন বড্ড বেশী।

— সেটাই সমস্যা, একা থাকা মুসকিল, একা থাকতে পারবে তো?

— পারতে তো হবেই।

— তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, রবি খোঁড়াকে থাকতে বলবো, তুমি চারটি খেতে দিও। তাহলে ও আর কোথাও নড়বে না।

— সেই ভাল।

— রবিখোঁড়া আর জন দুই ছেলেকে পাঠাবো, তুমি সব গোছগাছ করে নিও। পুরোনো রান্নার হাঁড়ি ব্যবহার করতে হবে না। আমি নতুন সবকিছু আনিয়ে দেব। বাড়ী যাই।

গল্পে গল্পে বাড়ী ফেরে। সাদরে ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। বসতে দেয় একটা চেয়ারে। এদের যৌথ বাড়ী। বাবা কাকারা তিনভাই এক সাথেই থাকে। বাবাই কর্ত্তা। মেজকাকা, ছোটকাকা, বাবা সকলেই আসে। সাথে কাকীমারা, মা, ছেলেরা হাজির হয়, বৌরা উকি দেয় রান্না ঘর হতে। সকলেই অনেক কিছু জানতে চায়। বোধ হয় - বয়স বেশী নয় বলেই, আগ্রহ আরও বেশী। গোপাল ই বলে মোড়ের দোকানী শিবুদাই পাঠালেন। আশ্রমটা খালি আছে। মা কালী যদি একটু জল পায়। তাই আনলুম। তারপর ব্রাহ্মণ। ভালই হোল। বাবা, কাকারা বলে ওখানে ও একা থাকতে পারবে তো?

— জানলে মেজকা আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

প্ল্যানটা হচ্ছে - রবি খোঁড়াকে যদি এরসঙ্গে জুঁটিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে ভালই হয়। খোঁড়াটারও ভাল হবে, একাও থাকতে হবে না।

মেজকাকা — গোপাল তুই ঠিক বলেছিস, বাবাজীর তো বয়স বেশ নরম।

ছোটকাকা — কে বলে গোপালের মাথা নেই।

— তোমরাই শুধু বল, আর বলে মা কাকীমারা।

ছোটকাকীমা মাকে চুপি চুপি কি বললো।

মা তক্ষুনি — বাবাজীকে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে দে, পরে কথা বার্তা হবে। ও বাপ তুমি হাত মুখ ধোও। একটু জল টল খাও।

বাবা — হ্যাঁ, হ্যাঁ - তুমি বাবা কুয়োতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে - জল টল খেলে কথা বার্তা হবে।

সেজকাকা —রাতের সেবার ব্যাপারে কি হবে?

ছোটকাকা — হ্যাঁ বাবা, তুমি রাঁধতে পারতো? ব্রাহ্মণ মানুষ? আমাদের রাঁধা তো চলবে না।

ওদের আলোচনায় - চোখে জল আসছিল। ওরা ওর অন্তরকে নাড়া দিচ্ছে। যেন তার ব্যথা বেদনা কষ্টকে ভাগ করে নিতে চাইছেন। এতক্ষণ যে ছিল শ্রোতা, পরিবেশ তাকে নীরব দর্শক করেছিল মাত্র। এদেরকে মন সহজেই আত্মীয় বানাতে চায়। তাই সে বলে —

— কাকু সত্যিকারের আমি রান্নাবান্না ভাল জানি না। আপনাদের বাড়ীতে যা রান্না হবে সেটাই আমার পরমান্ন। ওনিয়ে ভাববেন না। আমি জাত-পাত অতশত মানি না।

মেজকাকা — দেখবাবা আমরা ব্রাহ্মণ নই, আমাদের ছোঁয়া রান্না কি ভাল?

মেজকাকীমা মায়ের কানে কানে কিছু বললো।

মা বললেন তুই ঠিক কথা বলেছিস মেজো - ওতো আমাদের গোপাল, নবীনের মতোই তো, আমরাই রেঁধে দিচ্ছি মাজা বাসন পত্রে। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

গোপাল ওকে হাত মুখ ধুতে জল তুলে দেয়, ও প্রথমে বাধা দেয়, বাধা শোনে না। অগত্যা গোপালের তোলা জলে হাতমুখ ধুতে হয়। হাত মুখ ধুয়ে বসতে না বসতেই মণ্ডা ও জল দেয় ছোট কাকীমা। একটু পর সকলের জন্য চা করে আনে সেজকাকীমা। চা খেতে খেতে গল্প জমে উঠেছে। আলোচ্য বিষয় কালুর থাকার জায়গা আশ্রমটাকে নিয়ে। আগামীকাল সকালে একটা মেয়ে কামিন নিয়ে, মেজকাকী, গোপালের মা সব ঠিক ঠাক করে দেবে। পারলে গোপালের বাবাও যাবে বলেছে। সকালে রবি খোঁড়াকেও খবর দিতে হবে। বাড়ীতে যেন একটা উৎসবের প্রস্তুতি মনে হয়।

গোপালের বাবা এক সময় প্রশ্ন করে — বাবা - কতদিন তুমি সাধু হয়েছো।

কালু নীরব থাকে।

গোপালের মা — আমাদের এতসব কি দরকার?

মেজকাকা — সত্যিই তো, আমাদের অতশত জানার কি দরকার? তার চেয়ে বাবুর অসুবিধাগুলোর কথাই ভাবতে হবে। ঈশ্বরের কখন কি ইচ্ছা হয় একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

— সেটা ঠিক। তবুও কি মনে করে মুখ থেকে এসে গেল। তুমি কিছু মনে করো বাপ। গোপাল যখন নিয়ে এসেছে দায় তখন আমাদের। তুমি কোন চিন্তা করো না।

মেজদা — গাঁয়ের বংশী ও রামচরণ খুড়োকে একটু জানিয়ে দেবে। কারণ ওদের জানানো দরকার। ওরা তো গাঁয়ের মোড়লের মতো।

— ঠিক আছে তুই গিয়ে ওদের বলে আয়। গোপালের মা, আমি আর মেজ বৌমা গিয়ে সব ঠিক করে দিয়ে আসবো। রবি খোঁড়াকে একটু খবর দিয়ে আসবি।

— মেজদা, বড়দা ঠিকই বলেছে। কাল সকাল থেকে রবি খোঁড়া কাজে লেগে যাবে।

— কমল! তবে, তুই ওদের খবর একবার দিবি, আর যদি আসে ডেকে নিয়ে আসবি।

— বড়দা তুমি ঠিকই বলেছ। পারলে কমল, ওদের ডেকে নিয়ে আসবে।

গোপালের মা — বাবা তুমি মুড়ি খাও।

— না মা, মুড়ি খাব না। খিদে নেই সেরকম। আজ দুপুরে খেতে একটু দেরীই হয়েছিল।

মেজকাকী — দুটি খাও বাবা - রাত অনেক হবে।

— না কাকীমা। খিদে নেই। আপনারা যে রকম করছেন আমার খারাপ লাগছে।

গোপালের মা — এক কাজ কর মেজো। বড় টিনের হাঁড়িটা চাপা ওতে বাড়ীর সকলের জন্য চালে ডালে চাপিয়ে দে। বেশী দেরী হবে না।

মেজকাকীমা — তরকারী কপির ঝাল আর তিল বাঁটা, আলু ভাতে।

গোপালের মা — তিল বাঁটা ভালই হবে। তবে কোন কিছুতেই পিঁয়াজ দিবি না।

কালু — আমার কোন কিছুতেই বাছ বিচার নেই।

গোপালের বাবা — সেই ভাল, এখন থেকে কত আর বিধি নিষেধ মানবে বাবা, এখন কি আর তোমার বৈরাগী হবার সময়।

মেজকাকা — ঠিক কথা।

এদিকে গোপালের ঠাকুমা নড়বড়ে শরীর নিয়ে উঠে এসেছে। কেউ লক্ষ্য করেনি। ছোট নাতনী, ছোট ছেলে কমলের পনেরো বছরের মেয়ে খবরটা দেয়। বাতের কষ্টকে উপেক্ষা করে দেখার ইচ্ছা। যদিও নাতনীর মুখে শুনেছে, দেখতে ভালো - রংয়ে কালো। যেখানে কালু বসে আছে সেখানে এসেই হাজির হয়ে বলে - কৈ ভাই, আমাদের কালাচাঁদ! কালু একটু হকচকিয়ে যায়, পরে সামলে নিয়ে বলে, আমিই কালাচাঁদ ঠাকুমা, বলেই বসে বসেই একটা প্রণাম সেরে নেয়।

— কি করলে ভাই, আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না। একে ব্রাহ্মণ তার উপরে আবার সাধু। এত পাপ রাখবো কোথায়?

— না ঠাকুমা, এতে পাপটাপের কিছু নেই। আপনিও গোপালদার ঠাকুমা। ঠাকুমাকে প্রণাম করবো না তো আর কাকে করবো।

— ভাল করে একটু বসুন, গল্প করি।

ঠাকুমাও কাছে বসে একটু পরে কালুর পায়ে কখন মাথা রাখে কালুকে বুঝতে দেয় না। কালুও হাত দুটো ধরে ঠাকুমাকে তুলে বলে - একি করছেন?

— তুমি কি করলে ভাই। তুমি কি আমাকে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারলে খুশী হও। বামুন বলে কথা - তোমার প্রণাম আমার সহ্য হবে। প্রণামটা ফেরৎ দিলে তবুও কতকটা পাপ কমবে।

সকলেই খুশী কালুর ঠাকুমাকে প্রনামে। এতদিন অশিতিপর বৃদ্ধার বাধায় একটু বিচলিত হয়। কিন্তু প্রণামের ব্যাপারটা সকলেই ভাল মনে নিয়েছে। এতক্ষণ একটু একটু করে কালু ও ওরা অন্তরের কাছাকাছি আসছিল। হঠাৎ কালু একেবারে জোর করে কপাটখুলে তাদের অন্তরে প্রবেশ করে। সকলে ভাবছে ছেলেটা কত ভাল। ব্রাহ্মণ হয়ে একটা গোয়ালার বুড়ি মাকে প্রণাম করলো। গোপালের সকল আত্মীয়ের চোখে জল এসেছিল। চোখগুলো চিক্

চিক্ করছে। গোপালের বাবা বড়কর্তার মনে জীবনে বিশাল পাওয়ার আনন্দ। মাকে সম্মান মানে সংসারের সকলকেই সম্মান জানানো। গর্বে বুক ভরে যায়। সংসারে সম্মান ও স্নেহ ভালবাসার মধ্যে একটা আত্মগরিমা লুকিয়ে থাকে সবসময়।

গোপালের ঠাকুমা — আমার কালাচাঁদের বয়েস তো কম মনে হচ্ছে। কি এমন হোল যে এবশ ধরলে?

গোপাল — কিছু হয়নি এমনি হয়েছে!

— তুই বোকা বলে, আমিও বোকা। কিছু একটা হয়েছে।

আমি কম দেখলুম না, এই চারকুড়ি বছরে!

কি দাদু বল!

গোপাল — বললুম তো এমনি।

কালু — বলছি ঠাকুমা। তোমাদেব না বললে কাদের বলবো।

জান ঠাকুমা, তোমার নাত-বৌ-ছেলের মা হতে গিয়ে মারা গেল। খোঁকা হয়েছিল। সংসারটা অসার মনে হল। তাই সংসাব ছাড়লুম।

ঠাকুমা — আহারে, ছেলেটাও বাঁচলো না। কি আর করবে ভাই, এটা ভগবানের খেলা। কাকে কখন হাসায় আবার কাকে কখন কাঁদায়, কেউ বলতে পারে না। দুঃখ করো না সবঠিক হয়ে হয়ে যাবে। তোমাকে এবেশে সাজিয়েছে এটাও তারই ইচ্ছে। দুঃখ করো না ভাই। ছেলে, গোপালের বাবা কাকাদের উদ্দেশ্য করে বলে ওরে সুবল, বলাই, কমল তোরা আমার কালাচাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিস্। খুব ভাল! তাই দিন চার আগে দেখছি, শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেছি। শালগ্রাম শিলা নয় একেবারে আমার কালাচাঁদ হাজির হয়েছে। তোদের মহা ভাগ্যি।

সকলের চোখে জল আসি আসি করছিল, কালুর আত্মীয় বিয়োগের কথা ও প্রণামে। এবার আর জল না এসে পারলো না শালগ্রাম শিলার কথায়। এক অনাবিল আনন্দ ধারায় সংসারটা ভাসছে। এতো সুখ সংসারে যে থাকতে পারে বর্তমান নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে কেউ ভাবতেও পারে না। সত্যি এতো সুখ কোথায়? জনারন্যে যে সুখ আছে তাকি আছে নির্জন মরুতে। সেখানে ছায়া নেই, শান্তি নেই, নেই সত্যিকার হৃদয়, যা চায় সেখানে কোন কিছুই নেই। কিন্তু দূর্বার গতিতে আমরা এগিয়ে চলেছি সেই মরুতে। অনন্ত পিপাসা নিয়ে সেখানে বাঁচা - পিপাসা মিঠবে বলে মনেও হয় না। কিন্তু পিপাসা মেটেও না। শেষে প্রাণহীন শরীর নিয়ে বেঁচে মরা। যে শরীরে স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা, পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া কিংবা পরের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলা নেই পরন্তু সেখানে আছে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, আছে নিজের জন্য সুখ সুখ করিয়া কাঁদা . . .। সেই শরীরে জীবনের কোন চিহ্নই নেই। দুই সংসারের মধ্যে যেমন, দুই জীবনের মধ্যে যেমন তেমনি দুই চোখের জলের মধ্যেও আকাশ পাতাল ফারাক। এসকল কথা কেন জানি না। কালুর শরীরে মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কালু নিজেও জানে না। বোধ করি তার অবচেতন মনে, বাবা, কাকা, জেঠা ও তাদের ছেলেদের ও আত্মীয়দের হৃদয়হীন তিক্ততার সম্পর্কই রূঢ় বাস্তবকে চিনিয়েছে।

এমন সময় বংশী ও রামচরণ হাজির হয়, সাথে রবি খোঁড়া।

মেজোকাকা বলাই ওদের সম্ভাষণ জানায়, এসো রামচরণ খুড়ো, এসো বংশী।

রামচরণ — কি ব্যাপার বল দেখি।

গোপালের বাবা — তুমিতো শুনেছ, কমলের মুখে।

রামচরণ — তা শুনেছি, কোথায় বাবাজী?

কালু —- নমস্কার জানিয়ে বলে, আমি আপনাদের বাবাজী বা সাধুজী নই, আমি আপনাদের কালুভাই।

বংশী — আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, তোমার কথা মধুর মতো শোনাচ্ছে। আমার সত্যি ভাই নেই। তাহলে তুমি ভাই-ই হোলে।

রামচরণ স্বগোক্তি করে — ভাল।

গোপালের মেজোকাকা — শুধু ভালই নয় ছেলেটা, খুবই ভাল। জান রামচরণ খুড়ো মাকে - পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো, ব্রাহ্মণ হয়ে - সাধু হয়ে।

গোপালের বাবা — শ্মশানের আশ্রমটাতো ফাঁকা হয়েই আছে, তাই বলছিলুম ওখানেই থাকতে। মা কালী প্রতিদিন জল পেতেন ব্রাহ্মণের।

রামচরণ খুড়ো — ভালই তো। মা কালীই হয়তো জুটিয়ে দিয়েছেন।

বংশী — আমারো যেন তাই মনে হচ্ছে। তবে ভাইএর বয়স বড্ড বেশী কম। থাকবে কি?

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল গোপালের ঠাকুমা - সে এবার বললো - আমাদের কালাচাঁদকে কে ছাড়ছে, ছাড়লে তো যাবে। আহা বেচারা মনে অনেক কষ্ট নিয়ে বৈরাগী হয়েছে। আমরা যদি না ছাড়ি?

রামসুন্দর খুড়ো —- ধরে বেঁধে কি রাখা যাবে?

ঠাকুমা — ধরে বেঁধে কি রাখা যায় ঠাকুরপো? রাখতে জানতে হয়। যেমন বেঁধে রেখেছি এই সংসারটাকে। দুবেলা কম করে চল্লিশটা পাত পড়ে। গাঁয়ের সকলে ভালবাসলে ওরঘাড়কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রামচরণ বলে হুঁ! কথাটা ঠিক? কিন্তু বয়েস যে কম।

ঠাকুমা — বয়েসে কিছু যায় আসে না। মনটাই আসল। সত্যিকারে মনে বৈরাগ্য যদি একবার এসে যায় তাহলে সংসারে ফেরানো ভীষণ কষ্ট। মন বলছে কালাচাঁদ পারবে।

গোপালের বাবা — মায়ের শালগ্রাম শিলার ব্যাপারে জানিয়ে বলে - মা ওকে তো কালুবাবাজীকে কালাচাঁদ বানিয়ে ফেলেছে।

ঠাকুমা -- ঠাকুর পো — কালু আর কালাচাঁদ কি ভিন্ন? এবারে বাড়ীর সকলে হেসে ওঠে হো হো করে। সাথে সাথে চোখগুলো চিক্ চিক্ করে ওঠে আনন্দে।

রান্না ঘর থেকে মহিলাদের হাসি শোনা যায়। ওরা রাঁধছে কিন্তু কান আছে, এখানে।

রবি খোঁড়া — স্থির না থেকে বলে - জেঠিমা যা বলেছে তার ধারে আর গাঁ নেই। [illegible] যাবে।

রামচরণ খুড়ো —- তুই থাকবিতো ওখানে?

রবি খোঁড়া —- কেন থাকবো না। আমি কুকুরের মতো সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। না হয় বাকি ক'দিন কালুদার কাছেই থাকবো। জায়গাটা আমার ভীষণ লাগে। কিন্তু

একা বলে থাকতে ইচ্ছে হয় না, ভয় ভয় করে। কিন্তু দুজনে আর একা নই। আরতো স্বয়ং মা কালীতো আছেই। মা থাকবে আবার কি ভয়।

কালু একবার রবিকে দেখলো, বাইরে থেকে বোঝা যায় না খোঁড়াবলে।

— যখন বাড়িতে ঢুকলো তখনই দেখেছে লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে চলতে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছিই হবে।

তারপর কিছুক্ষন পরে কালু বলে — রবি দা, তাহলে কাল থেকেই মায়ের সেবাতে লেগে পড়। দু'ভাইয়ে মিলে আমরা মায়ের সেবা করবো।

রবি খোঁড়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

রামচরণ খুড়ো বলে — কিরে রবে! চুপ করে আছিস কেন?

রবিখোঁড়া — আমার কথা বের হচ্ছে না।

রামচরণখুড়ো — কেন রে?

রবিখোঁড়া — গাঁয়ে তো ভিখ করতে বেরোলেই কষ্ট। ছেলেগুলো কেউ লাঠি নিয়ে তাড়া করে, কেউ ঝুলি নিয়ে পালায়, আবার কেউ কাছা খুলে দেয়, কেউ কুকুর লেলিয়ে দেয় . . .!

বংশী — তুই রাগিস, তুই ওদের বাখান করিস তাই তোর পিছু নেয়।

রবি খোঁড়া — ছোট ছোট ছেলেরা যদি বলে, অমুক মুচির পাঁটা। তাই মনে হয় ওদের জ্বালায়। ভিক্ষা না করে না খেয়ে মরাই ভাল।

সকলেই হেসে ফেলে। কিন্তু রবি খোঁড়া না হেসে, কান্নার সুরে বলে, এমন করে কেউ কোন দিন রবিদা বলে নি, এমন ভাইয়ের দাদা হয়ে বাঁচবার সৌভাগ্য কি হবে? বলেই কেঁদে ফেলে।

সবাই চুপ মেরে যায়। প্রাইভেট থেকে, হ্যারিকেন আলো হাতে জনাকয় ছেলে মেয়ে বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে বলে এই দ্যাখ রবে খোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে।

রবি খোঁড়া — শুনলে কালুদাদা এ ঘরের ছেলেরাও রবে খোঁড়া বলছে। তোমরা সকলে আছ না হলে এখন কুকুর লেলিয়ে দিত।

কমল চেঁচিয়ে বলে — এই ছেলেরা আজ থেকে তোরা রবি জেঠা না বললে, চামড়া খুলে দেব তোদের।

কমলের মা মানে ঠাকুমা — কমল তুই ছেলেগুলোকে একটু দেখবি তো বাবা। আজকাল ছেলেরা যত লেখাপড়া শিখছে তত মুখে খারাপ কথা বেরুচ্ছে। আগে গাঁয়ে সকলে একটা সম্পর্ক ধরে কথা বলতো। এখন যেন কেউ কাউকে মানছে না।

রামচরণ খুড়ো আর থাকতে না পেরে বলে — জান কমলের মা সকাল বেলা নদী থেকে মুখ হাত ধুয়ে ফিরি যখন তখন আমাকে পুব পাড়ার ছেলেগুলোর কি বলে জান?

কমলের ছোট মেয়ে, কুহু - কুহুধ্বনিতে হাসতে হাসতে আচমকা বলে বামস্বত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি। আর বলা হয় না রবীন্দ্রনাথের ছড়া।

যেন বাড়িটাতে হাসির লহর বইতে শুরু করেছে এমন সময় বজ্রসহ ঝাপটায় হাসির লহর স্তব্ধ হয়ে যায়।

এবার কমল নয়, কমলের বড়দাদা সুবল — "চুপ গেঁড়ি। তোকে আছড়ে মেরে ফেলবো।"

গেঁড়ি অর্থাৎ কুহু তখন রান্নাঘরে জেঠির কাছে, কোলের আড়ালে। কমল নিঃস্ফল হয়ে ফিরে এলো।

রামচরণ খুড়ো — দেখলে সুবলের মা। দিনকাল কেমন যাচ্ছে। আমাকেই যদি এরকম করে তাহলে রবের অবস্থা কি! কি অধঃপতন হচ্ছে।

মেজোকাকা — কিছু মনে করো না কাকা। মেয়েটার আর কি দোষ। দোষ তো আমাদের। তুমি তো গাঁয়ের মাথা। তোমাকেই যদি ছোট ছেলেরা যদি এরকম বলে তাহলে গাঁয়ে বাস করা যায়।

রবি খোঁড়া — দেখলে তো! কি রকম অবস্থা গাঁয়ের।

ঠাকুমা — সত্যিই দিনকাল দিনদিনে কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

কথায় গল্পে ও গুজবে প্রায় রাত সাড়ে নটা পার হয়ে গেছে পাড়া গাঁয়ের পক্ষে রাতটা একটু হয়েছে। রান্নাও প্রায় শেষের পথে। লম্বা পিঁড়েতে, খেতে বসার জায়গা হচ্ছে। কালুর জন্য আলাদা আসন পাতা হয়েছে। একসময় গোপাল বলে দাদু তোমরাও একটু খেঁচুড়ি খেয়ে যাও। কালুভাই এর জন্যই এই ব্যবস্থা। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেজ বলে গোপাল যখন বলছে, একটু খেয়ে গেলেই ভাল হয়।

ঠাকুমা বলে — ওরা যখন বলছে তখন খেয়েই যাও।

আমতা আমতা করে খুড়ো বলে — বংশী তাহলে একটু খেয়েই যাই।

বংশী বলে — আমি আর রবিতো হাত ধুয়েই আছি। জানই তো আমি একটু পেটুক, খাওয়াব ব্যাপারে কোন কিন্তু সেই।

গোপাল — বংশীকা এটাই তো ভাল। কেমন আনন্দ করে একসাথে খাওয়া যাবে।

রামচরণ খুড়ো — গোপাল বেশ ভাল কথা বলে। দেখতে হবে তো কাদের বাড়ীর ছেলে। গোপাল বেশ অতিথি নারায়নও বটে। কালু ভাইকে ধরে নিয়ে এসে ভালই করেছে।

একসাথে সবাই খেতে বসেছে। শুধু মহিলারা বাদ ওরাই খেতে দিচ্ছে। পঁচিশ ত্রিশ জনকে খেতে দেওয়া সহজ কথা নয়। থালায় থালায় গরম খিচুড়ি আসছে সাথে তরকারি। একজন ঘি দিয়ে যাচ্ছে গরম খিচুড়িতে। হাপুস হুপুস শব্দ হচ্ছে। খেতে খেতে রামচরণ খুড়ো বলে — আজকাল বাড়ীতে এ দৃশ্য দেখাই যায় না। যা হয় আমাদের বাড়ীতে আর তোমাদের বাড়ীতে আর ভোলানাথদের বাড়ীতে।

বংশী — কথাটা ঠিক। একসাথে খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

রামচরণ খুড়ো — তবে এটা মানতেই, আমাদের ঘরে দুকেজি মাংস আনলে দুই পিস্, আর তোমাদের আধ কেজি আনলে প্রায় সাফিসিয়েন্ট।

বংশী — তা ঠিক! কিন্তু সকলে মিলে খাওয়ার আনন্দ সাথে উপরি পাওনা।

রামচরণ খুড়ো — কিন্তু মানে বোঝে ক'জন সেকথা। দুকেজী মাংস নিলে অন্য লোক সব বলে, এতে কি হবে গো, কার পাতে কেমন করে দেবে। কিন্তু তোমাদের মতো ফ্যামিলিতে কিংবা অফিসার ফ্যামিলিতে সবই সাফিসিয়েন্ট।

বংশী — সব সাফিসিয়েন্ট বলেই আমাদের এত অতৃপ্তি আরো চাই আরো চাই।

গোপালের বাবা — বড় পরিবারে থাকতে গেলে, বড় মন নিয়ে থাকতে হবে, নইলে পরিবারে তাদের থাকার জায়গা হবে না। তুমি দেখে থাকবে কোয়াটারে যারা মানুষ হয় তাদের অধিকাংশেরই মনটা বেশ উঁচু হয় না। তারা সামান্য জিনিষও ভাগ করে খেতে জানে না। খাইয়ে কত সুখ ওরা ভাল জানেনা। ওরা বোঝেন শুধু নিজের স্বার্থ।

রামচরণ খুড়ো — বাড়ীর মেয়েরাও ভাল না হলে সংসার টেকে না। আর একটা জিনিয লক্ষ্য করেছো।

গোপালের বাবা — কি জিনিষ।

রামচরণ খুড়ো — রাজনীতিবিদ্‌দের বক্তৃতায় আমাদের পরিচয় ভারতবাসী, হিন্দু নয় মুসলিম নয়, খ্রীষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয় . . .। সবাই আমরা ভারতবাসী এক। অথচ এরাই বেকার ভাই, বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভাত দেওয়ার ভয়ে কেমন আলাদা করে দেয়, ফাঁপিয়ে তোলে ব্যাংক ব্যালান্স, নিজের গাড়ীতে চড়ে, এয়ার কণ্ডিসান ঘর-এ না ঘুমুলে ভাল ঘুম হয় না। আবার এরাই দেশে রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়। এরা শুধু ভাঙ্গে, গড়ে না। মুখে গালভর্তি কথা।

গোপালের বাবা — যা বলেছ একেবারে খাঁটি কথা।

রামচরণখুড়ো — কালু ভাই তো কিছু কথা বলছেন না, তুমি কি বল?

কালু — আপনাদের কাছে কি বলবো? কতটুকুই বা জানি। আপনারা কত দেখেছেন কত শিখেছেন, অভিজ্ঞতা অনেক, আপনাদের কাছে আমরা সত্যিকারের শিশু। তাছাড়া আমাদের কথা শোনাই ভাল, জানাই ভাল। এখনও এমন কিছু শিখিনি যা অনেক যা অপরকে জানানো যায়।

রামচরণখুড়ো — ভায়া দারুন বুদ্ধিমান।

মেজকাকা — বুদ্ধিমান তো বটেই তা ছাড়া কত বিনয়ী, যেন এযুগের ছেলেদের মতো নয়।

রামচরণ খুড়ো — এত বিনয়ী না হলে এই গেরুয়া ধারণ করতে পারে।

কালু — এটা ঝোঁকের মাথায় হয়তো হয়েছে। কতদিন এই পোশাকের মূল্য দিতে পারবে? জানিনা।

রামচরণ খুড়ো — তুমি ভাই পারবে, দেখে নিও।

খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষের পর্যায়ে, কি মনে করে গোপাল জিজ্ঞেস করে বংশী খুড়ো, দাদু, রবিদা একটু করে নাও।

রামচরণ খুড়ো — আমাকে নয় ভাই বংশী খানেওয়ালা লোক ওকে দাও।

ততক্ষনে গোপালের ছোট কাকীমা কয়েক চামচ দিয়ে ফেলেছে, থাক্ থাক্ করতে করতেই।

গোপাল — কাকীমাকে দাদুকে একটু দাও, রবি দাকেও দাও, আমাকে একটু, কালুভাইকে একটু দাও।

অনুরোধে সকলেই নেয়। তরকারীও আসে। খেতে দেরীও হয়। ছেলেপুলেরা উঠতে পারছে না। একসাথে উঠতে হবে। ওদেরও যেন মজা লাগছে।

ঠাকুমা একসময় বলে — আমাদের সময় ভাল না হলে, তোমাদের মতো লোকের সেবা নিতে পারি, বিনা নিমন্ত্রনে। ভাই সময় ভাল না হলে বাড়ীতে কেউ পাত পেতে খাওয়াতে পারে না। গোপাল আমাদের সত্যিকারের ভাল ছেলে। দেখ কেমন করে স্বয়ং কালাচাঁদকে ধরে আনলো।

রামচরণ খুড়ো — ঠিক বলেছে, সুবলের মা। গোপাল সত্যিকারের ভাল ছেলে। বেশ তৃপ্তি পেলুম তোমাদের বাড়ীতে এসে। আর তৃপ্তি ভরে খেলুম। রান্নগুলো যেন অমৃত।

বিশেষ করে খিচুড়ি আর কপির তরকারী। ফাগুণেও কপির তরকারী চেয়ে খেতে হোল।

মেজকাকীমা, শ্বাশুড়ীর কানে কানে কিছু বলে, তারপর হাসতে হাসতে বলে গোপালের বৌ নাত বৌ রেঁধেছে।

রামচরণ খুড়ো — বংশী শুনে খুশী হলুম। নাতবৌ ভাল রাঁধতে পারে জেনে হাসতে হাসতে সকলেই উঠে পড়ে। হাত মুখ ধোয়। পান নিয়ে ওরা বাড়ী ফেরে। যাবার বেলায় জানিয়ে গেল সময় করে ওরাও যাবে শ্মশানে।

বৈঠকখানায় শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। গোপাল সব কিছু ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়।

শুয়ে শুয়ে রবি খোঁড়ার কথাগুলো বার বার মনে পড়ে, কালু দা আমাকে তুমি দেখো।

কালু ভাবে জগতে কে কাকে দেখে। গতরাতে সারাটা দিন ভেবে ছিল, কোথায় কেমন করে থাকবে। কতকি অথচ এমন আস্তানা জগতে কোথায় আছে তা জানা ছিলনা। ঘুম আসছে না। ঘরের কথা মনে পড়ছে। মায়ের দাদাদের, পিসিমার, সবার আগে জবার কথা মনে পড়ছে। ছেলে হলে নাম রাখবে রাহুল। মেয়ে হলে নাম রাখবে ঐশ্বর্য্য। নাম রাখতে হোল না। মনের আশা আকাঙ্খা শেষ করে দিয়ে সব শেষ করে দিয়ে গেল। ঘরে থাকলে ঘরটা ভীষণ শূন্য, রাতের বিছানায় ভীষণ শূন্য মনে হয়। তার মায়াভরা কণ্ঠস্বর ও হাসিটি বার বার স্মৃতিতে ভেসে আসে। আজ সংসার জীবন থেকে অন্য এক জীবনে উত্তরণ। বলা যেতে পারে সংসারী ছেড়ে বৈরাগী সে ভিক্ষুক ছাড়া আরকি। পরের ভিক্ষার ধনে তাকে বাঁচতে হবে। আজই তার জীবনের প্রথম পাঠ, সংশয় জাগে ঠিকমত ভিক্ষা করতে পারবে তো। ভীষণ সংকোচ জাগছে। অথচ কোন উপায়ও নেই। আবার ভাবে জগতে কেই বা ভিখারী নয় - সকলেই।

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে যায়। ভোরেই প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে বৈঠক খানার বারান্দায় বসে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" গুন গুন স্বরে গাইতে থাকে। ভালও লাগছে। মনটাও চিন্তাশূন্য হচ্ছে। একবার ভেবে ছিল বাঁশের বাঁশীটাই বাজাবে। কিন্তু বাজায় না কারণ লোকে কি ভাববে কে জানে। বাড়ীর সকলে উঠে পড়েছে। গোপাল উঠেছে। ওকে দেখা গেল। এর পর একটি ছোট মেয়ে এক গ্লাস সরবত নিয়ে হাজির। গতকাল বাড়ীতে চা খায়নি, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। নাম জিজ্ঞেস করতে জানায় কুহু । তুমিই গতকাল বলতে, বাকিটা আর বলতে হোল না, ছুট দিল, বুঝে গেল কালু কি বলতে চায়। ভীষণ বুদ্ধিমতি মনে হোল। এমন সময় রবি খোঁড়া হাজির। এবং জিজ্ঞেস করে - কি কালুদাদা ভাল ঘুম হয়েছে তো? নতুন জায়গাতো।

— ঘুম ঠিকই হয়েছে। এত সকালে হাজির।

— আমার তো ঘুমই হয়নি। সারারাত ভেবেছি যাক আমার একটা হিল্লে হোল। ছেলেগুলোর জ্বালায় মরতে হবে না।

— ছেলেরা ভীষণ জ্বালায় বুঝি। বললুমতো গতকাল — কিনা করে- ছোট (কাছা) খুলে দেয়, কুকুর লেলিয়ে দেয় আবার বলে অমুক মুচির পাঁঠা। এসব কার ভাল লাগে দাদা। এখানে বরং তোমার কাজের দেখ ভাল করবো আর দুটি খেতে দিও। আর কিছু চাই না দাদা। সত্যিই গাঁয়ের ছেলেগুলোকে দেখলে ভীষণ ভয় হয়। রাগটা ভীষণ বেড়ে যায়। যখন বলে অমুক মুচির পাঁঠা।

— রবিদা, আমার ভিক্ষেতে আমাদের দুজনের চলে যাবে তো।

— বলকি দাদা - একজনের ভিক্ষেতে দুজনের চলবে না। আমিতো দুবেলায় দুপোয়ার খদ্দের, আর তুমিও তাই হবে, আর অন্য সব খরচ আধা কেজির। একদেড় কেজি চাল হবে না। তোমার অভিজ্ঞতা কম। অনেক ভিখারী জান সাইকেল চালায়, বাড়ীতে টিভি কিনেছে, আবার কেউ কেউ সুদে টাকাও ধার দেয়।

— তুমি নতুন কথা শোনালে।

— নতুন নয় গো। যদি দেখা হয় তাহলে তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। তখন জেনে নিও।

বৈঠকখানা থেকে দেখা গেল গোপালের মা ও মেজ কাকীমা স্নান সেরে এলো। কিছুক্ষণ পর কোদাল হাতে গোপাল হাজির হয় সাথে ওদের মুনিষ কাটারি, বালতি ও শাবল হাতে।

হারা বলে — চল্ রবি আমরা আজই যাই।

গোপাল — চল কালুভাই - আমরাও যাই। মা ও কাকীমাও আসছে, আগে মায়ের পূজো, তারপর কাজে লাগা।

কালু — সেটা আবার বলতে। মাকে পূজো দিয়ে কাজ শুরু করাই ঠিক। আমার মাথায় ওসব ছিল না।

কথা বলতে বলতে ওনারা পূজোর সামগ্রী নিয়ে হাজির।

গোপালের মা — কি, মাথায় ওসব ছিল না?

কালু — পূজোর ব্যাপারটা।

মেজকাকীমা — মাকে ঠাণ্ডা করেই তো এসব করা ভাল। ওদের হাতে আসন, ঘটি ও পূজোর সামগ্রী। ছেলেমেয়েরা আসতে চেয়েছিল। আসতে দেয়নি। কারণ শ্মশান বলে। ধমকে রেখে এসেছে। ওরা পথ চলতে থাকে কথায় কথায় বেশী দূর নয়, পৌছে যায় একসময়! ইতিমধ্যে রবি ও হারা কালীতলা ঝাঁট দিয়েছে। গোবর কুড়িয়ে এনেছে, ন্যাতা দেওয়ার তোড়জোড় করছে। গোপালের মা বলে বেশ করেছিস, আগে ন্যাতাটা দে, তারপর পূজো হবে। পূজো হলে আশ্রমের কাজ শুরু হবে। ন্যাতা দেওয়া হয়। কালুকে নিয়ে মা কাকীমা প্রবেশ করে ঠাকুরের ঘরে। ঝুলে আবর্জনায় পাতাতে ভর্ত্তি রয়েছে। সেগুলো সযত্নে তুলে ফেলে ওরা। তারপর গোবরও দেয়। মোটামুটি ঠাকুরের আশেপাশে পরিষ্কার করে, ওরা তিন জনেই নদীতে যায়। কালুর হাতে ঘটি ধরিয়ে দেয় নদীতে জল আনার জন্য। হাত পা পরিষ্কার করে ঘটি করে জল আনে। গোপালের মা বালতিতে এক বালতি জল। বালতি নিতে চায় কালু, ওরা দেয় না। এভাবেই মাতৃ হৃদয় আর সিক্ত হয়ে। ফুল গাছগুলো

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ওরা সকলেই ফুল তোলে অনেক বেশী করে। কালু জানায় ফুলগুলো দেখেই পূজোর ইচ্ছে জাগে। সাজি ভর্তি ফুল তোলা হোল জবা ও টগর। গোপাল ওরা ঘাস ও আবর্জনা পরিষ্কারে ব্যস্ত। আসন পাতা হয় এক গোছা ধূপ জ্বালান হয়। পূজো পূজো পরিবেশ তৈরী হয়। কালু থেকে পূজোর জন্য ঘট দেখে নেয়। ঘটে প্রায় জল নেই, ঘট ভর্তি করে বার দুই নদী থেকে জল এনে। ততক্ষণে গোপালের বাবা, মেজকাকা, বংশী, রামচরণ, ভোলানাথ, মুরালি, কালী পিসি হাজির হয়েছে। সকলেই বসেছে সামনে রাখা কয়েকটা পাথরের উপর। এটা পাথরের সেশ, সাদা কালো কত রকমের বড় বড় চাঁই থেকে নুড়ির ছড়াছড়ি। কয়েকটা পাথর সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো আছে। ওরা ওতেই বসেছে। নানা গল্প, একসময় বংশী বলে, পূজোর সময় গোটাকয়েক টিন দিলে কেমন হয়। সকলে একবাক্যে রাজী হয়। নতুন জোয়ার ওদের মনে। ধূপের গন্ধে ও মন্ত্রে পূজো আরম্ভ হয়। মেজকাকী বলে - বাবা তুমি সর্বত্রই গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও। চমৎকার মন্ত্রের উপযুক্ত।

"ওঁং কালী করালী করালবদনা. . . "

মন্ত্রে, নির্জন শ্মশান নদী প্রান্তর, বনানী যেন জেগে উঠেছে। মন্ত্রের আকর্ষণে সকলেই এখন কালী মায়ের দরজার সামনে। পূজো জমে উঠেছে। মেয়েরা গলবস্ত্র হয়ে বসেছে। সত্যিই পূজোর মন্ত্রে ধূপের গন্ধে ঘন্টার শব্দে, শাঁখের আওয়াজে সুন্দর পরিবেশ রচনা হয়েছে। যেন মনে হয় - কালী মা দীর্ঘদিন পর জাগছেন। ঘন্টাখানেক পর পূজা সারা হয়। পরিবেশটা বেশ থমথমে জাঁকালো হয়েছে। সকলে নির্বাক। কিছুক্ষণ পর গোপালের মা সকলকে প্রসাদ দেয়, এর পর কাজ আরম্ভ হয়। কিছু প্রসাদ ঢাকা রেখে দেয়, ছেলে পুলেদের জন্য নিয়ে যাবার জন্য এরপর আশ্রমটা বাগানো হবে। দরজা ঠেলে ওরা ভিতরে ঢোকে। আসবাব পত্র বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু আছে মাটির রান্নার হাড়িখোলা। গোপালের মা রবিকে হাঁড়ি খোলা গুলো ফেলতে বলে। হাঁড়িখোলা ফেলা হোল। দাওয়ার উনুনটা ভেঙ্গে গেছে। রবিকে উনুনের জন্য মাটি তৈরী করতে বলে। ঝাঁট ও ঝুল ঝাড়া হোল। এবার ন্যাতা দেওয়া হবে। মেজকাকী ন্যাতা দেয়। গোপালের মা উনুন তৈরীতে ব্যস্ত। কালী পিসি যেন তদারকি করছে, আর মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে কালুকে। মেজকাকী বলে দেওয়ালটাকে খড়ি মাটি দিয়ে ভাল হোল।

গোপালের মা — রবি খোঁড়াকে বলে তুই বাড়ী যা - ছোট গিন্নিকে বলবি, সারের ঘরে খড়ি মাটি আছে যেন কেজি তিন চার দেয়। রবি খোঁড়া পায়ে লাঠি হাতে নাচের ছন্দে চলে যায়। যেমন একটা ছোট ছেলে একটা কাজের আদেশ পেয়ে ধন্য হয়ে স্ফুর্তিতে ছুটে যায়। রবিও তেমনি। গোপাল হেঁকে বলে আর একটা বালতি আনবি। কিছুক্ষণ পর বালতি সহ খড়ি মাটি নিয়ে ফিরে আসে। খড়ি মাটি গোলা হয়। গোপালের মা নিষেধ করে ন্যাতা দিতে কারণ আবার খড়ি মাটি গোলা পড়বে। খড়ি মাটি গোলা হয়, দুই জায়ে খড়িমাটি দিতে থাকে। ডান হাতে ওরা কাপড়ের চুড়ি পরেছে যাতে না খড়ি মাটির জল হাত বেয়ে গায়ে না আসে। মাটির দেওয়ালে খড়িমাটি পেয়ে দেওয়ালটা যেন শ্বাস নিচ্ছে। দেওয়ালের শ্বাসে সোঁদা গন্ধ। গোপাল, হারা ওরা বাড়ীর পাশের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করছে। দুই জায়ে অনেক কথা হয়। ওদের মন এখন আশ্রমে। মনে শুধু ছেলেটার যেন কোন অসুবিধা না হয়। কালী পিসি এখন উনুন গড়ছে দাওয়ায়। কিন্তু কালুর মন চায়

না দাওয়াটাকে নোংরা করতে। কালুর ইচ্ছে উঠোনে একটা উনুন যেন হয়। তাই কালী পিসিকে বলে পিসিমা দাওয়ার নীচে উঠোনে উনুনটা হলে কেমন হোত। পিসিমা জানায় রোদে জলে কি করে রান্না করবে। কালু জানায় - বটের ছায়ায় রোদ কোথায়। বরং বৃষ্টিতে অসুবিধে হবে। গোপালের মা বলে - কালুবাবা ঠিকই বলেছে - ঘরটা শুধু নোংরা করে লাভ নেই। সেই ভাল জল এলে - উপরের উনুনটাতে রাঁধবে না হলে নীচেরটাতে। ভালই হবে দুটো উনুনে. সেজকাকীমা ন্যাতা দিতে দিতে একবার দেখে যায়। দ্রুত কাজ হচ্ছে। প্রায় কাজ শেষ, শেষে গোপাল বলে তোরা পাঁচ সাত বোঝা শালডাঁটা কেটে রোদে মেলে দিয়ে আয়। আশ্রম সংলগ্ন বন। সুতরাং কাঠের কোন ব্যাপার নেই। এরপর রবিই পারবে কাঠের ব্যবস্থা করতে। এদিকে বংশী ও রামচরণ খুড়ো, গোপালের বাবা, কাকা, আরও সকলে ভীষণ উৎসাহিত কালুর পূজোয়। একজন বলে মন্ত্র ভালই জানে, অপর জন বলে কণ্ঠস্বর বেশ মধুর।

আজ মুরালি, ভোলানাথ তাকে প্রথম দেখেছে, তাতেই কালুকে দেখে মুগ্ধ। ভোলানাথ একটু উৎসাহী বেশী তাই সে বলে - এবার চৈত্র অমাবস্যায় কালী ঠাকুর আবার নতুন করে বানাতে হবে, আবার পূজোও করতে হবে।

মুরালি -- গত তিন বছর যা হয়ে আসছে সেটা বন্ধ হবে কেন?

রামচরণ খুড়ো — ঠিক বলেচ তোমরা। পূজো বন্ধ করবে কেন?

এমন সময় কালু আসে, জিজ্ঞেস করে কখন পূজো হয় নতুন করে?

মুরালি — চৈত্র অমাবস্যায়।

কালু — এই বছরেও তো করবেন পূজা?

বংশী --- পূজা হবে বৈকি। তুমি যখন এসেছো, আর আমাদের ভয় কি? তুমি পারবে।

রামচরণ খুড়ো — তুমি নিত্যি সেবার ভারটা নাও আর আমরা গাঁয়ের লোকেরা মিলে যা করার করবো।

কালু — পূজতে কি কি হয়।

মুরালি — নতুন মূর্তি হয়, পাঁঠাবলি হয়, গোটা চারেক ঢাক আসে এই সব আরকি?

গোপালের বাবা — বংশী বলছে এবছর করগেট লাগাবে।

রামচরণ খুড়ো — ওর সাথে ঠাকুরের সামনে একটা আটচালা করলে কেমন হয়, লোকজন বসতে পারে।

মুরালি — করতে পারল তো ভাল হয়। কিন্তু খরচ যে বেশী হবে এবছর।

রামচরণ খুড়ো — করবো করবো করলে করা হয় না। কষ্ট করে একবার করলে আর ভাবতে হবে না। একটু ঝোঁক না হলে কিছু কাজ হবে না।

বংশী — ঠিক বলেছো। তাহলে এখানেই ঠিক করে ফেল। গ্রাম বলতে তো আমরাই যা ঠিক করবো, সেটা সকলেই মেনে নেবে।

রামচরণ খুড়ো — তবে আর আপত্তি কোথায়?

গোপালের বাবা — চাষী পিছু একমন ধান, আর চাকুরী পিছু একপিস টিন, দেখ কেমন না হয়।

ভোলানাথ — না দাদা ছোট চাষী - আধ মন ধান আর বড় চাষী এক মন কমপক্ষে, আর বেশী নিলেও ক্ষতি নেই।

গোপালের বাবা — আমি দু বস্তা? তোমরা কে কত দেবে বল?

রামচরণ খুড়ো — শেষের বেলায় একটা ভালকাজ করে যাই আমি বস্তা চারেক দিচ্ছি। ভোলানাথ, মুরালি, বংশী তোমরা সব বল। ভোলানাথ তোমাকে তো ঈশ্বর দুহাত ভরে দিয়েছে। আরও দেবে, তুমি একটু বেশী করে দাও।

বংশী — খুড়ো যা বলেছে, লাখ কথা।

মেজকা — খুড়ো হচ্ছে, মানুষের মতো মানুষ, সবাই যদি খুড়োর মতো হতো তাহলে ভালই হোত। যাক্ দাদার উপরে কথা বলছি না, দাদাকে আর বস্তা দুই -এর জন্য বল। দুঃখতো আমাদের চিরকালই আছে।

গোপালের বাবা ভাই এর বিনয়ী কথাও দাদার সম্মানে উৎসাহিত হয়ে বলে, ভাই যখন বলছে, ও কথার ওতো একটা গুরুত্ব আছে।

আচ্ছা আমরা — বস্তা চারেক দিচ্ছি। এবার মুরালিভাই, বংশী ভাই আর তো ভোলানাথ ভাই তুমিই আমাদের প্রধান সেনাপতি। তোমারই বল।

রামচরণ খুড়ো — সুবল তুমি একটা কথার মত কথা বলেছ। প্রধান সেনাপতি। তুমি সবার হয়েই বল। তবে বংশী, মুরালি তোমাদেরও আমরা ছোট করছি না তোমাকেও আমাদের সেনাপতি বলে ভাবি তবে ভোলাদাই সবার উর্দ্ধে।

মুরালি — দাদারা যখন বলছো আমি বস্তা পাঁচ দেব। সত্যিই ভোলানাথদার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। ও সত্যিই প্রধান সেনাপতি। বংশী ভাই তুমি আমার চেয়ে অন্তত এক বস্তাও বেশী দেবে।

বংশী বললে — মুরালিদা বলেইতো দিয়েছে। দাদা যখন বলছে তখন আমি ছয় বস্তাই দেব।

এদিকে মহিলারাও এসে হাজির হয়েছে পিছনে। বুড়োরা এত লক্ষ্যই করেনি।

কালীপিসি — ভোলানাথ কত দিচ্ছে? দাও ভাই দাও। আজকের পূজো দেখে প্রাণটা ভরে গেল। তুমি দেবে না তো কে দেবে? মা কালী তোমাকে আরও দিক।

ভোলানাথ এবার মুখ খোলে — আমি তো দিবই, আমি যখন প্রধান সেনাপতি। এবার তুমি বলতো কালীপিসি। তুমি তো স্বয়ং মা কালী, আর তোমার জন্যই মন্দির তৈরী হচ্ছে, এটা তোমার নিজের ব্যাপার। কি গো খুড়ো মশায় ঠিক বলছি না।

কথাটা বলেই ভোলানাই হেঁসে ফেলে, সবাই হাঁসতে থাকে।

রামচরণ খুড়ো — ভাইপো হক্ কথাই বলেছে। মা কালী যেন তোমাকে যথা সময়ে পাঠিয়েছে। ভোলানাথকেও দিয়ে মাকালী ঠিক সময়ে তোমাকে ধরেছে।

কালীপিসি — ভোলানাথ কেমন লোকের নাতি বলতো। ওর দাদু গাঁয়ের সব বিচার আচার করতো। ও বলবে না তো কি আমরা বলবো?

গোপালের বাবা — সত্যিই একটা লোকের মতো লোক ছিল।

রামচরণ খুড়ো — ভাইপোই তা কম কিসে? তবে ও দাদুর তুলনা হয় না। যাক্

কালী, ভোলানাথ তোমরা কি বলছ। এমন একটা বল যাতে গ্রামের লোক চিরদিন তোমাদের মনে রাখে।

কালীপিসি — আমি আর কি বলবো? তোমরাই বল না।

রামচরণ খুড়ো — আমার কথা যদি রাখ তাহলে বলি।

ভোলানাথ — কালীদিদিরই তো মন্দির হবে। কালীদিদি তুমিই বল?

কালীপিসি — আর তোকে হাঁসতে হবে না, তুই তোরটা বল।

ভোলানাথ — আমি তোমারটা বলছি, আর তুমি আমারটা বল।

কালীপিসি — বল, তাই তুই বল। সব ঠিকমত বলবি যা দিতে পারি - একটা সাঁকে ধাঁ বলিস না।

ভোলনাথ — না গো দিদি যা দিলে তোমার উপর চাপ পড়বে না।

কালীপিসি — তবে বল।

ভোলানাথ — তোমার তো সব ভাইপোরাই পাবে। গাঁয়ের লোক যাতে তোমার নাম করে তাই করো। তুমি তোমার জমির নামে শোলর এক বিঘে জমি দান কর। যাতে পূজোটা না বন্ধ হয়ে যায়। ধানের টাকায় অন্তত চৈত্র মাসের পূজোটা হবে।

কালীপিসি — মায়ের যখন ইচ্ছে, তবে তাই হোক। আমি একবিঘে জমি মায়ের নামে লিখে দেব।

সকলেই আত্মাহারা আনন্দে। গোপাল একটা প্রণাম করে বলে - পিসি এতোদিন গাঁয়ের একটা কাজ করলে। তোমার কথা গাঁয়ের লোক কেউ ভুলবে না কোনদিন। আজকের পূজোতে মা এতো জাগ্রত হবে কে তা জানতো।

কালীপিসি — এবার ভোলা, তোর বাপের অনেক আছে, তুই জগমোহনের আর মন্দিরের যা টিন লাগে দিবি।

গোপালের বাবা — আর তো কোন সমস্যাই রইলো না। তা ভোলানাথ ভাই কি বলছো?

ভোলানাথ — আর কি বলবো। কালী দিদির কথাই মেনে নিচ্ছি। তাহলে আমি টিন, দিদি জমি, তুমি চার বস্তা, খুড়ো চার বস্তা, বংশীদা পাঁচ বস্তা, মুরালি ভাই পাঁচ বস্তা আর বড়চাষী একবস্তা আর ছোটচাষী আধমন, আর স্বেচ্ছায় যে যা দেবে মাথা পেতে নিতে হবে। আর যারা চাকরী করে পাঁচ'শ। তাহলে পাথরের দাওয়া আর সিমেন্টের মেঝে পিঁড়ে বাঁধা হয়ে যাবে। আর বাড়লে আশ্রমটা টিন দেওয়া হবে।

কালু — আমার টিন লাগবে না। খড়ের ঘরেই বেশ আরাম, মাকে ঠিক রাখলেই আমরা ঠিক থাকবো। তবে একটা অনুরোধ আমার রাখতে হবে সকলকে।

রামচরণ খুড়ো — কি অনুরোধ ভাই?

কালু — আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তখন বলি। কালী পূজোর পরের দিন কারও বাড়ীতে উনুন জ্বলবে না।

রামচরণ খুড়ো — কেন? কথাটা বুঝলুম নাতো।

গোপালের বাবা — আমিও বুঝলাম না!

ভোলানাথ — খুড়ো এটা বুঝতে পারছো না।

রামচরণ খুড়ো — তুমি খুলে বল।

ভোলানাথ — তাহলে ? কালুকে কি যে বলি। গোপালের বন্ধু যখন, কালু ভাইপোই বলি। ভাইপো বলতে চাইছে - এখানে মানে মায়ের থানে গাঁয়ের সকলে দুবেলা খাওয়া দাওয়া করুক। কি ভাইপো ঠিক বলছি কি না?

হাসতে হাসতে কালু মাথা নেড়ে জানায় - ঠিক কথা।

রামচরণ খুড়ো — ইচ্ছেটার তারিফ করতে তো হবে নিশ্চই। কিন্তু কিভাবে হবে এত বড় দক্ষ যজ্ঞ?

কালীপিসি — মা-ই ব্যবস্থা করবে।

কালু — ঠিক কথা। এতে দুটো জিনিষ হবে।

গোপালের বাবা — কি দুটো জিনিয।

কালু — প্রথমে গাঁয়েব সকলে বাড়ীতে তো খাচ্ছিলই. সেই চালডাল দিয়েই খেঁচুড়ী ভোগ এখানেই রান্না করে খেতে ক্ষতি কি - এতে সকলেরই অংশ গ্রহণ করা হবে। আর সকলে অংশ গ্রহণ করলে যথার্থ উৎসব হয়, হয় পূজা। আর এতে মনে হবে আমরা গ্রামের সকলেই একটা যৌথ পরিবারেই আছি। যেটা গতকাল গোপালদার বাড়ীতে থেকে শিখেছি। সত্যিই একসাথে নুন ভাত খেলেও মহানন্দ। কে কদিন পৃথিবীতে এসেছে। হিংসা. হানাহানি, মারামারি করেই যদি নিজেদের ব্যস্ত রাখি তাহলে যে মানব জনম্ বৃথা। পরমানন্দের সান্নিধ্য এককে নয় - বৃহতে। সেই বৃহতের উপলব্ধি করাই কাম্য মানব জীবনের। আর বৃহতের উপলব্ধি তো তখনই হবে, যখন আমরা সকলেই এক মনে হব। সকলে এক সাথে ভোজনে মনের মালিন্য দূর হয়, মনের প্রসারতা বাড়ে। পরকে আপন মনে হয়। সকলেই আত্মীয় ভাবলে। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি কোথায় নিমেষে দূর হয়ে যাবে। শান্তিতে থাকবে অন্তত সকলে।

রামচরণ খুড়ো — কালুর কাছে যায় - বলে তুমি তো ভাই নাতির সমান, তুমি ব্রাহ্মণ তোমাকে একটা প্রণাম করি, না করো না।

কালু প্রণাম করতে দেয় না, বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরে। বলে যদি পীড়াপীড়ি করেন তাহলে আমি আপনাকে প্রণাম করতে বাধ্য হব, বরং মাকে প্রণাম করুন দেখবেন আনন্দ আরও বাড়বে।

কালুর কথা মতো - মাকে গিয়ে প্রণাম করে। আর সকলেই নতমস্তকে মা কালীকে প্রণাম করে। সকলের যেন আনন্দ জোয়ারে ভাসছে।

রবি খোঁড়া আর হারা ওরা যেন বিহ্বল ওদের কথায় হারা হাঁসতে হাঁসতে বলে - দিনেতো খিচুড়ি হোল রাতে কি হবে - লুচি বন্দে।

ভোলানাথ — রাতে লুচি বন্দেই হবে। ভাইপো যা পথ বলেছে তাতে রাতে লুচি কেন? হালুয়া পোলয়া হয়ে যাবে। গাঁয়ের লোক একসাথে কি না করতে পারে। তাছাড়া কালীপিসির জমির ধান তো আছেই, ক' কেজি ময়দা আর ক'টিন ডালডা লাগবে। গাঁয়ের লোক নিজেরাই ধান রুইবে কাটবে সব করবে। কিছু খরচ নেই।

রামচরণ খুড়ো — কিরে হাবা। রাতে তাহলে লুচি, বুটের ডাল আর বন্দে।

হাবা হাসতে হাসতে বলে — আর কিছু নয়। ব্যাস্, ব্যাস্।

সকলেই হাসত থাকে। সকলের হৃদয় আজ পরিপূর্ণ এক অজানা খুশীতে। খুশীটা যে কেমন বলা মুস্কিল। ছেলেরা মিষ্টি পেলে যেমন খুশী হয় সেরকম খুশী নয় - ঠিক অন্য ধরনের - কতকটা এরকম হতে পারে যেমন নিজে না খেয়ে অপরকে বা ছেলেদের খাইয়ে খুশী। তাতে খুশীর সাথে শান্তিও মনেতে কম আসে না। এদের পর্যায়টা সেই ধরনের এরাতো গ্রামের মাতব্বর স্থানীয়। মাতব্বররা যখন খাইয়ে খুশী হয়, সে গ্রাম ধন্য না হয়ে পারে। কথায় প্রায় বারোটা বাজতে চললো। এবার বাড়ী যেতে হবে এখনও মুড়ি খাওয়া হয়নি, পাড়া গাঁয়ের এক রেওয়াজ ১০টা ১১টার সময় একবার মুড়ি খাবে, যে কম খাবে সের খানেক। তারপর ২টা ২-৩০টার সময় ভাত। এই নিয়ম।

ভোলানাথ বললো — বেশী সময় নেই, হাতে মাসদেড়েক। এই সকলের মধ্যে শেষ করতে হবে। সকলেই একেবারেই সম্মতি জানায়। সিদ্ধান্ত হয় গ্রামের অন্যান্য পাড়ায় তারা সকলেই গিয়ে ব্যাপারটা সকলকেই জানাবে এবং এখানের সিদ্ধান্তের কথা বলবে। গোপাল কালুকে বলে চল বাড়ী যাই। অনেক বেলা হোল। ওরাই আগে পা বাড়ায়, পরে সকলে আসতে থাকে। ওদের মুখে পরম তৃপ্তি। মেয়েরা স্নান সেরে ফিরবে। প্রসাদ গোপালের হাতে। যার সাথে দেখা হয় প্রসাদ দেয়, আর কালুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। অবশেষে বাড়ী ফিরলো। মা কাকীমারা ফিরলো আরও ঘন্টা খানেক পর। দেরীর কারণ স্নানের ঘাটে অন্য মহিলাদের সবকিছু না জানালে পেটের কথাগুলো দারণ অস্বস্তিতে ফেলবে। মা কাকীমা, কালুর আগমন, রাতের খাবার, পূজোর আশ্রম পরিষ্কার, আশ্রম নিকানো, মার উনুন পর্য্যন্ত গড়া, শেষে বাঁধানো আট চালা, কালী মন্দির কালীপিসির জমির ধান, চাঁদা, শেষ হয় খিচুড়ি আর লুচি বন্দেতে। যারা শোনে হাঁ করে শোনে, এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এমন ঘটনা তাদের গাঁয়ে জীবনে কোন দিন ঘটেনি। তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে আশ্রম, মন্দির, কালীপূজা, খিচুড়ি, বন্দে পূজোটা ভালই জমেছে চোখের সামনে দেখতে পায় যেন। শ্বাশুড়ী মার কালুকে দেওয়া নাম কালাচাঁদ পর্য্যন্ত বলতে ভোলে না। শেষে বলে সবই মায়ের ইচ্ছে। পূজো আসতে আর বেশী দেরী নেই মাত্র মাস দেড়েক। আনন্দ বাজার, বর্ত্তমান, গনশক্তি, প্রতিদিন, আজকাল, স্টেট্সম্যান, টিভি, রেডিও যে যাই বলুক, মহিলাদের স্নানের ঘাটের কাছে সকল সংবাদ সংস্থাই লজ্জায় মুখ লুকুবে। বৈঠকখানায় বিশ্রাম করে কালু। রবি খোঁড়াও এসেছে। থালাতে ওদের গুড় মুড়ি দেওয়া হয়েছে।

গোপালের ঠাকুমা যখন শুনলো সবকিছু তখন আহলাদে আটখানা হয়ে বলে — মাকালী, একেবারে স্বয়ং কালাচাঁদকেই পাঠিয়েছে। কালীপিসিকেও বলে, ভালই করেছে কালী, গাঁয়ের লোক নাম করবে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে, মাতব্বররা বেরিয়েছে, গাঁয়ের সকলকে সকালের ব্যাপারটা জানাতে এবং সাথে মত নিতে। কাউকে খবর দিতে হয় না, উল্টে ওরাই বলে সব শুনেছে, তারা বলে ভালই হয়েছে। সায়ও দেয় ওদের প্রস্তাবে, সকলেই চাঁদা দিতে রাজী, অনেকে আবার স্বেচ্ছায় আরও বেশী কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেউ কম্ দিতে চায় না। আর

কেউ খবরটা জানে না বলে না - সবাই জানায় - সবাই জানে - মহিলাদের স্নানের ঘাটের মাধ্যমে, সকল সংবাদ মাধ্যম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রমাণ হয়ে যায় বারে বারে।

এদিকে কালীপিসিও বেরিয়েছে একটু পাড়াতে। যেখানেই কালীপিসি দাঁড়ায় সেখানেই ভীড় হয়, বিশেষ করে মহিলারা। সকলেই শুনতে চায় কি কি ঘটেছে। কালীপিসিও বলে যায় যা ঘটেছে - তার জমি দেওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু ভোলানাথের টিন দেওয়া পর্য্যন্ত। আবার খেচুড়ি থেকে বন্দে পর্য্যন্ত। গোটা গ্রাম এক হওয়ার স্বপ্ন দেখায় কালু বাবাজী, সেটাও বলতে ভোলে না। দরকার হোলে কাল থেকেই কাজ শুরু হবে ইত্যাদি। এমনিভাবে কয়েকটা পথ সভা শেষে, গোপালদের বাড়ীতে পোঁছায়। গোপালের ঠাকুমা - তাকে কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে - আশীর্বাদ করতে করতে বলে সব শুনলুম মা তোর কথা - বেশ করেছিস্। তোর আছে যখন দিবি না, এই দ্যাখ যেমন আমরা সবাই আলোচনা করছি তোর নাম, তেমনি গোটা গ্রামটা তোর নাম করছে, কম কথা, বেঁচে থাক্ মা। কালীপিসিও কেমন হয়ে যায়। এমন করে তো আর কেউ বলেনি। মনে মনে বুঝে ভালই করেছে - ভাইপোদের দিয়েও নাম নেই। তবে কোন ভাইপো কিছু বলেনি, পাছে বিগড়ে গিয়ে সবটাই না দিয়ে দেয়, তবুও তো পিসির সাত বিঘের ছ বিঘে থাক্‌বে। সবাই দুই বিঘে করে পাবে। মুরুব্বি ও মাতব্বরদের দলটা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে হাজির হয়, গোপালদের বাড়ীতে। গোপালদের বাড়ীটা প্রায় গাঁয়ের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে। রামচরণ খুড়ো, বংশী, মুরালি, ভোলানাথ, সত্য, নিতাই, গোবিন্দরা ছিল। ওরা গোপালের বাবার আহ্বানে চা খেতে ঢোকে তখন প্রায় রাত সাতটা। আজকের আসর গতকালের থেকে আরও জমজমাট। ভোলানাথের মা, কালীপিসি, সুফলা মাসি ও পাড়ার বামুন জেঠি হাজির হয়েছে। কালীপিসি ছাড়া অনেক মাসি ও জেঠিরা এসেছে এ ব্যাপারে খবর নিতে এবং কালু বাবাজীকে দেখতে। আরও বৌ ঝী'রা এসেছিল তারা রাত হতে ফিরে গেছে। নতুন নতুন কল্পনার জাল বুনতে বুনতে। চা বিস্কুট দেওয়া হয়। আজকের রাতের মিটিং-এ আজকের সারা দিনের সারবস্তু আলোচনা হয়। ভোলানাথ বংশীকে কাগজ কলম্ ধরতে বলে। নামের লিস্ট হয় চাকুরেদের, ঠিক হয় যত হাজার বেতন তত শত করে টাকা লাগবে। দেখা গেল প্রায় পনেরো জন, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী। ধানের আদায় চাষী অনুপাতে ধান আদায় - ছোট চাষী আধমন, মাঝারি বস্তা অর্থাৎ দেড় মন, আর বড় চাষী কমপক্ষে তিন বস্তা ধান বা ধানের দাম, বেশী দিলে সাগ্রহে গ্রহণ করা হবে। ভোলানাথ বলে যারা খেটে খায় তাদের চাঁদা নেওয়া হবে কিনা। রামচরণ খুড়ো উত্তরে জানায় ওদেরও চাঁদা দিতে হবে একটা মুনিষের বেতন না নিলে ওদের মমতা থাকবে না এই কর্মযজ্ঞে। মোট কথা হল গ্রামবাসীর যোগদানেই তো ভরে উঠবে উৎসব প্রাঙ্গন। দেখাগেল তাতে যা চাঁদা উঠলো তাতে টিনের পয়সা দিয়ে সুন্দর ছাদ হয়ে যাবে। হিসেবটা সঙ্গে সঙ্গেই করিয়ে নিতে পারলো। কারণ গাঁয়েই হীরু মিস্ত্রির বাড়ী। তাকে ডেকে আনতে ছোটে রবি খোঁড়া, লাঠিতে ভর দিয়ে নাচতে নাচতে। ভাগ্যিস রাত ছিল, তা না হলে সেই নাচ দেখে রবি খোঁড়াকে ছেলের যা করতো, তা ভাবলে রবি শিউরে ওঠে। মিস্ত্রী আসে, ওকে জানানো হয়, কি কি করতে হবে। ভোলানাথ বলে - কালী ঘর সংলগ্ন জগমোহন বা আটচালা। আটচালায় জনা কুড়ি পঁচিশটা যেন লোক বসতে পারে।

বংশী বলে — মন্দিরটা সামনে প্যারাফেট গেঁথে মন্দিরের মতো করতে।

মুরলি — যেটা করতে হবে, না হলে মানাবে না, মেঝে পিঁড়ে বাঁধানো হবে।

হীরুমিস্ত্রি — জানতে চায় আপনাদের আদায় কত!

ভোলানাথ — ছাদসহ কত লাগবে? পাথরের দেওয়াল, লাগলে গাড়ীখানেক ভাটার ইট দেওয়া হবে। আর আলাদা করেই বা ছাদটাতে কত লাগবে?

রামচরণ খুড়ো — মন্দিরের মাপটা যেটাতে মা আছে সেই মাপেই হবে। আর ওর দ্বিগুণ আট চালা।

হীরুমিস্ত্রি — ঠিক আছে একটু সময় দাও আমাকে আমি সব বলে দিচ্ছি।

গোপালের বাবা — যা করতে হবে এক হাতেই, না হলে পাঁচজনের কাজ থেকেই যাবে।

নিতাই খুড়ো — ঠিক কথা - গেরস্থ পারে না আধা কাজ সম্পূর্ণ করতে, এখনও দেড় মাসের উপর সময় আছে।

গোবিন্দ মামা — প্রয়োজনে হীরু বেশি মিস্ত্রী লাগাবে।

হীরু — বাবু ছাদে, হাজার চল্লিশ লাগবে। তাতে দু-এক হাজার কম বেশী লাগতে পারে।

ভোলানাথ — টিন হলে এতো লাগতো না মনে হয়। আর যা চাঁদা আদায় হবে মিস্ত্রিতে, গাঁথতে, প্লাস্টার ও সিমেন্টে, ছাদ বাদে খরচ হবে।

এবার একটা মহিলা কণ্ঠ শোনা যায় - ভোলানাথ। তুই যখন বলেছিস, তখন চল্লিশই হাজার টাকাই দেওয়া হবে। না পারলে আমার কাছে নিস।

সকলেই তাজ্জব, ভোলনাথও জানতো না যে তার মা কখন এসেছে।

গোপালের বাবা — কাকীমা যখন স্বয়ং বলছেন, এর পর আর কারও কথা চলে না।

রামচরণ, গোবিন্দ, নিতাই বংশী সকলেই সমস্বরে বলে - ভোলনাথ তোমার মায়ের মুখেই এসব মানায়। এরকম উচ্চ মন না হলে চলে।

রামচরণ খুড়ো — বিশের বেশী তোমাকে দিতে হবে না, এধারের যদি বাড়ে তাহলে দুই এক হাজার কম দিলেও চলবে।

ভোলনাথের মা — না ঠাকুরপো! কমকথা। ভোলানাথ যা বলেছে তাই দেব। ঠাকুরতো আমাদের অনেক দিয়েছে, ঠাকুরের কথা একটু ভাব। তাছাড়া তুই তো দিবিই বলছিলি আর আমি না বললেও দিতিস, তবে কেন তিক্ততার সৃষ্টি করছিস্। সকাল থেকে তো তোকে দেখছি, সোমনাথের সাথেও আলোচনা শুনেছি, কাশীনাথ তো তোর কোন কাজের অবাধ্য নয়।

ভোলানাথ — ওটা তো আমি দেব সকাল থেকে ঠিক করে রেখেছি - সোমনাথকে বলে। যাক্ ভালই হোল, তোমার মত পাওয়া গেল।

একটা হৈ হৈ শব্দ সৃষ্টি হয় আনন্দে। গাঁয়ে একটা কাজের মতো কাজ হতে চলেছে। এরকম কাজ কোনদিন হয়নি। সবাই ভাসছে এক অজানা আনন্দ ধারায়।

গোপালের ঠাকুমা — বাবা ভোলানাথ কিছু মনে করো না মা তোমার এই ব্যাপারে কিছু বললো বলে। আমরা তোমাকে জানি, তোমার মন কত উঁচু, এককথায় টিন দেবে বলেছিলে, আলাদা ছাদের কত খরচ পড়বে তাও খোঁজ নিয়েছতো। তুমি যা করতে - তোমার মা না থাকলেও তাই করতে, একটু বাজিয়ে নিলে সকলকে। আর তোমার মা তোমার মায়ের উপযুক্ত কথা বলেছে।

রামচরণ খুড়ো — গোপালের ঠাকুমা একেবারে খাঁটি কথা বলেছে। সকলেই সায় দেয়।

সকলেই সাবাশ দেয় ঠাকুমাকে।

এদিকে বাড়ীর মহিলারা একবার ডাকে মেজ কর্তাকে . . .। কি কথা হয় ওরা ছাড়া কেউ জানে না।

সকলেই একমত যে আজই, পাড়ায় ধান ও চাঁদা আদায়ের ভার দেওয়া হোক এক সপ্তাহের মধ্যে চাই। গতকালই জায়গা দেখে ভিত খোঁড়া হবে। হীরু মিস্ত্রিকে থাকতে বলা হোক। খাতা কলম নিয়ে চাঁদার লিস্ট করা হোল। গ্রামটাতো আর বেশী বড় নয়, হাজার তিনেক লোকের বাস। তারসাথে কি কি জিনিষ চাই সেটারও লিস্ট তৈরী। আগামীকালই অর্ডার নেওয়া হবে। পূজোর বেশী দেরী নেই। তার আগেই নতুন মন্দির ও আটচালা তৈরী করতে হবে। এমনি দেখতে দেখতে প্রায় রাত দশটা বেজে যায়। সকলেই উঠতে থাকে। ঠিক তখন গোপালের ঠাকুমা আর্জি জানায়, রাতে বাড়ীতে চারটি সেবা করে তবেই যাওয়া যাবে। রামচরণ খুড়ো, বংশী কিন্তু কিন্তু করছিল। সেটা কেটে গেল ওদের সাদর অনুরোধে। ভোলনাথ, মুরালী আর যারা ছিল, মায় ভোলানাথের মাকেও ছাড়েনি। গতকালের মতো আজও আসন পাতা হয়েছে। আজও খিচুড়ী, আজ ডিম ও কপির তরকারী সাথে তিলের বড়া। সকলেই খেতে বসেছে, সকলেই আনন্দে খাচ্ছে। তারিফ করছে রান্নার, তারিফ করছে এই মানবিকতার। গোপালের ঠাকুমার কথায় — মানুষকে খাইয়ে যা আনন্দ হয়, সেই আনন্দের সাথে কোনকিছু আনন্দের তুলনা হয় না।

ঠাকুমা আরও বলে — আজকের ব্যবস্থা হচ্ছে এই বাড়ীর মেয়েদের, শুধুমাত্র পারমিশান নিয়েছে সেজ ছেলের।

সকলে বুঝে, কথা চলাকালীন মেয়েরা একবার ডেকেছিল তাকে, রামচরণ খুড়ো, নিতাই খুড়োরা জানায় বড্ড ভাল তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা, একেবারে মা অন্নপূর্ণা, ওরা সত্যিই বড়মনের। ভোলানাথ জানায় খুঁড়ো কথাটা একেবারে খাঁটি, আজকাল আমরা, বাড়ীতে পাত পেতে খাওয়াতে যেন ভুলেই যাচ্ছি। জান খুড়ো এটা একটা ভীমন ভাল জিনিষ।

ভোলানাথের মা বলে — সত্যিই তোমরা ভাগ্যগুণে এরকম মেয়ে পেয়েছিলে তা না হলে এমন করে কেউ বিনা নিমন্ত্রণে কেউ পাত পাড়তে পারে। সত্যিই সকলের বাড়ীর মেয়েরা যদি এমন হোত। এখনকার বৌ-এরা শ্বশুর-শাশুড়ীকে একমুঠো ভাত দিতেই চায় না আর অন্য লোককে তো কথাই নেই।

রামচরণ খুড়ো — গতকালের চেয়ে আজ আরও ভাল রান্না হয়েছে। দেখা যাচ্ছে - *বেশী লোক হলে বেশী ভাল হয়।*

বংশী — সত্যিই রান্নার হাত আছে ভালই।

নিতাই খুড়ো — রান্নতো ভালই হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল বলতে হবে মহিলাদের মানসিকতা।

মহা আনন্দে, মহাভোজ শেষ হয়। পানের ব্যবস্থাও হয়েছে। পান মুখে নিয়ে, ওরা শেষবারের মতো বলে গেল, আগামীকাল থেকে যে যার কাজে লেগে পড়। এখন চাষবাস নেই ফাঁকা হাত পা। সকলে চলে গেল। কালু-বৈরাগী দেখতে থাকে ওদের সবকিছু গতিবিধি। ওদের সবকিছু ভাল লাগছে। যেন জোয়ার এনেছে। কালু ভাবে এই জোয়ারটাকে ধরে রাখতে হবে। জোয়ারটা ধরে রাখলেই সবকিছু হয়ে যাবে। গ্রামটাও জেগে উঠবে। রবি খোঁড়া একসময় বলে - অনেক দেখেছি গাঁয়ে এরকম কোনদিন দেখিনি। যারা সামান্য পয়সা দিতে কাঁদে, তারা কিভাবে এত এত টাকা চাঁদা দেবে বলছে ভাবতেই পারছি না। কথা ও কাজে কতটা হবে সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানে।

কালু — দেখ। মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখো

রবি — অনেকতো দেখলুম।

কালু — পরিবর্তনই জগতের শেষ কথা। কখন কার পরিবর্তন হবে, কেউ জানে না। এইতো দুদিন আগে আমি ছিলুম সংসারী, আজ বৈরাগী।

রবি — সেটা ঠিক। কিন্তু।

কালু — কোন কিন্তু নয়, বিশ্বাস রাখো, মা কালীই সব ঠিক করে দেবে।

রবি — তা ঠিক! মা-ইতো সবঠিক করে দেবে।

আমরাতো আগামী কাল থেকে শ্মশানেই থাকছি।

কালু — সে কথাইতো ঠিক আছে। আগামী কাল ওখানে আমাদের রান্না হবে। ওখানেই আমাদের থাকা হবে। কি ভাই ওখানে থাকতে পারবে না।.

রবি — থাকতে পারবো বলেই তো এসেছি। ওখানে থাকবার জন্য মন ছটফট করছে। লোকালয়ে থাকতে বেশ কষ্ট হয়।

কালু — কেন বলতো, ছেলেদের ভয়ে।

রবি — সত্যি, ছেলেগুলো যা পিছনে লাগে, তাতে ভীষণ খারাপ লাগে।

আজও এসেছে মহিলারা, পূজো সারা হলে, ভীত কাটা হবে। রান্নাও চালানো হবে। আজ অনেকে এসেছে, ছেলে বুড়ো, মহিলারা, সকলেই দেখতে চায় কালুকে। সকলেরই চোখের সামনে ভাসতে থাকে কালীমন্দির। উৎসব, অবশেষে ভাসতে থাকে উৎসবের শেষে খেচুড়ি আর লুচি বন্দে। অনেক ফল-মুল, মিষ্টি, চাল এসেছে,. কুড়ি পঁচিশটা থালা এসেছে। কালুরও মন্ত্রের জোরও যেন আর বেশী, সকলেই মোহিত পূজায়। যেন জেগে উঠেছে মহাশ্মশান, মহাকালী . . . জেগেছে মহান জনগণ। ভোলানাথ ও রামচরণ খুড়ো, নিতাই খুড়ো, গোপালের বাবা ও অন্যান্য মাতব্বরেরা কালী মন্দিরের স্থান নির্বাচন করে। ভিতের পূজোও হয়। মাপজোপ শুরু হয়। মানানসই মন্দিরের জন্য আলাদা করে নাটমন্দির যা আটাচালা ছাড়াছাড়া হয়। এসেছে গাঁয়ের গরীব ও ছোট জাতের মানুষেরা ওরা ভিত কাটবে। গতর খাটালিই ওদের চাঁদা। ওরা বলেছে কামিন মজুর ওদের। পূজো সারা, প্রসাদ বিলি হওয়ার পর ভিত কাটা হবে। গোপালের মা চাল আলু আলাদা করতে বলে। কালু জানায় তাকে ঠিক

করে দিতে। গোপালের মাও, মেজকাকীমা, কালীপিসি, ভোলানাথের মা আরও অনেকে, কত নাম আর বলা যাবে। ওরা সকলে মিলে চাল আলু, আলাদা করে চিঁড়ে ও ফল মিষ্টি একসাথে মাখিয়ে কালীপিসি প্রসাদ দেয়। প্রসাদ খেয়ে মাপ দেখে হীরু মিস্ত্রি। শাল পাতার ঠোঙায় প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে, আজ কালীপিসি, একটা ছোট গামলায় কেজি তিন চিঁড়ে, গুড় আর দুধ এনেছে, আরও অনেকে চিঁড়ে, ফল, মিষ্টি সব একসাথে মাখিয়ে ঠোঙায় দেওয়া হচ্ছে। প্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত সকলে, জায়গা নির্বাচন শেষ হল, বটগাছ হতে কিছু দূরে। কিন্তু বটের ছায়া নাট মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। সামান্য একটু মাটির আস্তরণ ফুট তিনেক হবে, নীচে পাথর। বোধ হয় ঘন্টা চারেকের মধ্যেই ভিত কাটা শেষ হবে। আগামীকাল নয় আজ বিকেলেই নিকটেই পাথরের খাদান থেকে পাথর কাটা শুরু হবে। বিকেলে নদী থেকে বালি তোলা হবে। এ কাজটা বলেছে গাঁয়ের খেটে খাওয়া মহিলা শ্রমিকরাই করবে।

পুরুষ শ্রমিকরা বলেছে তারা কালো কালো পাথর খাদান থেকে একেবারে মায়ের থানে পৌঁছে দিয়ে যাবে। ভোলানাথ বলেছে আট দশটা গরুর গাড়ী করে সিমেন্ট আনতেই হবে আর ঐ গাড়ীতে করে ধানের খটিতে, চাঁদা আদায় করার ধান যাবে।

গোপালের মা, কাকীমারা রান্নার সরঞ্জাম এনেছে। কালুর রান্নার অভ্যাস নেই। মহিলারাই উনুন ধরিয়ে দেয়। হাঁড়িটা চাপায় কালু। রবি খোঁড়া ওদের আশ্বস্ত করে ওনিয়ে ভাববেন না, আমি তো রাঁধতে জানি, আমি সব দেখিয়ে পড়িয়ে নেব। গোপালের মেজকাকীমা ব্রাহ্মণের হাঁড়ি ছুঁতে নিষেধ করে। রবিও জানায় আর সে সাহস হবে না। আজ ভাতে ভাত রান্না হবে। তরকারী আলুভাতে, পোস্তও আনা হয়েছে। ছোটকাকী হুকুম দেয় একটা লোককে শিল নোড়াটা কাঁসাইয়ের জলে ধুতে। সে ধুয়ে আনে। কাকীমা পোস্ত বেঁটে দেয়। এরপর মহিলারা নির্দেশ দিয়ে বাড়ী চলে যায়। রান্নাও চলতে থাকে। রবির নির্দেশে ভাত নামায়। ফেন ঝাড়া হয় না। আজ মাড়েভাতে, পোস্ত আর আলুভাতে। গোটা তিনেক স্টেনলেস স্টিলের থালা ও একটা গ্লাস আর একটা বালতী ওর সাথে একটা মাটির কলসী, মোটামুটি সব ঠিক আছে। অনভ্যস্ত হাতে ভাতের হাঁড়ি নামায়। পোস্ত ভেজে নেয়। রবি এখন ডিরেকটার। রবির ডিরেকসনে নুন দেয়। রান্না শেষ। এখন খিদে নেই বেশী চিঁড়ে প্রসাদ খাওয়া হয়েছে। রবি বলেছে লোকজন সব ফাঁকা হোক, খিদে পেলে পরে খাওয়া যাবে। রবিকে এখানেও ছাড়ে না ছেলেরা। একটা ছেলে তাকে দেখিয়ে বলে "হাদেখ খাঁদা মুচির পাঁটা।" রবি তেড়ে যায়। ভোলানাথ ছেলেদের শাসায়, রবেকে রাগালে তাদেরকে আস্ত রাখবো না। রবি খোঁড়ার শ্মশানে এসেও শান্তি নেই। ভীতটা কাটতে দুটো আড়াইটা বেজে গেল। ভীত কেটে একেবারে সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেল। যাবার বেলায় বলে যায় -- বিকেলে খাদানে যাবে আরও সংখ্যায় বেশী। সকালে খবরটা না জানায় বেশী সংখ্যায় আসতে পারে নি। বিকেলে সংখ্যাটা বাড়বে। আরও হইচই হবে। যখন ভীত কাটা হচ্ছিল তখন দেখা যায় ভীষণ উত্তেজনার সাথে হৈ চৈ। মনে হয় যেন দীর্ঘ দিনের মনের বাসনা পূরণ হচ্ছে। ঠাকুর দেবতাও পাঁচজনের কাজে এদের উৎসাহ একটু বেশী অন্যের চাইতে। যে কোন কাজে যখন নেমে পড়ে তখন নিজের কাজই মনে হয়। কাজে নামলে কাজের প্রতি

মমত্ব যেন বাড়ে, আন্তরিকতাও বাড়ে। কাজে নামি নামি করলে কাজ হয় না, নেমে গেলে কাজ হয়। ওদের সাথে গোপালের বাবা, রামচরণ খুড়ো, ভোলানাথ, মুরালি, বংশী, নিতাই খুড়ো বাড়ী ফেরে। হীরু ফিতে দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভীতগুলো কাটিয়ে নেয়। ভোলানাথ সকলকে জানায় কাল সকালেই ধানের গাড়ী যাবে। আদায় করতে হবে আজ রাতেই। যাদের খুচরো ধান তাদের পরে যাবে।

ডাল দিয়ে গেছে। ওরা ডাল করে না। রবির নির্দেশে আজ ফেনভাত। রবি চট পাতে, পিঁড়ের নীচে। বটের ছায়ায়। কালু আর একটা চট পাততে বলে। রবি জানায় আর চট্ নাই, আরও জানায় সারা জীবনই মাটিতে খেয়ে দিন গেল। ওরা খেতে বসেছে। রান্না করতে করতেই মনটা ভিজে উঠছিল। বাড়ীর জন্য, মায়ের জন্য, বৌ-এর জন্য, বাড়ীর বৌদিদের জন্য। স্বপ্নেও ভাবেনি তাকে এরকম ভাবে রাঁধতে হবে। ছোট খাট দৃশ্যও চোখের সামনে ভাসতে থাকে বিশেষ করে বৌ অর্থাৎ জবার রান্নার কথা। রাঁধতে রাঁধতে খুন্তি নাড়ার, যেন একটা সুর খুঁজে পেত, বিশেষ করে শিলে যখন বাঁটা হোত কোন কিছু, তখনই জবার শরীরের ছন্দটা তাকে বার বার নাড়া দিত। আর এমন পরিপাটি করে খাবার থালা সাজিয়ে দিত, বোনা বাঘের আসন পেতে। কি ভালই যে লগাতো। খেতে দিতে দিতে শেষে এমনটা হয়ে গিয়েছিল যে, জবা ছাড়া অন্য কেউ খেতে দিলে মন ভবতো না। রাতে সব একসাথে, দাদারা সকলে, মেয়েরা পরে। খেতে খেতে আনমনা দেখে রবি জানায় কালুভাই কি এতো ভাবছে। উত্তরে জানায়, না তেমন কিছু না। রবি জানায় - যা বোঝবার বুঝেছি। কালুদা তোমার কি বাড়ীর কথা মনে পড়ছে?

কালু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে — হ্যাঁ।

— মনতো খারাপ হবেই। এতো দিনের টান সহজে কি ছেঁড়া যায়। তবুও তুমি এই বয়সে সবকিছু ছিঁড়ে এসেছেন। সেটাই যথেষ্ট। আমার কি মনে হয় জানো, কালুদাদা এখন কার সংসার অসার। সংসারের যেন প্রাণ নেই। ভাইয়েরা, দাদারা, বাবা, জেঠা, খুড়োরা আর মেয়েদের তো কথাই নেই, সকলেই নিজের আখের গুছোতে ব্যস্ত। তাই সব আলাদা হয়ে যাচ্ছে। যদিও গাঁয়েতে খুড়ো জ্যেঠা, জেঠি, খুড়ি, ঠাকুমা পিসিদের দেখা যায়, শহরে সেটাও দেখা যায় না। শহরে ছোট্ট সংসার, মা, বাবা এক ছেলে কি এক মেয়ে। তাই শহরের ছেলে মেয়েরা আস্তে আস্তে বোধ হয় ওই মধুর মিষ্টি সম্পর্কগুলো জানবেই না। পাড়াগাঁয়ে এখনও সম্পর্ক ধরে ডাকা হয়। সেটাতেও ঘাটতি পড়েছে। দেখ না আমার নিজের ভাইদাদার ছেলেরাও আমাকে রবি খোঁড়া বলে, আর কত কি? আর মায়েরাও হিঃ হিঃ করে হাসে। আবার দেখ গোপালের বাড়ীতে গেলে মনে হয় সোনার সংসার, গেলে দু-দণ্ড বসতে ইচ্ছে করে। গাঁয়ে গোপালদের বাড়ী আর ভোলানাথদের বাড়ী ছাড়া গোটা চারেক এরকম বাড়ী আছে। আবার কোন কোন বাড়ীতে ঠোকাঠুকি চলছে। কবে দেখবো হাঁড়ি সব আলাদা হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি, গোপালদের, ভোলানাথদের আর কালীপিসির বাড়ীগুলোতে এখনও শান্তি আছে। গেলে বসতে ভাল লাগে দু-দণ্ড। গাঁয়ের মানুষগুলো ওদের মতো কেন যে হয় না।

কালু — সকলেতো আর গোপাল, আর ভোলানাথ নয় . . .। নিজের স্বার্থের আগে সংসারের স্বার্থ। আমিই কি এখানে এসে থাকতুম যদি আমার বাড়ীর লোকজন গোপালদের

মতো হোত।

রবি — তা ঠিক। বাড়ীতে তোমার কে কে আছে দাদা?

কালু — সবাই আছে, মা, দুই দাদা, দুই বৌদি, ভাইপো ভাইঝিরা পিসিমা।

কালু আর কথা বলে না। বাড়ীতে আর যে ছিল, তার মুখটা মনে পড়তেই কেমন যেন হয়ে যায়। মনে পড়ে যায়, বাঘের আসনে বসে খাওয়া, আর পরিবেশন কর্ত্রী - তার বৌ জবা। শেষের দিনে জবা আর খেতে দিত না। যেদিন মেজবৌদি খেতে খেতে জানায় তরকারী তো কম পড়তেই তো ঠাকুরপোকে গাদা গাদা তরকারী দিলে . . .।

জবা সেদিন বিছানায় কেঁদে ছিল কাউকে কিছু না বলে। জানিয়েছিল স্বামীকে। তার ভীষণ ভাল লাগে তাকে খাওয়াতে। মনে হয়নি অপরের কথা। পরে জানায় অপরের কথা মনে হওয়ার দরকার ছিল। নানা আছিলায় তাকে একা খেতে দিত না। খেতে দিত যখন সকলে একসাথে খেতো।

পরে সে মেজ ও বড় বৌদিকে জানিয়েছিল, অপরের কথা না ভেবেই সে এরকম করেছিল। দেখবে আর হবে না। জবাও সুখের সংসার গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু সংসার তো আর গড়া হোল না। সন্তানসহ মারা গেলে, তাদের সংসারও সুখের করতে পারতো। কেউ না পারুক অন্তত জবা করতে পারতো। নাইন টেন পর্য্যন্ত সে পড়েছিল। বাড়ীর সকলের কথা সে ভাবতো। সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর দিত। একমাত্র আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আলাদা ছিল। সেদিন থেকে শুধরে গিয়েছিল। মা ছোটবৌ-এর প্রশংসা করতো। এটাই হয়তো সংসারের কাল হয়েছিল। প্রায়ই বৌদিরা মায়ের সাথে কথা কাটাকাটি করত পরে দাদারাও সায় দিত এভাবেই সংসারের তিক্ততা অন্তিম পর্য্যায়ে এসেছিল। ঠিব এই সময়ের মধ্যে জবা হারিয়ে গেল সন্তানসহ। সংসারে এতটুকু শন্তি ছিল না। ছয় মাস হয়ে গেল মৃত্যুর পর, কোন কাজে মন লাগে না। শেষে একদিন দুই দাদা এমনকি মা বকুনি দেয়। মা বলে - "মাঠে মুড়িটাও পৌঁছতে পারবি না, শুধু শুয়ে থাকবি। বাড়ীর ছেলেদেরও পড়াতে পারবি না পর্য্যন্ত। আমি যে আর সইতে পারছি না।"

আমার সংসারেও মন নেই। বিয়ের কথা বললেই জবার ডাগর ডাগর চোখগুলো ভেসে আসে মনে। চোখের ভাষায় বলে, "কোন দিন কোন মেয়েকে স্থান দেবে না মনে, তুমি কেবল আমারি।"

সুখের সংসার আর গড়া হোল না, অকালে চলে গেল। আর সংসারের অশান্তিও আমাকে সংসার থেকে দূর করে দিলে, সেজন্য দায়ী আমি নিজেই, যদি সংসারের কাজকর্ম একটু দেখতুম। যাক্ যা হয়েছে হোক্। সংসারটা সুখে থাক্ এটাই চাই। কথায় কথায় খাওয়া শেষ হয়। রবি থালাগুলো তুলে নিয়ে নদীতে ধুতে যায়। যদিও বাধা দেয় কালু, তবুও শোনে না রবি। শুধু বলেছিল — "এসব কাজ আমার, রান্নার কাজ তোমার।"

আজ পূজোতে যা চাল হয়েছিল তাতেই দিনদুই চলে যাবে। বোধ হয় যারা পূজো দিতে এসেছিল তারা এসব ভেবেই বেশী করে চাল আলু দিয়ে গেছে পূজাতে।

রবি বিড়ি ধরায়। কালু শিবুদার বউএর দেওয়া সতরঞ্চিতে শুয়ে পড়ে। দৃষ্টি নদী কিনারে। এখানে নদীটা একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। নদী গর্ভ তাই গভীর, এপারে আশ্রম - ওপারে গাছ পালায় ভর্ত্তি - পাথরের টিলা। টিলার দুপাশে শাল

মহুয়ার বন। বেশ লাগে শুয়ে শুয়ে দেখতে। ড্যামের কল্যানে প্রায় সারাবছর জল বয়। তাছাড়া নদীটা এখানে একটু বাঁক নিয়েছে, সে কারণে একটা দহের মতো আছে। লোকে বলে, এটা কখনো বুজে যায় না। দহের নিকট খাড়া পায়ে কোন মাটি নেই শুধু কালো, সাদা পাথর আর সেই পাথরের ফাটলে কুটুস ইত্যাদি গাছ আর উপরে মাটির আস্তরনে রয়েছে শাল, কেঁদ গাছ। জায়গাটা এক বাক্যে মনোরম। আশ্রমের পশ্চিমপ্রান্ত একটু ঢালু, বোধ করি উপর থেকে পাহাড়ের জল সরাসরি একটা নালার মাধ্যমে পড়ে বলে। পরে অবশ্য জানতে পারে দক্ষিণে দুই টিলার মধ্যবর্ত্তী জায়গা থেকে ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছে। আর একটা জিনিষ সে পরে দেখেছে ঐ ঝর্ণা তীরের উঁচু জায়গাতে টপকাতে গিয়ে ওখানে একটা বিঘে দুই জায়গায় ছোট বাঁধের মতো তৈরী হয়েছে চারপাশে পাথর ও মাটি মাঝখানে ছোট জলাশয়। জলের চারপাশে ছোট ছোট নানা ফুলের ও কাঁটার ঝোপঝাড় আর তারপরে বনের স্বাভাবিক গাছ শিমূল, শাল, মহুয়া, পলাশ, কেদ এসব গাছ। জায়গাটা ভীষণ আকর্ষণ করে। বিশেষ করে কাজলকালো জল আর জলে শাপলা শালুক ইত্যাদি। যেদিন প্রথম দেখেছিল সেদিন কি ভালই না লেগেছিল। বাঁধের তীরে একটা উঁচু জায়গায় পাথরের উপরে বসে সেই কাকচক্ষু নীল জলে শাপলা শালুকের সাথে নীলাকাশের মেঘের ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে তাকিয়ে থাকা যে কি সুখকর একমাত্র সেই জানে। এখানে আসার অনেক পরে সেটা সে আবিষ্কার করেছিল ঘুরতে ঘুরতে। আবিষ্কার বৈকি কেউ তো তাকে বলে দেয়নি ওখানে সেরকম বাঁধ আছে। যা মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। আশ্রম থেকে প্রায় কিলোমিটার খানেক দূরে। শুয়ে শুয়ে দেখতে ভাল লাগছে ফাল্গুনের নদী তীরের দুপুরের শোভা। অপূর্ব লাগে। গাঁয়ের লোক স্নান সারে দহে, গরু বাছুর মহিষের গা ধোয়ায়। আবার ওপারের কাঠুরিয়ারা বোঝা মাথায় নদী পার হয়। মনে হয় - ওপারে ঘন বন নেই। গাংশালিকের, গাঁ চিলের ডাকের সাথে ঘুঘুর ডাকে মুখরিত নদী প্রান্তর। কিছুতেই ঘুম আসছে না। ভাবে আজতো না হয় চলে গেল চালে, কালও চলবে তারপর কি হবে? ভিক্ষেতো সে কোনদিন করেনি, কোন অভিজ্ঞতা নেই। পরক্ষণেই হাসি পায় ভিক্ষার আবার ট্রেনিং। ভিক্ষার অধিকার তো জন্মগত। মানুষ জন্মের সাথেই ভিখারী। জন্ম মূহুর্তে কাঁদতে কাঁদতে জানায় মাতৃস্তনের ভিখারী। মৃত্যুতেও। বিশেষ করে পরকালের যাত্রী। ছেলের হাতের জল বা গঙ্গা জল। জন্ম থেকে মৃত্যু, মানুষ ভিখারী। এরই মাঝে সে ধনের ভিখারী জনের ভিখারী, রূপের ভিখারী, আবার কেউ কেউ যশের ভিখারী। আর আমরা ভিখারী বলতে বুঝি হরি বললেই, কাঁড়া চালের ভিখারী। কিন্তু আসলে আমরা সকলেই ভিখারী রাজা উজীর থেকে গরীব ভিখারী পর্য্যন্ত। কেবল নয় বোধ হয় এক যথার্থ পাগল ছাড়া। হয়তো কিছু চায় আমরা বুঝি না, সেটা বোঝার মত আমাদের হৃদয় নেই। বোধ হয় ঈশ্বরকে অতি চাওয়াতেই রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপারা . . . ওরা সব পাগল সাধক, . . . চণ্ডীদাস, নিতাই ওরা প্রেমের ভিখারী পাগল, আর্কিমিডিস থেকে আইনস্টাইন ওরা সব জ্ঞানের ভিখারী পাগল। ভিক্ষুক থেকে ধনী রাজা সকলেই পাগল . . . অর্থ, শক্তি, দম্ভে, যশের ভিখারী সকলেই, - ভিখারী না হলে জগতে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে হয়তো প্রেমের পাগল সেরা পাগল, প্রেমই তো জগতের সব ধনের সেরা ধন। তাইতো স্বয়ং ভগবান, প্রেমের

ভিখারী রাখাল কানাই। রাখাল কানাই তাঁর মোহনবাঁশী বাজিয়ে প্রেম ভিক্ষা করে। মোহনবাঁশীর সুরের ঝঙ্কারে কত রাধার হৃদয়ে সমুদ্র বয়ে যায়। মোহনবাঁশীর শব্দ ভেদী প্রেমের বানে শুধু মরমে প্রবেশ করে না একেবারে গেঁথে যায়। রাধারা কি ভিক্ষা না দিয়ে পারে। চাওয়ার মতো চাওয়া হতে হবে। তবেই না ভিক্ষা মিলবে। আর কাঁড়াজব তো তুচ্ছ জিনিষ। মন সিদ্ধান্ত নেয়, আগামী কাল সে ভিক্ষায় যাবে নিশ্চয়ই।

বিকালে কেউ এলো না, একেবারে সন্ধ্যার মুখে গোপাল এলো, কালুকে নিয়ে যেতে। হাতে ছিল একটা নতুন লণ্ঠন, একটা খেজুরের তালাই আরও টুকিটাকি জিনিষ।

কালু জানায় — যদি না কিছু মনে কর তাহলে আমরা যাব না।

গোপাল — কেন যাবেনা?

কালু — এখানেই চারটি চালে ডালে ফুটিয়ে নেব। যেতে ইচ্ছে করছে না।

গোপাল — ঠাকুমার কড়া নির্দেশ, চারটি খাওয়া দাওয়া করেই তবে আসবে।

কালু — দিন, দিন এভাবে ভোজ খেলে তো আমার ভিখারী হওয়া হবে না।

গোপাল — ছিঃ ভিখারী বলছ কেন নিজেকে?

কালু — জান গোপালদা এখনই ভাবছিলুম - জগতে কে ভিখারী নয়। ভিখারী থেকে রাজা বাদশা সকলেই ভিখারী। কেউও বাদ নয়। যেখানে স্বয়ং মহাদেব ভিখারী আবার রাখাল কানাই সেও ভিখারী। নিজেকে ভিখারী ভাবলে সহজেই নিজেকে সমর্পিত করা যায়। কোন গরিমা বা অহংকার থাকলে তার কাছে সমর্পণ করা যায় না।

গোপাল — এসব তত্ত্ব কথা বুঝি না ভাই। ঠাকুমা বলেছে যে কালাচাঁদকে ডেকে আনতে। আজকের রাতে চল অন্যদিন দেখা যাবে।

রবি — কালুদা! আজ চল, ঠাকুমা যখন বলেছেন। না গেলে মনে ব্যথা পাবেন।

কালু — তুমি বলছো যখন, তখন না হয় যাচ্ছি। আচ্ছা ঐ দিকের খবর কি?

গোপাল — কিসের খবর?

কালু — চাঁদা আদায় ইত্যাদি ব্যাপার?

গোপাল — সে আর বলো কেন? এখনই বস্তা নব্বুই আদায় হয়ে গেছে। দশ ঘর পাঁচ বস্তা করে, পাঁচ ঘর চার বস্তা আর দুই এক বস্তা করে কম করে ত্রিশ বস্তা হয়েছে। প্রায় একশ পার হয়ে যাবে। এদিকে খাদানে পাথর কাটাও শুরু হয়েছে প্রায় শতখানেক লোক গিয়েছিল। মেয়ে শ্রমিকরা বলেছে ওরা আগামী কাল যত বালি লাগে নদী থেকে তুলে দিয়ে যাবে। পরে আরও কম করে বস্তা ত্রিশ খুচরো ধান আদায় হবে। মায়ের মন্দিরের কথা বলতেই সকলেই রাজী হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোন রাজনীতির পার্টি নেই। সবাই একনীতিতে চলছে - মন্দির চাই। এখানে কোন রাজনীতি চলবে না। চালালে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিযে হাওয়া বইছে তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আর চাকুরী বাবাজীবনেরাও প্রায় হাজার দশ টাকা দেবে।

রবি — জয় মা কালী! মা আমার জেগেছে। আজকে তো আমি ঘুমুতেই পারবো না।

গোপাল — তুমি ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছো। সত্যি বলছি, মনে মনে বারবার হিসেব হচ্ছে, কত বস্তা আর কত টাকা। মন আমার এখন সিমেন্ট নয়, মোজাইকেও নয়, মন আমার মার্বেলে। এই মাত্র গোপাল ভোলানাথ খুড়োর সাথে কথা হোল। ভোলানাথ

খুড়ো কথাটা কাউকে জানাতে নিষেধ করেছে। কাজে নেমে একেবারে অবাক করে দিতে চায়। ভোলা খুড়োর বাড়ীতে আজ সবাই বসেছে। যাবার পথে একবার গেলেই হবে। রাততো হয়ে গেল চলইনা এখনই।

রবি — কালুদা - চল - আমরা এখনই যাই। মনটা ছট্‌ফট্ করছে।

কালু — আমারও কি কম আকুলি, বিকুলি করছে মনটা। তাই বল্।

কথা বলতে বলতে ওরা পৌঁছে যায় ভোলানাথের বাড়ীর নিকট। পৌঁছেও যায় বৈঠক খানায়।

ওদের সাদের আহব্বান জানায়। কালু গিয়ে বসে একটা মেঝেতে। কথাবার্তা চলছে পুরোদমে। অনেক আলাপ আলোচনা অনেক সময় শেষে। স্থির হোল - ১১খানা বাড়ীতে একশ কুড়ি বস্তা ধান যাবে। আবার গাড়ীতে মিস্ত্রির হিসেব মতো সিমেন্ট ও রড আসবে। মুরালি, ভোলানাথ, গোপাল, বংশী ও গাড়ীতেও যাবে উৎসাহী ছেলে ছোকরারা। শেষে একজন বলে যে টাকা আদায় হবে মনে হচ্ছে এতটা টাকা লাগবে না।

ভোলানাথ জানায় — বাড়লে ক্ষতি নেই। দেখ বাব! এখন থেকেই বাড়তির জোয়ার দেখলে দেউলে হয়ে যেতে হবে। তুমিতো কমিটিতে আছ, বাড়লে ভালকাজেই লাগবে। এখন এমন কথা শুনলে চাঁদা আদায়ের হারটা কমে যেতে পারে। ভাই মদন এখন এসব চিন্তা থাক।

গোপাল ভাই মদন এখন থাক না এসব কথা।

মদন — কথা না বুঝেই বলেছি, দাদা। কিছু মনে করবেন না।

ভোলানাথ — মদন ভাই, ভাল কাজ করা সহজ না। খারাপ কাজ করতে বেশী সময় লাগে না। একটা কথায় বোধহয় অনেকের মনে সন্দেহ থাকছে . . .।

রামপদ খুড়ো — মদনের কথায় কিছু মনে করার নেই। ও এমনিই কথাটা শুধু বলেছে। ও অতশত জানে না এতে চাঁদা আদায়ের হার কমে যেতে পারে।

ভোলানাথ — খুড়ো - ঠিক কথা। তবুও একটা কথা বলে রাখি। আমি চাই মন্দিরটা ভালভাবেই হোক একটা কাজের মতো কাজ হোক।

আমাদের সকলের সেটাই ইচ্ছে। অনেকে ভাবতে পারে এই টাকার মধ্যে হয়ে গেলে, আমি ছাদের জন্য যেটাকা লাগবে সেটা হয়তো দেবোই নাই, সে টাকাটা আমি দুইচার দিনের মধ্যেই মিস্ত্রীকে খরচ জেনে নিয়ে রামচরণ খুড়োকে জমা দেব। যদি টাকা বেশী বাড়ে তাহলে ফ্লোরগুলো মোজাইক না হয় মার্বেল দেওয়া হবে। যখন মা দিচ্ছে তখন ভাল করেই হয়ে যাক ভাই।

মদন — ভোলানাথদা আর উচ্চারণ করবে না এ বিষয়ে আমি ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি। ওটা আমি সাধারণ ভাবেই বলে ফেলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। শ্বেতপাথর তো কল্পনাই করতে পারছি না।

কিংকর খুড়ো বললেন - দারুণ হবে।

রামচরণ খুড়ো — আগামীকাল কাকে কি করতে হবে কার কার গাড়ী ও কে কে যাবে সবঠিক হয়ে গেছে, তোমাদেরকে একটু সকাল সকাল যেতে হবে। ফিরে আসতে

আসতে মোটামুটি বিকেল হয়ে যাবে। মুড়িটুরি বেশী করে নিয়ে নিও। আমি বাড়ি থেকে মুড়ি পাঠিয়ে দেব।

ভোলানাথের মা এবার ওদের কাছে এসে বলে — তোমরা কেউ চলে যাবে না। তোমরা আমাদের বাড়ীতে চারটি খাওয়া দাওয়া করে যাবে।

রবি — মা কালী ভালই ব্যবস্থা করছে। ঠাকুমা আজকে কি ভাত না খিচুড়ী।

ভোলানাথের মা — তোর কি হলে ভাল হয়?

রবি — গরম গরম খেচুড়ি। তবে ভাত হলেও ক্ষতি নেই।

ভোলনাথের মা — যা পাবি গরম গরম, তা যাই হোক।

রামচরণ খুড়ো — রবি যেটা বলেছে, মা কালী ভাই সব জুটিয়ে দিচ্ছে। প্রভাতে হঠাৎ এর সাথে এতগুলো লোক গল্পে গল্পে খাওয়ার আনন্দ ভীষণ হচ্ছে। যেন উৎসব এসেছি।

মরালি — জিনিষটা কিন্তু দারুণ হচ্ছে। খেতে খেতে মনে হয় ঠিক যেন পৌষুলি করতে এসছি। আমার বাড়ীতে একদিন সকলের সেবা করবো বলে মনে করছি। এগুলো লোকগুলোকে খাওয়াতে সত্যিই আনন্দের ব্যাপার।

বংশী — সত্যি কথা। এটা ভীষণ আনন্দের ব্যাপার। বিশেষ করে হঠাৎ হলে। এই যেমন, জ্যেঠাইমার আমন্ত্রন।

নিতাই খুড়ো — সত্যিই শেষের এই দিনগুলো যে এমন করে কাটবে ভাবতেই পারিনি। এক একটা রাতের এমন ভোজ যেন বার বার অতীতে ফিরে যাচ্ছি।

রামচরণ খুড়ো — আর কি হচ্ছে জান একদিনে এই আনন্দ যজ্ঞে মনে হয় আমাদের পরমায়ু এক একটা বছর বেড়ে যাচ্ছে।

গোপাল — দাদু তাহলে, তোমাদের তো মরতেই দেওয়া যাচ্ছে না। বছরে অন্তত একবার সেবা নিতে কষ্ট হবে না, তোমাদের আশীর্বাদে।

সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে - বলে, গোপাল একটা দারুণ কথা বলেছে।

বংশী — আর কি হবে বলতে পারো?

নিতাই খুড়ো — কি হবে?

বংশী — বলই না।

রামচরণ খুড়ো — বল না বংশী, আর কি হবে?

বংশী — কি হবে, তোমাদের বেড়াবার আড্ডা, বুড়োরা বসে বসে হুঁকো টানবে আর কাশবে।

রামচরণ খুড়ো — ঠিক, ঠিক কথা, তবে বংশী আড্ডা না বলে বল তীর্থস্থান।

নিতাই খুড়ো — ঠিক বলেছো, আড্ডা নয় তীর্থ। আজকাল প্রায়ই সকলেই বলছে, বাবা তোমরা কাজকর্ম কর একটু - হাটা হাটি কর, কম করে কিলোমিটার তিন।

ভোলানাথ — ঠিকই বলেছো, রেডিয়ো, টিভি পেপারের, ডাক্তার সকলেই বলছে হাঁটতে। তাহলে হার্টের দোষ থাকবে না।

ভোলানাথের মা — এইতো ডাক্তার সেদিন আমাকেই বলেছে, প্রত্যেকদিন কম করে

তিন কিলো মিটার হাঁটতেই হবে হার্টের রোগীদের। ভালই হোল মায়ের কাছে সকালেই যাবো আর উঠে মন্দির ধুয়ে দিয়ে আসবো।

গোপাল — একা যাবে না ঠাকুমা, ওটা শ্মশান।

ভোলানাথের মা — শ্মশানতো কি হয়েছে! ওখানেই তো শেষে যেতে হবে, আগে ভাগেই জায়গাটা জেনে নিলে ভালই হবে। আর আমি কি একাই যাবো সাথে - সাথে তোর ঠাকুর মা, বংশী, মুরলির মা জেঠাইমা যাবে— তোদের সকলের কালীপিসি।

নিতাই খুড়ো — সকালে মেয়েরা, বিকেলে বুড়োরা?

রামচরণ খুড়ো — ঠিক! মা যেন টানছে আমাদের, সত্যি এতে শরীর মন ভাল হবে। জয় মা! মাগো! তোমার কি ইচ্ছা আছে, তুমিই জানো মা! সত্যিই এই ক'টা দিন কিভাবে কাটছে বুঝতেই পারছি না।

ভোলানাথ — সত্যি কথা। সময়টা মন্দির উৎসবের কথা ভাবতে ভাবতেই পার হয়ে যাচ্ছে। আর নতুন নতুন প্ল্যান মাথায় আসছে।

বংশী — দাদা - তুমি একেবারে ঠিক কথা বলছো।

রবি — হঠাৎ বলে! কালীপূজোর দিনগুলো, গোটা গায়ের লোক, ছেলে মেয়ে বৌদি বুড়োবুড়ি সকলে একসাথে খাচ্ছে, আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

গোপাল — রবি আর কিসের গন্ধ পাচ্ছিস্।

রবি — ওঃ গোপালভাই কি যে বলবো, জিভে জল আসছে, গন্ধেতে। গোটা নদী, শ্মশান, ঘি-এ ভাজা লুচির গন্ধ ভরে গেছে। আর বলতে পারছি না।

সকলেই জোরে হেঁসে ওঠে। ভোলানাথের মা জানায় রাত দশটা বাজ্ছে, বেশী রাতে খেলে বৃদ্ধদের শরীর খারাপ হবে। ওরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে। সিমেন্টের উঠোনে কম্বল, শতরঞ্জি পাতা হয়েছে। একটা হ্যাজাকও জ্বালা হয়েছে। একটা কাজের বাড়ীর রূপ নিয়েছে। রবি জানায় সত্যিই বাড়ীতে যেন বড় কাজ হচ্ছে। গোপালের মা উত্তরে জানায় এটা কি ছোট কাজ। এটা কত বড় কাজ একদিন বুঝবে গাঁয়ের মানুষ। কথাটা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেয়। খেতে বসেছে বাড়তি লোক প্রায় জনা পঁচিশ। আজও খেচুড়ি কপি আর মাছের ঝাল দেওয়া।

নিতাই খুড়ো — কিরে, রবি। তুইকি আগে থেকে জানতিস্ খেচুড়ির কথা।

রবি — মনটা বলছিল, খেচুড়ি হলেই ভাল।

নিতাইখুড়ো — মাছ রান্নাটা কেমন হয়েছে বল।

রবি — দারুণ, মনে হচ্ছে মেয়েদের টান পড়ে যাবে খিচুড়িতে।

রামচরণ খুড়ো — আমরাও কম খাবো না। এই কয়দিন বেশ ভালই খেচুড়ি খাচ্ছি। হজমও ভালো হচ্ছে। তা মাছ কোথায় পেলে এত রাতে। আর এক কেজি আধ কেজি নয়। মনে হয় কেজি পাঁচ হবে মনে হয়। একটা পিস্ই একশয়ের উপরে, তার পর দুই পিস্।

ভোলানাথ — আমি এসব জানি না, মা, আর ভাই নির্মলই জানে।

ভোলানাথের মা — খিড়কি পুকুরে এটাই সুবিধে। বাগানটা এক খিয়া দিল তাতেই মিটে গেল। কোন দিন একখিয়াতে একটা মাছ হয় না। সবই দেখছি মায়ের ইচ্ছা।

বংশী — এই তো কালীপিসিকেও দেখেছি।

কালীপিসি — তোরাই শুধু ভাবছিস্। আমরা ভাবছি না বল। আমি কখন এসেছি। এতো লোক। দুটো মেয়েতে সামলাতে পারবে।

বংশী — কালীপিসি, একথা ভাবলে কি করে! তুমিই তো আমাদের এই বড় কাজের একজন হোতা।

মুরালি হাসতে হাসতে — পিসি ও ছোট ছেলে কি বলতে কি বলেছে। জান পিসি রবি, ভোলাদা, গোপালদা, বংশী প্রায় সকলেই নদী ধারে শ্মশানে নয়, এখনই লুচি আর বন্দের গন্ধ পাচ্ছে।

গোপাল — আমরা শুধু পাচ্ছি না দাদুরাও পাচ্ছে।

ভোলনাথের মা — সকলেই পাচ্ছে, গাঁয়ের, ছেলে, বুড়ো, বৌ ঝি . . ., সকলেই সেদিনটার জন্য সবুর সইছে না।

কালীপিসি — ঠিক বলেছ! ভোলার মা।

বলতে বলতে কালুর পাতে একপিস মাছ দিয়ে ফেলেছে। কালুকে বাদ দিয়ে প্রত্যেকে মাছ দুই পিস্ দেওয়া হয়েছিল। খেচুড়ি দ্বিতীয়বার দেখিয়ে আর এক পিস্ করে দিচ্ছিল, হঠাৎ ভুলে কালীপিসি কালুভায়ার (বৈরাগী) পাতে দিয়ে ফেলে। কালুও খাওয়া বন্ধ করে বসে থাকে। ব্যাপারটা সকলের নজরে পড়ে। কালু মাছ ছেড়ে দেবে বলে স্থির করেছিল। বৈষ্ণব, বৈরাগী মানুষের মাছ মাংস ডিম বাদ দেওয়াই উচিৎ। ভোলানাথের মা কাছে গিয়ে বলে কালাচাঁদ ভাই তুমি খেয়ে নাও ওটা। বয়সতো এখনো আঠাশ ত্রিশ হয়নি। নাও খেয়ে নাও। কালী ঠাকুরজি তুমি আর এক পিস্ দিয়ে যাও।

গোপাল — ঠাকুমা তুমি ঠিকই বলেছো। এই বয়সে এসব চলে না।

কালীপিসি — ভাই তুমি কালীপূজো করছ আর মাছ মাংস খাবে না এটা কি হয়।

রামচরণ খুড়ো — কালী আমাদের ঠিক করেছে।

গোপাল — দাদু কেন কালীর কথা বলছো।

নিতাইখুড়ো — কোন কালীর কথা বলছিস্ ভাই তুই।

গোপাল — মা বা পিসি নয় একেবারে শ্মশান কালীর কথা বলছি।

সকলেই জোরে হাসতে থাকে। আঙিনা হাসিতে আনন্দে ভরে উঠেছে। কালুর মনে হয় কে বলে - গাঁয়ের লোক বাঁচতে জানে না, ওরা শিক্ষিত নয়, কে বলে, পাড়া গাঁয়ে জীবন নেই। শহরবাসীদের ধারণা ভুল। মানুষ কতটা শিক্ষিত হলে, অযোচিত ভাবে মানুষ এমন করে খাওয়াতে পারে . . .। কি শহরের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে গলায় গলায় ভাল মন্দ খাওয়া আর সিনেমা বায়োস্কোপ দেখা অপরের সুখ দুঃখের ভাগীদার না হয়ে নির্লিপ্ত থাকা। আক্সের জীবনই কি জীবন! এই আঙিনার হাঁসিতে, পাড়া গাঁয়ে এখনও জীবন আছে, সেটাই তার প্রমান। বর্তমান সভ্যতার যেটুকু জীবন আছে সেটা গাঁয়েতেই।

ভোলানাথের মা — খাচ্ছ না কেন, চুপ করে বসে রইলে যে?

গোপাল — শ্মশান কালী, কালীপিসিকে দিতে বলেছে, তাই দিয়েছে। তুমি খেয়ে নাও, জীবন এখনও অনেক বাকি। নিরামিশ খাওয়ার অনেক সময় পাবে।

রামচরণ খুড়ো — গোপাল যে দার্শনিকের মতো কথা বলছে।

ভোলানাথের মা — গোপাল ঠিকই বলেছে। শ্মশান কালীরই ইচ্ছে . . .।

কালীপিসি — সত্যিই বলছি খেয়ালই হয়নি, হাতটা যেন আপনা আপনি মাছটা দিয়ে ফেললো। জান দিদি সত্যিকথা বলছি।

ভোলানাথের মা — খেয়ে নাও ভাই, সবই তাঁর ইচ্ছে!

গোপাল — কোন মায়ের ভাল লাগে? তার একছেলে শুধু খাচ্ছে আর অন্য বাকিরা গাড়ীর চাকার মতো মাছ দিয়ে খাচ্ছে, বল ঠাকুমা।

হাসতে হাসতে ভোলানাথের মা — তুই দারুণ কথা বলছিস্। তোকে গোবেচারা ভাবতুম। নাতবৌ তোকে বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছে।

এসবে হাসির বাঁধ ভাঙ্গে। মহিলারাও উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে।

রামচরণ খুড়ো — ভোলার মা এভাবে হাসতে হাসতে খেলে যে, মেয়েদের জন্য কিছুই থাকবে না। তুমি ভাই খেলে কেন, মাকালীর নির্দেশ, আর না হলে, দেরী হলে মেয়েরা না খেয়ে থাকলে, সত্যিকারের মাকালী তোমাকে শাপ দিয়ে দেবে।

সকলেই হাসতে হাসতে বলে ঠিক্ ঠিক্।

এতক্ষণ পর গোপালের বাবা কথা বলে — ঠিক কথাই বলছে সকলে, তুমি বাবা খেয়ে নাও।

গোপালের মেজকাকা — তুমি না খেলে, আমাদের খেয়ে শান্তি হবে না, আজকের আনন্দটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

ভোলানাথের ভাই - নির্মল — কালুদা! খেয়ে নাও ওতে কিছু হবে না।

ভোলানাথের বৌ আর একপিস্ মাছ এনে পাতে দিয়ে বলে — আমরা সব শুনেছি বাবা। মাত্রতো তুমি দিন পাঁচ বৈরাগী হয়েছো, এর মধ্যে এত নিয়ম মানলে চলবে কি করে। এখানে কি খাচ্ছ আমরা দেখবো নাতো কে দেখবে?

আর বাধা নিষেধ মানা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে মাছে হাত দেয়। সকলের চোখগুলো চিক্ চিক্ করছে, সকলেই নীরব। পরকে আপন করে নেওয়ার মাঝে চোখ যে সিক্ত হয় সেই সিক্ততা জীবনের লক্ষণ। ছোটবৌ ও মেজবৌ পরিবেশনে বেরিয়েছে। ছোটবৌ এর হাতে খিচুড়ির ঢাবু বালতি আর মেজবৌ এর থালায় মাছ ভাজা। বোধ করি রান্নার মাছ ফুরিয়েছে। ভাজা মাছ আগামী কালের জন্য ছিল। ছোটবৌ মধুর সম্বোধনে কাকু, দাদা, ভাই . . . ইত্যাদি সম্বোধনে চতুরিয়া খিচুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। সকলেই ভাজা মাছ দেখে, আপত্তি করে যাচ্ছে। মেজবৌ জানায় খিচুড়ি পড়ে থাক ক্ষতি নেই। একটা করে মাছ দিয়ে যাচ্ছে। গোপাল জানায় কাকীমা চারচারটে গাড়ী চাকাতে সত্যিই শরীর খারাপ করবে। ছোট বৌ বলে গোপালকে আর একটা দাও, এত যখন প্রশংসা করছ।

সকলেই জোরে হাসতে থাকে, এবার হাসিটা বাঁধ ভাঙ্গা হাসির চেয়ে যদি কোন কিছু সবচেয়ে জোরালো হাসি থাকে সেটাই। হাসিটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে।

গোপাল — মেজকাকী মা, যদি আমাকে দিলে তবে কালুকে আরও দুটো দাও না হলে, তিনটে দাও। তাহলে অন্তত কালু আর আমি সমান হব। এতে আমার বিপদ কম হবে।

ভোলানাথ — বিপদ কেন? আর বিপদের কমই কেন?

গোপাল — কাকু তোমার স্মৃতিশক্তি কম। এই মাত্র আলোচনা হচ্ছিল না, মায়ের কাছে সবাই সমান। কালু আর আমি পাঁচ পাঁচটা মাছ খাব, আর মাকালী কি সেটা সহ্য করবে। এতে বরং মাকালী খুশীই হবে যাক্ আমার পূজারী ছেলেও তো অন্তত পাঁচটা পেয়েছে। তা না হলে মা কালীর রাগ হোত না। ভাবতো গোপাল কি এমন লাটের নাতি যে গোপালকে বেশী দিতে হবে। রামচরণ, নিতাই খুড়ো - গোপাল তুই এতো হাসালে বিপদ হবে। তার মানে মেজ কাকী বেছে বেছে দু এক পিস্ করে দিয়ে সমতা আনতে আনতে এক সময় মাছ শেষ হয়ে।

খাওয়া শেষের পথে, কারও পাতে আর খিচুড়ি ও মাছ নেই। চেটেপুটে খেয়েছে সব। উঠি উঠি করছে সে সময় কালীপিসি বলে দাদা তোমার কথাই ঠিক হোল মাছ ও খিচুড়ি বাড়ন্ত।

রামচরণ খুড়ো — তাই নাকি? কতো বাজে বলতো।

বংশী ঘড়ি দেখে বলে — সাড়ে এগারোটা।

রামচরণ খুড়ো — দেড়ঘন্টা। বাড়ন্ত তো হবেই।

গোপাল — দাদু! তুমি তো তবু রেড্ সিগন্যাল দিয়েছিলে, তাতে তোমারটা কম, আর আমাদের মা কালী তো এবার আস্তই খেয়ে ফেলবে। এতগুলো মহিলা রাঁধলো আর বাড়লো আর খেতেই পেল না। এত পাপ রাখবো কোথায়? তোমরা হাসলে, মাকালী আরও রেগে যাবে। মেয়েদের উপবাসে রেখে আবার হাসি হচ্ছে।

হো হো করে হাসতে হাসতে সকলেই উল্টে পড়ে। প্রাঙ্গণ হাসিতে উপচে যাচ্ছে। রামচরণ ও নিতাই খুড়োরা দুঃখ প্রকাশ করায় বড়বৌ অর্থাৎ ভোলানাথের বৌ জানায় — তাদের বাড়ীতে অনেক ভোজ বা উৎসব হয়েছে, এদিনের উৎসবের তুলনা হয় না। এ উৎসব মহোৎসব। মহাভাগ্যি না হলে বাড়ীতে এ উৎসব হয় না। শ্বাশুড়ীর চোখে জল। ভোলানাথ নির্বাক।

নিতাই খুড়ো — যে বাড়ীর মেয়েরা না খেয়ে অতিথিদের খাওয়ায় তারা স্বয়ং অন্নপূর্ণা।

ভোলানাথের মা — ঠাকুরপো এরকম দিন এবাড়ীতে বার বার হয় সেই আশীর্বাদ করো।

"জয় রাধা মাধব।" এই প্রথম। এর জন্য এই কয় রাত্রি ঘুমছিল না। কি না বলবে . . . হরিবোল, জয়নিতাই, জয় রাধা . . . আরো কত কি . . .। কোন নাম পছন্দ হয় না। শেষে হঠাৎ করে তাদের কুলদেবতা রাধা মাধবের কথা মনে আসে বাড়ীর সামনেই। সেদিন থেকে সে বাড়ীর দরজা থেকে ঐ নামে নাম দেয় - গৃহস্থের বাড়ীতে। রাধামাধব

বলতেই, ঘরের ভিতর থেকে উকি দেয় একটি মেয়ে, কিছুক্ষণ পর বের হয়। ঘোমটার আড়ালে ভিক্ষার ঝুলিতে চাল ঢেলে দেয়। মুখের দিকে তাকাতেও পারে না লজ্জায়। কেমন যেন লাগে, তার মনে হয় মাটিতে মিশে গেল সে। অহমিকা অধিকার বোধ ব্রাহ্মণের ? অভিমান ব্যায়া আরও কত কি . . .। তাকে মনে মনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। মনের মধ্যে হাজির হয় - সেই নিজেই কতবার বলেছে বেলা কর্মোক্ষণ ভিখারীকে - হরি বল্লেই কাঁড়াচাল, চাষের কাজ পারে কিনা? গরু বাছুর দেখতে পারবে কিনা? ভাবে আজ যদি তাকে কেউ সেকথা বলে তাহলে কি করবে। সরমে মরে যায় কথাটা ভেবে। তাদের যন্ত্রনার কথা ভাবতে ভাবতে আর এক দরজায় হাজির হয়। আবার বলে - 'জয় রাধা মাধব।" সদর দরজা থেকে দেখা যায় এক মহিলা, মুড়ির চাল নাড়ছে একটা ছন্দে। মাত্র একঝলক দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেয় অশালীনতার কথা ভেবে ও লজ্জায়। ছন্দের তালে তালে চাল নাড়তে নাড়তে চাল নাড়ার এক বিকট শব্দের মাঝে সেই মহিলা — "এই কে আছিস চাল দে ভিখারীকে।' লজ্জায় মরে যায় ভিখারী কথাটা শুনে। একটা ছোট ছেলে, ঠাকুমা আমি দিচ্ছি।

— না তুই পারবি না। তোর পিসি না হয় তোর মাকে বল।

— না আমি পারবো।

— কাপ ভাঙ্গলে মার খাবি। ঘরে দেখ চালের ডালা আছে, চাল ছড়াবি না।

নাতি ততক্ষণে একটা ছোট কাপে কাপভর্ত্তি চাল এনে হাজির।

— এতো চুড়ে চুড়ে চাল, গোটা ঘর ময় করেছিস্?

নাতি নড়বড়ে হাতে ঝুলিতে ঢেলে দেয়। কাঁধটা নীচু করে। ঝুলিও নীচু হয়। ঝর ঝর ঝুলিতে যখন চাল পড়তে থাকে তখন সেই শব্দ, কানে বড্ড মধুর লাগে।

এক দরজা হতে আর এক দরজায়, ভয় পাচ্ছে কোন বাড়ীর এক পুরুষ মানুষ যদি বলে বাবাজী ভিক্ষে কেন খেটে খাওগে। তাহলে তো সে বাড়ীতে আর ভিক্ষে করা হোল না। ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা করে — এই বুঝি কেউ কথা বলে — 'বাবাজী খেটে খাওগে . . .।' আস্তে আস্তে ঝুলির ওজন বৃদ্ধি হয়। প্রায় সের খানেক হবে। চিন্তা করে এতে হয়ে যাবে, দুজনের দুবেলায় কালী পূজোর কিছু চাল আছে। সে ভাবে এতেই হয়ে যাবে, লজ্জাকি আর ভিক্ষায়। বোধ করি ঘর দশ পনেরো হবে। পাশের গ্রামটা বড়, সমস্ত গ্রামটা একা গিয়ে ভিক্ষে করলে কম করে কেজি সাত হবে। মনকে বোঝায় ভিখারীর লোভ ভাল নয়। গোটা গাঁটা দেখতে ইচ্ছে হয়। কিজানি সে ভিক্ষা না করেই পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। গোটা গ্রামটা ঘোরা হোল। গ্রামটাই কুম্ভকরা। চাষা, গোয়ালাই বেশী, নিচু, জাতও আছে। এক জায়গায় একজন হাঁড়ি ভিঙাচ্ছে চাকায়। দেখতে ইচ্ছে হয় একটু থেমেই যায়। চাকা ঘুরছে বন্ বন্ কর, লাঠি দিয়ে সেটা ঘোরানো হচ্ছে পরে জেনেছে - ওটাকে ওরা চাক্‌লীড় বলে। ভাল লাগছে দেখতে, চাকার কেন্দ্রে একতাল মাটি, সেই মাটিকে চাপে এবং হাতের যাদুতে হাঁড়ির মুখ অর্ধেকটা হাঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে ওরা পাগুই বলে। সারি সারি পাগুই সাজানোর হয়েছে। একটা লোক অবাক চোখে দেখছে দেখে, সেই লোকটাও আরও কসরৎ দেখায়। ভুবনে কোন দর্শকই পায়নি এমনি। একটা একসময় থামায় একটা মাটির তৈরী মেচেতে বসতে দেয়। বিড়ি খাবে কি না জানায়। ভিখারি বিড়ি খায় না। সে বিড়ি

ধরায়, গল্প করে অনেক। পরিচিত হয়। জানায় এখন আর কেউ হাঁড়ির ব্যবসায় আসতে চাইছে না, লাভ কম, টিনের জিনিষ পত্র, চাক্ টানা ভীষণ কষ্ট ইত্যাদি। সেখান থেকে অন্য জায়গায় যাবার জন্য পা বাড়ায়। লক্ষ্য করে ভিখ্ না নিয়েই চলে গেল। বাড়ীতে ভিখ্ নেবার জন্য অনুরোধ করে। সে জানায় সেদিনের মতো তাঁর ভিক্ষে হয়ে গেছে।

বাড়ী ফেরার সময় একটা সাঁওতাল পল্লীর মাঝ দিয়ে ফিরছে। সে সময় কয়েকটা সাঁওতাল রমণী ঘরের দাওয়ায় বসে বসে গল্প করছিল। ওদের পার হওয়ার সময়, একঝলক রমণীদের দেখে নেয়। একজনের চোখে চোখ পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। কয়েক পা এগিয়েও যায়। এমন সময় ডাক্ শোনা যায়, "তুই! আমাদের ঘরে ভিখ নিবি নাই।" দাঁড়িয়ে পড়ে ভিখারী, ভিখ নিতেই তো সে বেরিয়েছে। একটু পরে উত্তর দেয় আজকের মতো ভিক্ষা হয়ে গেল, তাই ফিরছি।" ততক্ষণে তিন চারটে মেয়ে এসে হাজির হয়েছে। তাদের দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে, যেন বন্য দেবীরা হাজির। একজন বলে - "কৈ ঝুলিতে বেশী চাল নাই।"

— এতেই হয়ে যাবে! মাত্র তো দুজন।

— এতেই হয়ে যাবেক। না আমরা সাঁওতাল বলে লিবি নাই।

— না তা নয়, বললাম তো এতেই হয়ে যাবেক।

— তোকে লিতে হবেক আমাদের ঘরেতে, এতে তোদের ইচ্ছে নাই। তুই কোথা থাকিস্?

— ঐ গ্রামের শ্মশানে?

এবার আর একজন মেয়ে বলে — শুনছিল বটে। কালী মন্দির হবে . . . ভোজ হবে?

— হ্যাঁ ওখানেই।

অপর একজন — তা ভাল, তুই আমাদের ঘরের ভিতরে চল তোকে আমাদের ঘরেও ভিখ লিতে হবেক।

ওরা গা ঢলাঢলি করে — বেশ মানাইছে তোকে। মনে হচ্ছে, তুই কিষ্ট ঠাকুর। চল ঘরে বসবি চল।

মানুষের সাদর আমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করা যায়। ওরা ওকে ঘরে নিয়ে যায়, উঠোনে বসায় একটা ছোট চৌকিতে। পাঁচটা মেয়ে ওকে প্রায় বাটি ভর্ত্তি করে চাল এনে দেয়, সাথে গোটা কয়েক বেগুন ও আলু! ভিখারী উঠতে চায়, ওরা চায় গল্প করতে। একজন বলে তোর কথায় বুঝায় তোর বাড়ী বর্ধমানের দিকে?

হাসি মুখে জানায় 'হ্যাঁ'।

— কুথায়?

— ঐ খণ্ডকোষের কাছাকাছি।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোনামুখী, কাঁকরডাঙ্গা দিয়ে যেতে হয়?

— হ্যাঁ।

অপর একজন বলে -- তুই, সাধু হলি কেনে এত কম বয়সে?

— হলুম, এমনি।

আর একজন — এমনি, এমনি।

হাসতে হাসতে একটি মেয়ে বলে — তোরা স্বামী স্ত্রীতে এসেছিস তো?

আর একজন — স্বামী স্ত্রীতে হলে বলতে চাইছে না কেন?

অন্য আর একজন — কৃষ্ঠ ঠাকুর তো - কত্ত মেয়ে চলে আসবে?

ওদের চাপে ও কথার সারল্যেও বলে যায় অতীত। আর ওরা দুজনও আর রবি খোঁড়া।

সকলেই দুঃখ পান স্ত্রী বিয়োগ ও সন্তান বিয়োগে। তাই তারা বলে না জেনে বলেছি কিছু মনে করিস না।

— না, না, কি আর মনে করবো। আমাদের এখানে আসব আবার। আজ চলি।

সকলেই বলে - আসব তো?

ওদের চোখের ভাষা আর মুখের ভাষা এক। চোখ দেখে মনে হয় ওরা খুব খুশী। আরও ওরা আলোচনা করে ঠিক কৃষ্ঠ ঠাকুর।

রংটা একেবারে চিকন কালো, মুখের আদলটাও ভালো, চুলও কোঁকড়ানো - চোখগুলো বড় মিঠে, শুধু মাত্র একটা বাঁশী থাকলেই হয়। বড় মনে ধরে তাদের। ফিরে আসে আশ্রমে, রবি কাঠ পত্র কাটাকুটি করে ঠিক করে রেখেছে। প্রায় সূর্য্য মাথার উপরে বারোটা বাজবে মনে হয়। রবি বলে গোপালদা মুড়ির টিন আর কিছু লংকা আর গুড় দিয়ে গেছে। বিকেলে আসবে আবার। রবিকে উনুন ধরাতেও বলে না। সতরঞ্চি বিছিয়ে বিশ্রাম করে। পরে জল আনে কুয়ো হতে, তারপর ওরা চারটি করে মুড়ি খেয়ে রান্না চাপায়। রবির মতে ডালটালের ঝামেলা ভাল নয়। ফেন ভাত, আলুভাতে আর একটা তরকারী কোন কিছুর। সাঁওতাল রমণীরা বেগুন দিয়েছিল, তা দিয়ে হবে আলু বেগুনের একটু ঝোল ঝোল তরকারী। কারণ ডাল নেই। রবির মতে মাছটা না ছাড়াই ভাত, নদী থেকে সে মাছ এনে জোগাড় করে নিতে পারবে। একটা জালও যোগাড় করে নেবে। মাছ আর ভাত আর কি চাই। আর হরি বললেই কাঁড়াচাল। তার উপর মা কালীতো আছেই। রান্না শেষ হয় গল্পে গল্পে। কিমনে করে তার আবার স্নান করতে ইচ্ছে করে। নদীর জলে স্নান সারে স্বচ্ছ স্ফটিক জল, একটু সাঁতরেও নেয়। এতে শরীরের পক্ষে ভাল, হাত পা ছাড়ে। ঘাটে লোক আসায় স্নান সারা হয় তাড়াতাড়ি। স্নানের পর খেতে বসে ওরা দুজনে। খাওয়া দাওয়া সারা হতে প্রায় আড়াইটা হোল। এবার একটু সে গড়াবে। রবি একটা চাটাই যোগাড় করেছে। দাওয়ায় শুয়ে পড়ে সে। চোখটা নদীর [illegible] থেকে ওপারে টিলা ও বনানী ও আকাশ চোখে পড়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুম আসে না। মনে হয়, তার এই তো বেশ। শুয়ে শুয়ে এমন প্রকৃতিকে দেখা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। আরকি চাই এ গ্রামের মানুষের ভালবাসার তুলনা নাই। সাঁওতাল রমণীদের কথা মনে আসে, ওদের ব্যবহারও যেন কত আপনার মনে হয়। মানুষের ভালবাসা ও প্রকৃতির সান্নিধ্যই তার কাম্য। কাম্য বস্তু যখন সে পেয়ে গেছে তখন নিজেকে আর অসুখী মনে হয় না। আকাশের নীল ও ওপারে নদীর ধারে টিলার নীল ও বনানীর সৌন্দর্য কংসাবতীর কুলকুল বয়ে চলা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙে, রবির ডাকে। ও জানায় ওরা এসে গেছে।

জিজ্ঞাসা করে ওরা কারা?

রবি — দাদাঠাকুরের কিছুই মনে থাকে না, দেখ কত সিমেন্ট রড্ এসেছে।

— তাইতো? চল ওরা জলটল খায় কিনা দেখ।

— বালতি আর গ্লাসটা নিয়ে চল।

এখন দুটো এসেছে এর পর নয় নয়টা গাড়ীর লাইন দেখা যায়। রবির উৎসাহও আরও বেড়ে যায়। দেখতে দেখতে মানুষেরও লাইন দেখা যাচ্ছে। আসছে ছেলে, বুড়ো, ছোকরারা, আসছে গাঁয়ের মাতব্বরেরা। রামচরণ খুড়ো, কিংকর খুড়ো, নিতাই খুড়ো, গোপালের বাবা, মেজ কাকরাও এসেছেন। আর গাড়ীর সাথে ভোলানাথ, গোপালের ছোটকাকা, বংশী, মুরালি আর অনেকে হাজির। স্থির হয় মোটা করে খড় পেতে সিমেন্ট রাখা হবে কালীর মায়ের পিঁড়েতে। তারপর ত্রিপল এনে ঢেকে দেওয়া হবে। রড্গুলো পাশেই থাকবে। ওদের আনন্দের সীমা নেই। বুড়োগুলোও যেন ছোট ছেলে হয়ে গেছে। ছেটোদের ইচ্ছে যায় যেমন বড়দের অনেক কাজ করতে তেমনি বুড়োরাও পারলে অনেক কিছু করে দেখায়। ছেলেদের মতো ওদেরও সেই আনন্দটুকুই সার। তবে নির্দেশ দেয় কোথায় কি থাকবে, কেমন করে সাজিয়ে রাখতে হবে। যুবকেরা যারা ধান নিয়ে যায়নি তারাই এখন সিমেন্ট ও রড্ নামাচ্ছে। এখনই যে হাফ নাজন। নামানো শেষ হলে, ত্রিপল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হোল। আগামী পরশু ভিত্তি প্রস্তর হবে। আগামী কাল পাথর ও বালি পড়বে। রাত নামতে যে যার বাড়ী ফেরে। ফেরে না শুধু যারা একাজে বেশী করে জড়িত। গাঁয়ের বাগ্দি পাড়া, বাউরি পাড়া, মুচি পাড়ার মাতব্বরেরাও আছে। কথা হয় কিভাবে পাথর আনা যাবে। খাদ্দান এখান যে কে কম করে - হাফ্ কিলোমিটার হবে। অনেকে বলে গাড়ী করেই আনতে হবে। অনেকের মত ভাল পাথর নিতে ওরা খাদ্দান থেকে একটু দূরে পাথর কেটেছে। গাড়ী সরাসরি ঢুকবে না, প্রথমে মাথাতেই বইতে হবে। একজন সর্দার অমল বলে — মাথায় করেই সরাসরি পৌছাতে হবে। ভোলানাথ হাফ্ কিলোমিটার পথ আনা কষ্ট হবে। মুচি পাড়ার সর্দার রতন বলে যাত বওয়া বওয়ি করলে বিশেষ কিছু কষ্ট হবে না। রামচরণ খুড়ো বলে কথাটা ঠিক। তবে বেশী কুলির প্রয়োজন। অত লোক পাওয়া যাবে কি? বাগ্দি পাড়ার সর্দার শশা বলে আমাদের পাড়াতে মেয়ে মরদে কম করে শতখানেক আর বাউরি পাড়ার আর মুচি পাড়া নিলে কম করে একশ হবে। বাউরি পাড়ার সর্দার মনা বাউরি জানায় একশ পেরিয়ে যাবে, দুশো মানুষ চারটে লাইনে যাত বওয়া বওয়ি করে তাহলে একশোতেই সব বওয়া হয়ে যাবে। মোটামুটি সাইজ করেই কাটা হয়েছে। শশা জানায় বড়গুলো ভেঙ্গে সাইজ করে নিতে হবে। ভোলানাথ, নিতাই, রামচরণ খুড়ো, বংশী, মুরালি মতে পলিসি ভালই। পরে স্নানের সময় বালি বয়ে নিলেই হবে, ঘন্টা খানেকও লাগবে না। আর একটা কথা ঠিক করে নিতে হবে। সকলেই জানতে চায় কি ঠিক করতে হবে? ভোলানাথ জানায় মিস্ত্রীর কাজে কুলির মোটামুটি প্রত্যেক দিন চারটে করে কুলি লাগবে। শশার মতে, ওটা আবার কথা হোল নাকি - তারা তিনটে পাড়া মিলে যত কুলি লাগবে

দিতে পারবে। সাথে মনা জানায় সর্দার ঠিকই বলেছে। রতন ও উৎসাহের সাথে সুরে সুর মেলায়। রাতের পরে উষার আগমন। ওরা ভোরের প্রতীক্ষায়। গোটা গ্রাম জাগার প্রতীক্ষায় . . .।

আজ কালুরা এখানেই থাকবে। আজই প্রথম শ্মশানে। অভিজ্ঞতা যে নাই তা নয় তবুও একেবারে শ্মশানে নয় শ্মশানের কাছাকাছি। একটু ভয় ভয় করলেও ভয় করছে না। সে ভাবে জগতে তো আর তার কোন বন্ধন নেই, নেই ভাল মন্দ, নেই কিছু চাওয়া পাওয়া অথবা ব্যথা বেদনা, অনুশোচনা . . .। বরং প্রকৃতি মায়ের নির্মল কোলে ঘুমুতে এতটুকুও কষ্ট হবে না বরং আরামেই থাকবে। আর একটা কথা ঝপ্ করে মনে আসে, তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম সন্তান ও সন্তানের মা এর কথা। বরং ওদের একটু সান্নিধ্য পাওয়া গেলে দোষ কি? সবাই বাড়ী ফিরে গেছে। এখন এখানটা নিঃঝুম। মাঝে শিয়ালের ডাক শোনায়। এক অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। কালু আর রবির উৎসাহের উত্তেজনার শেষ নেই। কালু প্রকাশ করছে না সবসময় আর রবি অনন্ত ফল্গু ধারায় বইয়ে চলেছে তার উত্তেজনা। রাত প্রায় আটটা বাজে, নিকষ কালো আঁধার কৃষ্ণ পক্ষ চলছে। সম্বল একটা লন্ঠন। লন্ঠন জ্বেলে রবি উনুন ধরায়। রবি একটা টর্চের প্রয়োজন অনুভব করে। কথাটা বলে, তাই সে যুক্তি দেয়, ভিক্ষায় পূজোর চারপয়সা থেকে কিছু জমিয়ে টর্চ আরও কিছু কিছু জিনিষ আনতে হবে। জিজ্ঞেস করে কি কি তরকারী হবে। কালু উত্তর দেয় - কি কি নয়, কি?

— কথাটা বুঝলুম।

— কি, মানে একটাই জুটছে না।

— কি, এর দরকার কি? ভাতে ভাতই ভাল, এত ঝামেলা ভাল লাগে না।

— দেখ দেখি রবিদা - কি আছে?

রবি আলো নিয়ে দেখতে থাকে, আলু বেগুন আছে, আর দেখতে হবে একটু আগে বড় থলিতে গোপাল দা যা কিছু রেখে গেছে তাও দেখে। ভীষণ আনন্দে জানায় একটা টর্চের উপস্থিতিতে আলোটা জ্বালায়।

— নতুন ব্যাটারী লাগিয়েছে মনে হচ্ছে।

— জান রবি দা, গোপালদারা কি ভাল . . .।

জগতে সকলে যদি সকলের জন্য এমনি করে ভাবতো।

— কালুদা আজকাল ভাবার লোকেরাই ভাবে না। এই যে তার দাদা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন রয়েছে তার জন্য ভাবে কিছু। মরলেই বাঁচে। বাবার দুবিঘে জমি আছে তারা সবটাই পাবে— আরে বাবু - আমিও তো দু বিঘের - দশ কাটার মালিক। তবুও মাঝে মধ্যে এক মুঠো ভাত দিতে নারাজ। অসুখে পড়লে, কেউ পর্য্যন্ত শুধোয় না। বড়দার বড় নাতনি জল-টল সরবত দিয়ে যায়। জান দাদাবাবু আমি একবার জ্বরে পড়ে আছি। খাওয়া দাওয়া হয় নি। কেই বা আর খবর নেবে। থাকতুম, আমাদের বড় ঘরটার পিছনের

থেকে হাত ছয় লম্বা, হাত তিনেক পড়চালীই আমার বাসগৃহ, লোক চক্ষুর আড়ালে। তা জান একদিন, নাতনিটা টিনের গ্লাসে এক গ্লাস সরবত করে নিয়ে আসে। খেয়ে যেন জীবনটা ফিরে পেয়েছিলুম। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। তারপর একটু বাদ শুনতে পাই চাঁপার বেদম কান্না। আমি আড়াল থেকেও শুনতে পাচ্ছি। পরে জেনেছিলুম। আমাকে সরবত করে. নিয়ে আসে। খেয়ে যেন জীবনটা ফিরে পেয়েছিলুম। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। তারপর একটুক্ষণ বাদ শুনতে পাই চাঁপার বেদম কান্না। আমি আড়াল থেকেও শুনতে পাচ্ছি। পরে জেনেছিলুম। আমাকে সরবত করে দেওয়ার জন্য বড়ভাইপো সন্ধ্যায় চা খেতে না পাওয়াতে চাঁপাকে পিটিয়েছে। এই তো আত্মীয়। ছোট আটদশ বছরের মেয়ে যেটা বোঝে, নিজের নিকট আত্মীয় যাদের দেহে এখন একই রক্ত বইছে, তারা সেটা বোঝে না। পরের দিন কাঁদতে কাঁদতে চাঁপা বলে সবকিছু। আরও জানিয়েছিল রাতে সে রাগেই ভাতই খায়নি। আমার চোখে সেদিন জল না এসে পারে নি। তাই তো সেদিন রাতে কেউ খবর নেয়নি যে আমি কেমন আছি, খাবার দেওয়া তো দূরের কথা . . .। অথচ ছোট্ট মেয়ে আমার জন্য মার খেল। সেদিন থেকে আর ওদের সাথে কোন আমার আত্মীয়তা ছিল না, যা ছিল শুধু চাঁপার সাথে। এই তো সেদিন, মাস খানেকের ঘটনা, জান কালুদা আমার গাঁয়েতে ভিখ করা হয় না, আর ভিখ করতে গেলে, ছেলেগুলো বড্ড জ্বালায়, এমনকি, কাছা খুলে দেয়, রাগায়। যদিও বা বাইরে ভিখ করতে যেতুম সেখানের ছেলেরাও জ্বালায়। রাগাবার, খেপাবার কথাগুলো কেমন করে গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে পৌঁছে যায় বুঝে উঠতে পারি না। তবে সাঁওতালদের গাঁয়ে এখনও ভিক্ মেল। ছেলেগুলোও রাগায় না, ঐ দু একটা গাঁই সম্বল। ওরাও রাগালে আমাকে না খেয়ে মরতে হোত।

কালু জিজ্ঞেস করে হাসতে হাসতে — তুমি কি আগে দাড়ী রাখতে।

— তুমি কি করে জানলে?

— তাহলে রাখতে। দাড়ীর সঙ্গে পাঁঠার সম্পর্ক আছে বলেই।

— কিন্তু দাদা দাড়ী গেছে, পাঁঠা কিন্তু পাঁঠাই আছে।

— পাঁঠার দাড়ী গেছে, পাঁঠা কি পাঁঠা থাকবে না?

— তাহলে তুমিও বলছো, ছেলেরা, দাড়ী কাটার পর ওরা আমাকে রত্নামুচির পাঁঠা বলবে?

কালুর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার উপক্রম।

কোন রকমে বলে — কালুদা আর তোমাকে রবে পাঁঠা বলবে না তার ব্যবস্থা করে দেব।

— বলছো, পারবে বলে মনে হয় না, এখানের ছেলেদের তো তুমি চেন না। আর যদি পার তাহলে আমিই ভিখ্ করবো, তুমি এখানে শুধু রান্না করো। আমার ভিক্ করতে ভীষণ ভাল লাগে।

— কেন ভাল লাগে?

— বলবো, বলছো, কথাটা একটু কেমন যেন বলতে লাগে।

— আরে বলই না।

— বলছি? শুনে যেন অন্য কিছু ভাববে না। জান কতলোকের কত মুখ দেখতে পাই, কত ঘটনা দেখি, কত কথা শুনি - ভাল মনে ভিক্ষা দিলে ভাল লাগে, আবার হাতজোড়া আছে বলে বিদায় দিলে খারাপ লাগে। পরে যখন তাদের ঘরে যাই তখন ভাবি "হাতজোড়া" এই বুঝি বলে। আবার যখন কেউ পূজা পার্বনে, কাজ ঘরে বলে আজ তুই খাবি, তখন কানে যেন মধু ঝরে। দেখদেখি বেশ গল্প করছি। রাত হয়ে যাবে অনেক। এইতো বেগুন আর আলুভাতে ভাত।

— ফেন ভাত বলবে না?

— নিশ্চয়ই। জান দাদা তোমরা শিক্ষিতেরা জানা না, ফেন ভাতে কি আছে। ওটাই তো আসল। গরম গরম নুন দিয়ে ফেন ভাত, ভাজা লংকা তেলে আর পিঁয়াজ আলু চটকানো আলুভাতে ভাত কি যে মিষ্টি, সাথে যদি একটু দুধ থাকে, আর একটা জিনিষ যদি দুধ কাঁড়াচাল হয়।

— আচ্ছা কালুদা - দুধকাঁড়া চাল এখানে পাওয়া যায়।

— দাদা, এসব ধান হারিয়ে গেছে, গরমেন্টের ধানেতে। এগুলো হাজামাঠে হোত। এখন আর হয় না।

— আমাদেরও হাজা মাঠে হোত। এখনও দু'একজন চাষী চাষ করে। ধানটা বান ঠেলে ভীষণ। কিন্তু চালটা লাল হওয়ায় . . .।

— বৌ, বিনরা, আমরা ফেন্সি হওয়ায় আর লাল চাল কেউ খেতে চায় না। কিন্তু আগের লোকেরা ঐ চাল পেলে আর অন্য চালের কথা ভাবতই না। আজকাল গুনের কদর আর কৈ? শুধু রূপের কদর। পারলে এখানে যদি পাই আনবো বদল করে।

— রবি আলো দেখায় ও জল আনে। গল্পে গল্পে ভাত রান্না হয়। কত কথা হয়। নদী কিনারের এই আলো যেন সমস্ত প্রান্তর একটা আলোক বর্ত্তিকা। সমস্ত শান্ত নির্জন অন্ধকারে একমাত্র দিশারী। ভাতে ভাতই যেন একমাত্র অমৃত। রান্না শেষে, আলুভাতে, বেগুন ভাতে তৈরী হয় খরানো লংকা সহযোগে,। খরানো লংকার সময়, রবি বাড়তি দুটো লংকা দিতে বলে। তার খরানো লংকা ভীষণ প্রিয়।

সেজানায় — এখনও কালুদা, আমি খরানো লংকায় একজামবাটি ভাত খেতে পারি।

— ভাই আমারো ভাল লাগে।

— তাহলেতো ভালই হোল, যেদিন তরকারীপত্র থাকবে না শুধু লংকা ভাত। সেই ভাল, অল্প যত মিষ্টি। খিদের আবার তরকারী।

— খুব ভাল কথা, অল্প যত মিষ্টি তত। খিদেতে শুধু ভাতই পরমান্ন।

— তুমি আগে বাড়ীতে রাঁধতে।

— না, তবে প্রথম রান্নার অভিজ্ঞতা শোনাতে পারি।

— বলই না খেতে খেতে শুনি। এরপর খেয়ে তো শুধু ঘুমুনো। নতুন জায়গা। একটু রাত করেই ঘুমুলেই ভাল।

— তোমার কি ভয় করছে।

— না, তবে নতুন জায়গা ঘুম একটু অল্প হবেই

— তার পরে শ্মশান।

— শ্মশান টশান কিছু নয়, তবে একটু গা ছম্‌ছম্‌ করে এই যা।

— সেটাই, বরং এখানের মতো নিরাপদ জায়গা আর কোথাও নাই।

— বল তোমার প্রথম রান্নার কথা।

— জান ঐ যে দুধ কাঁড়া ধানের কথা বলা হোল, সেটা আমাদের হাজামাঠে চাষ হোত। মাঠটা নদীর ধারে অন্য গাঁয়ের শ্মশানের একটু পাশেই। জমিটার নাম ঘোষ পুকুর। সেদিন দাদার সাথে কাজের ব্যাপারে মুনিষদের একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। সেদিনই সে বছরের প্রথম ধান রাখালি করতে হবে। কেউ যাবে না বলছে মুনিষরা। আর আমি সেদিন কলেজের হোস্টেল থেকে বড়দিনেতে বাড়ি ফিরেছি। বড়দা আর মেজদা কেউ যেতে চায় না। কলেজে পড়ি মনে ভর ডর নেই, ঠাকুর টুকুর যেমন আছে মানি না তেমনি ভূতও আছে সেটাও মানি না। কি মনে করি বলি আমিই যাব, তোমাদের ভাবতে হবে না। দাঁড়াও আমি কাউকে ধরে নিয়ে আসছি, এই বলে বেরিয়ে যাই, আমার সহপাঠী বন্ধু হলধরকে পথে পেয়ে যাই ও রাজী হয়। ওই জানায় দাঁড়া কানাইকে বলি, তিনজনে ভালই হবে। কানাইদের বাড়ীর কাছে যেতেই কানাই এর সাথে দেখা হয়। ও রাজী হয়ে যায়। - দুটো ডিম পাওয়া গেল, তখন গাঁয়ের দোকানে ডিম পাওয়া যেতো না। তিনজনে মিলে দুটো তাতেই রাজী। রান্না হবে, আলু বেগুনের তরকারী। তখন বেগুনের সিজন্‌। এখনকার মতো জলদি জাতের ফুলকপি ইত্যাদি পাওয়া যেত না। নেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম, লাঠি, আলো, টর্চ, মশলা বাঁটা, নুন তেল . . .। দেওয়া হয়েছে শালপাতা ধোওয়া ধুয়ির ঝামেলা এড়াতে। আর দেওয়া হয়েছে একটা মাটির হাঁড়ি ও খোলা। মাটির জিনিষ পত্রের দাও কম, পাশের গাঁয়ে কুমোর থাকাতে সবসময় মিলে যেত, আর অ্যালুমিনিয়ামের চলনও হয় নি। আর নেওয়া হয়েছে গোটা তিনেক শতরঞ্জি ও কম্বল। আমরা বাড়ীতে চা-মুড়ি খেয়ে নদীর ধার ধরে চলেছি। সাজ সরঞ্জাম মাথায় ও কাঁধে। চাঁদ উঠেছে, রাস্তা পরিষ্কার, গল্পে গল্পে হাজির হই মাঠে। অন্য মাঠে ধান নেই। ডাঙ্গামাঠ, ষোলজমি কাটা হলে শেষে হাজামাঠ। গাঁয়ের সকলের শেষে এখানের ধান উঠতো। আর এখানে চুরি হোত ধান। গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে একটা গাঁয়ের শ্মশানের ধারে পুকুরের নীচে, কাছেই নদীও আছে। পৌছে দেখি কুঁড়ে রেডি। কুঁড়ে বলতে তিনদিকে তিনটে ধানের জাঙ্গি। উপরটার বাতা দিয়ে ধানের আঁটি দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। ধানের কুঁড়ে এয়ার কন্ডিশন মনে হোত। ভিতরটা বেশ গরম থাকতো। দেখলুম, সকালেই কাঠ রেখে গেছে মুনিষরা। তিনটে বড় ঢেলা তুলে উনুন তৈরী করে দিয়ে গেছে। ভালই হোল। প্রথমে ভিতরটা টর্চের আলোয় দেখা হোল, যদি কোন লতাপাতা থাকে। অর্থাৎ সাপটাপ, মাঝে মধ্যে চন্দ্রবোড়া সাপের দেখা মেলে। বছর পাঁচের আগে পাত্রদের মাঠে, একটু দূরে ধানের আঁটির সাথে একটা চন্দ্রবোড়া লুকিয়েছিল। দামু বলে একটা মুনিষ ধান এটোতে গেলে আঁটি বাঁধতে গেলে, কামড়ে দেয়, দামু বাগ্দি মারা যায়। খড় পাতা হয়। একটা তালাই পাত হয়, পাতা হয় দুটো শতরঞ্চি। গায়ে দেওয়া হবে দুটো কম্বল। শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। পৌষ মাস, সোঁতাল জায়গা, নদীর ধার, শীতের এতটুকু ঘাটতি নেই। খাওয়া দাওয়ার পর বিছানা মিলতে কষ্ট হবে। তাই আগে ভাগে বিছানার কাজটা সেরে নেওয়া। পুকুর থেকে জল এনে রান্না চাপায়। ডিম ভাতে দেওয়া হয়েছে। রান্না হবে বেগুন আলু। আমি ব্রাহ্মণ আমাকেই রাঁধতে

হবে, তা নয়, বন্ধুদের আবার জাত। যেহেতু আমার কাজ আমিই রান্নার ব্যাপারে আগে ভাগে হাত লাগাই। রান্না হচ্ছে পুকুরের ফাঁকা পাড়ে, ঠিক কুঁড়ের সামনে, বসার জন্য খড়পাতা হয়েছে। ঘাসে শিশির জমেছে। পিটগুলো শীতে কাপিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা ফাঁকা। হাওয়াও আছে। তবে সুবিধে হচ্ছে চাঁদের আলোয়। যতরাত হচ্ছে তত ফাঁকা প্রান্তর মাঠ, পুকুর আরও পরিষ্কার হচ্ছে। গল্পের সাথে রান্না আগাচ্ছে। ভাত রান্না হয়। আলু বেগুন কাটা হয়েছে। ভাত রান্না শেষ হয়। ডিম নিয়ে সমস্যা, দুটো ডিম। ভাগে ঠিক হবে না। হলধরের মতে, ডিমদুটো বের করে ছাড়িয়ে নিয়ে পরে বেগুনের তরকারী কষার সময় প্রথমে তেল দিয়ে ডিম সেদ্ধগুলো চট্‌কে তেলে একটু ভেজে পরে আলুবেগুন কষে নিলেই হবে। একটু যেন ঝোল হয়। ভালই হোল ভাগে একেবারে সমান সমান। কানাই বন্ধু হলধর অর্থাৎ হলার তারিফ করে। হলধর ডিম বের করে চটকাতে থাকে ডিমের খোলা ছাড়িয়ে। আমি নতুন খোলায় তেল দিই সাথে লংকা। সময় হলে, চটকানো ডিম সেদ্ধ ছেড়ে দিই খোলায়, কিছুক্ষণ পর মসলা বেগুন আলু। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে জল দিই। ফাঁকানদী প্রান্তর আরও পরিষ্কার হয়েছে। হিম্ পড়েছে বেশ, শিশিরে ধানের আঁটিতে জবজব করছে। মাঝে মাঝে চোখ পড়ছে শ্মশানের স্মৃতি সৌধে এখানে মন্দির বলে। মন্দিরটা একটা উঁচু খেজুর গাছের নীচে পাশে একটা অশ্বথ গাছ। আর অশ্বথ গাছে নীচের শ্মশান। হালে বোধহয় মন্দিরটা হয়েছে। জ্যোৎস্না রাতে খেজুর গাছের নীচে মন্দিরটাতে বার বার চোখ চলে যাচ্ছে। আর গাটা একটু ছম্ ছম্ করছে। আমি লক্ষ্য করি সকলেই মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। কেউ কাউকে বলিনা মন্দিরের কথা। কারণ মন্দির থেকেই শ্মশান আর শ্মশান থেকেই ভুত পেত্নীর কথা আসে। মুখে যদিও বলি ভগবানও নেই ভুতও নেই, তবুও মনের মধ্যে ছ্যাক্ ছ্যাক করে। সকলকে দেখিয়ে নুন দিই। হলা বলে নুন একটু কম দিবি, পরে নুন চেকে নুন দিবি। রান্না শেষ হলে শালপাতার ঠোঙায় তরকারীর নুন দেখিয়ে নিই। ওরা প্রয়োজনীয় নুন দিয়ে দেয়। রান্না শেষ। উনুনের চারপাশে খেতে বসেছি, ডবল শালপাতাতে ভাত দিয়েছে কানাই, আর তিনটে বাটিতে আমি তরকারী দিই। বাকি তরকারী খোলাতেই থাকে ভাত আর তরকারী চাটু দিয়ে প্রয়োজনমত নিলেই হবে। খিদেটা ভালই পেয়েছে। মুখে তরকারী দিই। কি অপূর্ব স্বাদ। সমস্ত তরকারীটাই যেন ডিমের রান্না। কানাই ও হলধরও বলে — এ তরকারী তারা জীবনেই খায়নি। পরে আমি নিজেও চেষ্টা করেছি, ভাল হয় কিন্তু সেদিনের মতো অত ভাল হয় না। কারণ বুঝি না। রবি বলে তাহলে নতুন খোলার জন্যেই হয়তো হবে। একদিন টেস্ট করলেই হবে। কালই হবে, নূতন খোলাতে তো আজকে রান্না হোল না, আগামীকাল রাতে হবে, গোটা দুই ডিম আনবে আর বেগুন। হাতে পাঁজী মঙ্গলবার। পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমি জানাই — আমার ডিম খাওয়া ঠিক হবে।

রবি — তুমিতো মাছ খেলে গতকাল। সকলেই তো খেতে বললো। বরং একটা জাল দেখে শুনে জোগাড় করে দেবে আমি মাছটা দহটার থেকে সাপ্লাই করবো। ঘোড়াধরার গরুর হাটে নানা ধরনের জাল মেলে।

— সেই ভাল, মাছে ভাতে বাঙ্গালী। আমি আগে বাঙ্গালী পরে বৈরাগী।

— ঠিক কথা, আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

— ঠিক বলেছিস। সেদিন থেকেই আমি রাঁধতে শিখেছি একটু আধটু। বাড়ীতেই বলেছি কিন্তু সেভাবে হয় না। বৌদিরা রাজী হয় না। বলতো - কি বিচ্ছিরি রান্না হবে, যেখানে সেখানে ডিম দিলেই হলো।

— সেদিন ঐ কথায় খুব হেঁসেছিলুম। পরে বৌদিরা কথাটার মারপ্যাঁচ বুঝে রেগে গিয়ে বলেছিল — ভাতেরই ঠিক নেই, তার পর তরকারীতে ডিম। আর বলা হয় না কারণ আমার পড়ার জন্য তখন বেশকিছু টাকা মাসে গুনতে হোত। সংসারটা টানে চলতো।

— আমারও হাসি পাচ্ছে কথা শুনে। বৌদিরা না হেসে রাগ দেখায়, এটা অন্যায়, হাঁসি ঠাট্টার সম্পর্ক হলে হাঁসতে দোষ কি?

— তুই বুঝলি, তারা বুঝবে কেন? তারা বুঝেছে তাদের স্বার্থ, দেওরের জন্য টাকা খরচ হচ্ছে, আর দেওর কি পাশ করে চাকুরী করে দাদাদের দেবে?

— ওখানেই তো বৌগুলো সংসারগুলোকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

— তারপর আর কোনদিন বলেনি। বিয়ের পর জবাকে বলেছিলুম কথাটা - জবা আমার ডিরেকসন মেনে রেঁধে ছিল। অপূর্ব হয়েছিল কিন্তু অপূর্বের পরেও যদি কিছু থাকে সেটা হয়নি, কিন্তু যেটা হয়েছিল সেদিন রাতে। তারপর জানিস অপূর্বর, পরের পর যদি কিছু থাকে সেটা পরেরদিন অনুভব করেছিলুম। জানিস্ রবীন্দ্রনাথের কথা শুনেছিস।

— হ্যাঁ, ঐতো পাঁচিশে বৈশাখ, ঠাকুরের জন্মদিন, আর রবীন্দ্র সংগীত তো রেডিও খুললেই হোল, তা রবীন্দ্রনাথের আবার কি হোল।

— শোন রবীন্দ্রনাথের একবিদ্বান ছাত্র ছিল, নামটা কি জানিস্ বল?

— নামটা হোল, প্রমথ নাথ বিশী। আজ থেকে বেশ কিছু দিন আগে তখন দেশে ফ্রীজের চলন হচ্ছে, তাই দেখে ফ্রীজের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন।

— ফ্রীজ তো জিনিষ পত্র ঠাণ্ডা ও ভাল রাখবার সেই বড় বাক্সটার মতো জিনিষটা।

— হ্যাঁ ঠিক ধরেছিস। তা প্রমথ নাথ বিশী বলেছিলেন — "ফ্রীজ মানে - টাটকা জিনিষকে বাসি না, পচিয়ে খাবার যন্ত্র।" ঠিক মনে পড়ছে না, বাসি না পচা, কথাটা অবশ্য আমাদের প্রফেসর বলেছিলেন।

— ঠিকই বলেছেন তো - টাটকা ফল, মূল, মিষ্টি, মাছ, মাংস তরকারী বাসি বা পচিয়ে খাবার যন্ত্র।

— কিন্তু সেদিন বিপরীত মনে হয়েছিল। কথাটা কলেজে হালেই শুনেছিলুম, কথাটা হালাহালিই পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

— কি করে।

— আগে শোনই না। তারপর প্রশ্ন করবে। সেদিনতো খাওয়া দাওয়া হোল ভাত ও তরিকারী অনেক বেড়েছিল। কানাই ও হলার কথা মতো ভাতে জল দিলুম, আর বাটিগুলো ধুয়ে দুবাটি তরকারি হাঁড়ির ভিতরে বসিয়ে তরকারীর খোলাটা ঢাকা দিয়ে একেবারে কুঁড়ের উপরে আগুনে হাত পা সেঁকে একবার মাঠের চারদিক তাকিয়ে শুয়ে পড়লুম। দরজার মুখের খড়ের বোঝাটা ঢাকা দিয়ে, লণ্ঠনটা একটা লাঠি বেঁধে শুয়ে পড়লুম।

— কালুদা - তুমিতো ফ্রীজের কথা বলছিলে সেটার কিহোল?

— বলছি, বলছি, শোনই না রবিদা। ভিতরটা বেশ গরম। ধানের গরম। তবে খড়ের একটা গন্ধ ছিল। কিছুক্ষণ থাকার পর আর গন্ধটার খুব একটা টের পাচ্ছিলুম না। কথা ছিল মাঝরাতে বার দুই উঠবো। কিন্তু একেবারের বেশী ওঠা হয় না। মাঝ রাতে যখন উঠলুম, তখন মনে হয় হিমালয়ে আছি আমরা। জ্যোৎস্নার মাঠ, প্রান্তর, আরও ধপধপে। পুকুরের জলের সাপলা ও শালুক ফুলগুলো যেন পূর্নশারদ কালী। দেখতে ইচ্ছে হলেও শীতে কুঁড়েতে ঢুকে পড়লুম। হাওয়া দিচ্ছিল। ছুঁচের মতো বিঁধছিল উত্তরের হাওয়া, মৃদু মন্দ হাওয়ায় দূর থেকে স্পষ্ট দেখছিলুম ঘোষ পুকুরের কালোজলে আপছা অল্প ঢেউ উঠছিল। সেই শীতে মনে হয় আকাশের শশী আর ঐ জলের শারদ শশীতে ঢেউয়ের সাথে কোলাকুলি করছে।

— শশী শশী কি করছো?

— জান রবি না, শশী মানে চাঁদ আর জলের শালুক ও সাপলাদেরও মনে হচ্ছে চাঁদ।

— দারুন তো! সত্যি রাতের এই দৃশ্য সুন্দর হবে।

— তারপর তাকাব না তাকাব না করেই একবার তাকালুম সেই মন্দিরটার দিকে। মন্দিরটা আরও উজ্জ্বল আর ধপধবে সাদা মনে হল কি জানিস্, শ্মশানে মন্দিরটা বড়ই নিঃসঙ্গ। একাকী। বেশীক্ষণ তাকাই নি। তাকাতামও না, কারণ ওদিকটায় আমাদের একটা বড় জমিতে ধান ছিল। একটু হাঁটতেই পাগুলো বরফ জলে ধোয়া গেল। কেউ কোথাও নেই। আবার শুয়ে পড়লুম। এরপর একেবারে সকালে। সকালে উঠলুম। প্রাতঃকৃত সেরে, হাত মুখ ধুলুম। সূর্য্য উঠেছে। গাঁয়ের ছেলেদের সকালে মুড়ি খাওয়া অভ্যেস। হলা বললো নে মুড়িবার কর দেখি, তরকারীটা কেমন আছে। হাঁড়ি নামায়। হাঁড়ি আর খোলায় ফ্রিজের মতোই শিশির জমেছে। ইতিমধ্যে হাঁড়িখুলে তরকারী নিয়ে মুখে দেয়। মুখে দিয়ে দারুণ দারুণ আছে। হাঁড়ি খোলার সাথে সাথেই ডিমের কুসুমের সুগন্ধ ভেসে এলো। হলা জানায় কাল কে কি খেয়েছিল, আজকে দেখ কেমন হয়েছে। একে বারে মেতে গেছে। আমরা মুড়ি নিই, চারটি ভাত নিই আর তেল, সাথে কাঁচা পিঁয়াজ ও মূলো। মুখ হাত ধুয়ে আমরা একটা মাঠে তাজা পিঁয়াজ, মূলো নিই সেটাও হলার আবিষ্কার। বাসী তরকারীটা মুখে দিই সত্যিই আমাদের জিভেকে মাতিয়ে দিয়ে গেল। আজও আমি ভুলিনি, বন্ধুরাও নয়। সত্যিই ফ্রিজের মহিমা সেদিন বুঝলুম। প্রমথ নাথ বিশীর উক্তিটি এক্ষেত্রে ভ্রান্ত বলে মনে হয়।

-- অঃ এবার বুঝলুম, ফ্রিজের ব্যাপার।

— আমি হাসলুম।

— আগামীকাল আমরাও এক্স্পেরিমেন্ট করবো।

— তুমিতো, বেশ ইংরেজীও জান রবিদা।

— নাগো - আজ অনেকেই আমরা মুর্খরা বেশ মানে বুঝি।

— যেমন একটা বল দেখি।

— শুনবে, যেমন দেখবে, মুনিষ বাগালেরা, খুব বেশী হলে হিউজ্ কথাটা প্রায়ই বলে।

— আর হেঁসে থাকতে পারি না। আমিও প্রথমে একজন মুনিষের মুখে শুনে অবাক

হয়েছিলুম। সত্যিই ইংরেজী সর্বত্রই ঢুকে পড়েছে। তবে ফ্রীজের ব্যাপারটা বুঝলে তো। সেই দিনের ফ্রিজের তরকারীর স্বাদ জীবনেও ভুলতে পারবো না।

— কালুদাও আমরাও কাল ফ্রীজও তরকারীর টেস্ট করবো।

— কই পরীক্ষার কথা না বলে টেস্ট বললে।

— তাবেই দেখ, কথায় কথায় কত ইংরেজী বলি।

— তোমার কথাটাই ঠিক, কত ইংরেজী অজান্তে ঢুকে পড়েছে আর আমরাও কথাই শিখে ফেলেছি।

কথায় কথায় খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হোল। ওরা ভিতরে না থেকে দাওয়াতেই রাতের বিছানা পাতে। ঘুম আসে না কালুর চোখে। রবিরও না। একসময় রবি ঘুমোয়। নদীর গর্ভে, তীরে, আঁধারে আঁধারে টিলা ও বনানী ও তারাভরা রাতের আকাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কত কথাই মনে আসে। বেশী করে আত্মীয় স্বজনের কথা মনে আসে। তার মধ্যে আবার মনে পড়ে ছেলেটা থাকলে বোধ করি এক বছরের মতো হোত। ছেলেদের এই সময়টাতে ছেলেদের সবচেয়ে মিষ্টি মনে হয়, আধো আধো দু'একটা কথা, নড়বড়ে পায়ে চলতে শেখা, হরেক রকমের কাজকর্ম, দুষ্টামি, সর্বোপরি মন ভোলানো হাসিটি। আর একটা ব্যাপার মনে পড়ে, মায়েরাও এত দুষ্টুকে কোলে নিয়ে জানায় তার গরবের কথা। সত্যিই সন্তান কোলে গরবিনী মায়ের রূপই আলাদা। জবাকে কেমন লাগতো কে জানে। ছেলেটা তার মতো কালই হয়েছিল। তাকে মনে হয় ঠিক দেখতে মা দুর্গার কোলে কৃষ্ণরূপী কালো কার্ত্তিক। দুচোখ ভোরে দেখতে ইচ্ছে যায়। বছর খানেকের ছেলে দেখলেই, ছোট্ট কৃষ্ণরূপী কালো কার্ত্তিক কোলে গরবিনী জবার মধুর হাসিটি বারবার কল্পনায় ভেসে যায়। সেভাবে আধুনিকারা কেন ঐ কাত্তিককেও স্তন্য পানে বিরত রাখে। এরূপ স্তন্য পানেই তো আসল সুখ মহিলাদের, এটাই তাদের নারীত্বের মহিমার সেরা প্রকাশ। নারীবাদীরা হয়তো এতে অনেক কিছু ভাবতে পারেন ক্ষতি নেই, প্রকৃতি তাদের এভাবেই তৈরী করেছে। সন্তান পালন তাদের সর্বকর্মের সেরা কর্ম। মা তার সন্তানকে যেভাবে পালন করতে পারে, তা আর কেউ নয়। সন্তান জন্মের সাথে সাথে স্তন্য পানে প্রথম কাঁদে কেন? আর সন্তান জন্ম দেওয়ার পর সদ্য মায়ের যে গরবিনী মুখের গৌরব কাকে না আনন্দ দেয়। মহাশ্মশানে শুয়ে শুয়ে তারা ভরা আকাশের নীচে, নদীর কিনারে এক অপূর্ব শিহরণ জাগে। এইরকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে কতক্ষণ পরে ঠিক বলা মুস্কিল। চোখ পুবের আকাশে, নদীতীরে অদূরে টিলার উপরে আঁধারে আধখানা চাঁদ উঠেছে, সোনালী আভায়, রুপালী আভায় নয়। কৃষ্ণপক্ষের নবমী দশমী হবে। দেখতে ভালো লাগে নিঝুম, নীরব রাতের আকাশে বনানী বেষ্টিত টিলার উপরে। নদী, বনানী টিলা, শ্মশান, রাতের আকাশ রূপময় মনে হয়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অপার বিস্ময়ে। ভাবে এ পৃথিবী কত সুন্দর, কথায় প্রকাশ করা কত কঠিন। শুধু অবাক হয়ে দেখে রূপ, শোনে মনের মাঝে মায়াবী রূপবতীর রাতের নির্বাক কথা। যারা মায়াবী নির্বাক রাতের কথা শোনে তারাই তার কথা শোনার জন্য পাগল না হয়ে পারে না। তাই সে ভাবে, কবিরা পাগল কেন? কানের মাঝে শব্দের ঝঙ্কার শোনা যায় - কেমন করে গান করো হে গুনী, আমি অবাক

হয়ে শুনি।' গুনী নয় - মায়াবিনী রাত তার নির্বাক গানে গানে পৃথিবীর সমস্ত সন্তানদের তার হাতের পরশে, না গাওয়া গানে ঐ রকম নির্বাক গানের ছন্দে ঘুম পাড়ায়। উঃ তাইতো ঘুমের মাঝে এতো শান্তি। মায়ের কোলের মতো শান্তির স্থান এমন কোথায় আছে? পরম শান্তিতে যখন শিশুরা ঘুমোয় তখন অপরূপ লাগে। কবি বা লেখকের কথাই সত্য — "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃকোড়ে।" আজই কথাটা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে রাতের আঁধারের নির্জন শান্ত সমাহিত তপোবনে।

ভোর হয়। রাতের মনোরম পরিবেশের কথা মনে আনন্দ হয়। এমন একটা জায়গায় সে এসেছে, সে এখানে সব কিছু পেয়ে যাবে। আজবোধ হয়, ভিক্ষায় বের হওয়া যাবে না। পূজোর চাল আলু আছে। রবি জানিয়েছে, সকালে বিকেলে একটু চা হলে ভাল হয়। কালুরও চায়ের অভ্যাস আছে। এতে ঝামেলা কে আর পোয়ায়, কোথায় চা, চিনি, দুধ। রবির মতে ওটা সমস্যাই নয়, একটু চা চিনি। দুধের প্রয়োজন নেই, লিকার চাই শরীরের পক্ষে ভাল, দুধে গ্যাস হয়। রং চাই তো ডাক্তার বাবুরা খেতে বলছে। সাথে লেবু দিলে ভাল হয়। আর লেবুটা আবার সমস্যা হোল। একটা লেবুতে কম করে দুদিন হবে। একটু সেন্ট হলেই হবে ইত্যাদি। শুধু রবির নয়, কালুরও সকালে বিকেলে চা না খেয়ে ভীষণ ফাঁকা লাগে। সিদ্ধান্ত নেয় তবে যা, দোকান থেকে চা, চিনি নিয়ে আয়। পয়সা বের করে দেয়, এইপ্রথম পয়সা খরচ শুরু হয়। একয়দিন চলছে, গোপালও এর তার বাড়ীতে। তাও এখনও পথে বের হওয়ার জন্য যে টাকা তার আছে তাতে হাত পড়েনি। এটাকা কয়দিনে পূজোতে যা পড়েছে। রবিকে আনতে বলায় রবির মুখটা একটু করুণ দেখায়। কারণটা ধরতে পারে না কালু। পরে রবি পয়সা নিয়ে বের হয়ে যায়। আধ ঘন্টা পরে ফিরে আসে চা চিনি নিয়ে। চাপর্ব শুরু হয়। লাল চা পরিবেশিত হওয়ার আগে কাপের খোঁজ হয়। গোপালদের দেওয়া বাটি গ্রেসায়েই চা পর্ব শেষ হয়। একজন মহিলাকে প্রথম একটা কালো পাথর করে আনতে দেখা গেল। ভিতের পাশেই ফেলে রাখলো, আবার ফিরে গেল। আবার সে এলো সাথে আর এক মহিলা, মাথায় পাথর। পরে আবার তারা পাথর ফেলে, আবার ফিরে গেলো, আবার একটু পর এরপর একজন পুরুষ, তার মাথাতেও পাথর। কিছুক্ষণ পর তারা তিনজন আসছে আর পাথর ফেলে ফিরে যাচ্ছে। কালু ও রবি তাড়াতাড়ি সেখানে যায়। ব্যাপার বুঝতে পারে তিন লাইনে পাথর রোওয়া হচ্ছে যাত বোওয়া বওয়ি করে। অর্থাৎ একজন লোক কিছুটা পাথর বইয়ে অপর একজনকে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার পাথর আনার জন্য, এইভাবে প্রতিটি লোক লাইনে থেকে একে অপরের পাথর বয়ে চলেছে। সেইজন্য অবিশ্রান্ত ধারায় তিনজন পাথর ফেলে আবার ফিরে যাচ্ছে। দেখতে বেশ লাগছে। রবিদার ভাষায় হনুমানের সাগর বন্ধন হচ্ছে। কালুর মাথায় ব্যাপারটা এসেছে। ভীষণ মজা লাগছে। একে একে পাথরের মতো গাঁয়ের ছোট ছেলেরাও আসছে, সাথে মাতবরেরাও একে একে, রামচরণ খুড়ো, কিংকর, নিতাই খুড়োরা, ভোলানাথ, গোপালের কাকা, বাবারা, বংশী . . .। ওদের চোখে মুখে আনন্দ উপরে পড়ছে। ওরা পাথরগুলো আস্তে আস্তে রাখতে বলে, সাইজকরা কোনাগুলো যাতে নষ্ট না হয়। গোপাল এসেছিল অনেক পরে। অনেক ক্ষণ ধরে কালুর দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল শুরু থেকে শেষ

ও পাথর খাদান। প্রথমে রবিকে বলেছিল ও রাজী হয়নি, রাগাবার ভয়ে। কালু ও গোপালের সাথে রবিও পিছু ধরে। তিনটে লাইন, অজস্র মেয়ে মরদ কথাও হাঁসির বন্যা বইয়ে। বন্যায় বয়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে পাথরের পর পাথর। কালুকে ও রবিকে দেখে ওদের হাসি উপচে যেতে চাইছে। মহিলারা আড়চোখে দেখছে, মুখে মুচকি হাসি। সবাই বলে, এইবুঝি আমাদের বাবাজী, গোপাল জানায় - 'হ্যাঁ'। একটা পঞ্চাশ উর্দ্ধ পুরুষ বলে বাবাজী না বলে, দাদাজীই ভাল। বয়সতো ভীষণ কম। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে - বলে — 'থাকবে তো'। একটি মহিলা বলে - থাকবে নাই মানে, আমরা ছাড়লে তো যাবে। হাঁসির ঝলক্ বনানী মুখরিত হয়। অন্য মহিলারা বলে - তুমি ঠিক কথা বলেছো। আমরা ছাড়লে তো। ও এসেছে বলেই তো মন্দির হচ্ছে, পরব হবে, ভোজ হবে, লুচি হবে, বন্দে হবে, খেলা বসবে। আমরা ওকে ছাড়ছি না। ওদের আন্তরিকতায় মনটা যেমন করে ওঠে। ঠিক পরিচয় নেই এমনকি এই প্রথম দেখা ওদের। কালু জানায়, কোথাও যাবে না সে। যাবার জন্য সে আসেনি। বিশেষ করে মহিলারা জানায় - "তুমি থাক্, তুমি খুব ভাল মানুষ।" গোপাল বলে, "দেখ কিরকম বাবাজী জুটিয়েছি।।"

মেয়েরা বলে — দেখতে শুনতে তো ভালই, টিকবেতো?

গোপাল — টিকবে, ভাই খুব ভাল লোক। অনেক লেখাপড়া জানে।

মেয়েরা — আমরা দেখেই বুঝেছি। না হলে অমন কথা কেউ বলে, গোটা গ্রাম একটা দিন এক সাথে খাবে, আনন্দ করবে। একথা কে ভেবেছে বল। এক সাথে খেলে কত আনন্দ হয়।

গোপাল — খাবার মেনুটা শুনেছো?

মেয়েরা — হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি, দিনে খিচুড়ি, রাতে বন্দে আর লুচি।

রবি থাকতে না পেরে — "তবে বন্দে যাচাই লয়, তোদিকে যাচাই খাওয়াতে হলে, মন্দির বেচতে হবে!

মেয়েরা — রবে খোঁড়া, তুই চুপ কর? তুইও মোড়ল হয়েছিস্।

একটা মেয়ে হাসতে হাসতে — বেশ বোল ফুটেছে, দেখছি রত্না মুচির . . .।

পাঁঠাটা চলার আগেই, কালু তাকে থামিয়ে দেয় — দিদি ওকে এভাবে বোল না, ওতো তোমার চেয়ে বড়, একই গাঁয়ের লোক, দাদা বললে কি ক্ষতি হবে। তোমরা না বললে, ছেলেরাও বলবে না।

মহিলাটি চুপ করে যায়, রবি খুঁড়ো - তোমরা রয়েছে তাই পাঁঠা শুধু নয়, কাছাও খুলে দিত। বিশেষ করে ঐ মেয়েটাকে তুমি চেন না। মেয়েরা বনে গেলে কি সাংঘাতিক জান না।

মহিলারা রবির কথায় জোরে হেঁসে ওঠে। রবিও মাটিতে মিশে যায়। ঠিক সেই সময়েই সেই মহিলাটি — ভাই তোমাকে কথা দিচ্ছি আমরা আজ থেকে ওর পিছনে লাগবো নাই, বরং রবিদা বলেই ডাকবো।

মুহুর্তে পরিবেশটা শান্ত হয়।

কালু — একটা কথা বলি - দিদি! তোমার মুখে ওকথা শুনে কিযে ভাল লাগছে,

আর দিদিরও কি কম্ ভাল লাগছে দাদা বলে। ভাই বোনের সম্পর্ক কত সুন্দর - কত মধুর।

গোপাল — আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, তোমাদের এই সুন্দর ব্যবহারে। আজ থেকে রবি তোমাদের সকলের রবিদা, দেখবে তোমরা রবিদা বললে সবাই রবিদা বলবে। আর রবিদা না বললেও অন্তত খারাপ কথা বলবে না।

সেই মহিলা আবার হেঁসে ওঠে।

সকলেই অবাক হয় তাই সে আবার বলে — অনেক দিনের অভ্যাস, অনেক দিনের হাসি ঠাট্টা জড়িয়ে আছে রবিদাকে নিয়ে। তাই হাসি আসছে। দেখো কালু ভাই! আজ থেকে সত্যি করে খারাপ নামে ডাকবো না। এ তোরা যেন কোনদিন কেউ খারাপ বলে ডাকবি না, রবিদা বলে ভালই লাগছে। সত্যিই ঐ বেচারা, গাঁয়ে বেরুতেই পারে না। ভিখ্ করতে ও পারে না, খুব কষ্ট হয়। কালুভাই! রবিদাকে হেল্পার করে নিয়েছো জেনে ভালই লাগছে।

কালু — দেখি, দিদিরা, বোনেরা বলতো - রবিকে আর একবার "রবিদা" বলে ডাক্।

এবার সকলে "রবিদা" নয়। 'রবিদা জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলে। বেশ কয়েকবার।

কালু — রবিদা, এদের উপর রাগ কমেছে তো তোমার। আর এদিকে ভয় করার দরকার নেই। তুমি সকলের রবিদা। তোমার মতো এতো বোনের দাদা আর কে আছে?

রবি এবার হাউমাও করে কেঁদে বলে, কালু দা তুমি দেবতা, দেবতা না হলে ওরা আমাকে, রবিদা বলে। মা কালী! তুমি এদের সুমতি দাও।

রবিদার কথা শুনে দিদি বোনেরা তো অবাক।

গোপালদা কালুকে কি বলে - কালুরা ফিরে যেতে চায় - আস্তানায়, কারণ কালুরা থাকলে, কাজের ব্যাঘাত হবে। কাজ হবে না। ফেরার সময় জমা দিয়ে দেয়, মন্দির বানিয়ে কি হবে তার চেয়ে . . .।

মহিলারা অবাক হয়ে — কি বলছেন বৈরাগী ভাই?

ঠিকই বলছি - মানুষের অন্তরের মতো মন্দির কোথাও নেই, সেই মন্দিরেই আসল দেবতা থাকো। আর তোমরা সেই মন্দিরেই, রবি খোঁড়াকে রবে পাঁঠা থেকে রবিদা বানিয়েছো। মানুষকে ভালবাসাই হোল শ্রেষ্ঠ পূজো। তাই মন্দির তো দেবতাকে পূজো করার জন্য। ভালবাসা হোল অন্তর মন্দিরের দেবতাকে পূজার সবথেকে ভাল নৈবেদ্য।

— খাদানে যাবে না, ঐ তো এসে গেছি, কালুদা।

— না, রবি বেশী দেরী করা চলবে না, কালু ভাই গেলে ওখানে এদের কাজের দেরী হবে।

— গোপাল দা এসেছি যখন দেখেই যাই। তিনটে সারে পাথর নেওয়া হচ্ছে, দেখতে কেমন লাগছে। এদৃশ্য দেখা যায় না। ঠিক লংকায় যাবার সেতু বন্ধ হচ্ছে।

— কালু ভাই ঠিক কাঠবিড়ালীর আর বানরের সাগর বাঁধাই মনে হয়।

— এই তো এসে গেছি গোপাল দা, জন কুড়ি লোক সাইজ করছে, আর তুলে দিচ্ছে। আগেই খাদান থেকে প্রচুর পাথর কাটানো হয়েছে দেখছি।

— এরা পাথর কাটায় ওস্তাদ। কিগো রতনদা!

— গোপাল ভাই - এই তো আমাদের কাজ ছিল একসময়। এখান থেকে পাতর ক্রেসার মেশিনে চালান হোত। এখন ঠিকাদাররা অন্য নিকট জায়গা থেকে নিচ্ছে।

— সুন্দর করে সাইজ এত সহজে করছে, দেখতে ভাল লাগছে প্রায় বড় বড় ইঁটের মতো। সহজ হবে মিস্ত্রীর গাঁথকে। আমরা যাচ্ছি, তোমাদের কখন শেষ হবে।

শশা জানায় — বোধ হয় ১২টার ইধারে হবে না। বেশী বোওয়া ভাল, কম পড়লে, আবার তোড়জোড় নতুন করে করতে ঝামেলা হবে।

কালু — জানো গোপালদা সমস্ত মন্দির ও আটচালার যদি চারপাশে দুটো সিঁড়ি মতো ধাপ করা যায়। তাহলে খুব সুন্দর হবে মন্দিরটা। কিছু বেশী পাথর লাগবে।

গোপাল — ভালই হবে মনে হচ্ছে, দু'তিনটে ধাপ হলে সুন্দর হবে।

রতন — কিছু বেশী পাথর লাগবে তো, আমরা না হয় ১২টা নয় ১টা পর্য্যন্ত বয়ে দেব তাহলেই হবে, যদি কিছু লাগে পরে দিলেই হবে।

শশা — জিনিষটা মন্দ বলেনি, হচ্ছে ভাল করেই হোক।

মনা — হবে তো একবার, আমরা বেশী বয়ে দিই, তারপর মাতবরটা যা ভালো বুঝে তাই করবে। তবে বেশী বোওয়া থাকেল কাজটা সহজ হয়ে যাবে, লাগে আরও ঘন্টা খানেক লাগবে।

শশা — সেটাই ভালো।

গোপাল — তোমরা পাথর বেশী করে বয়ে দাও। দেরী হলেও চলবে। গাঁয়ে মুড়ি আদায় হচ্ছে। ভোলানাথ খুড়ো তেলে ভাজা দিচ্ছে। কড়াই চেপেছে আমি দেখে এসেছি।

রতন — মুড়ি খাওয়াবার কথা ছিল না।

কালু — ছিঃ! তোমরা এত পরিশ্রম করছ, চারটি সামান্য মুড়িও যদি খাওয়াতে না পারে, তা হলে ভাল দেখায়। দেখছো তো তোমরা সকলেই কত ভাল। তোমরা মুড়িও খেতে চাও না আর ওরাও তোমাদের খালি পেটে কাজ করাতে চায় না। হোক না গ্রামের কাজ। এই দেওয়া নেওয়ার মাঝেই তো মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সম্পর্কটা মধুর হলে গ্রামটাও ভাল চলবে - মানুষ সুখে শান্তিতে থাকবে।

শশা — দারুণ দারুণ।

মনা — সাংঘাতিক কথা বলেছে। কেউ একথা কোনদিন বলেনি ভাবেনি - গ্রামের মানুষের সুখের শান্তির কথা।

রতন — সত্যি কথা বলতে কি, মন্দিরটা আমাদের সব এক করে দিচ্ছে। এই দেবু আমাদের পাড়ায় অন্য দল করেছিল, আমার সাথে বা কাটাকাটি বন্ধ। ওকে আমাদের তে মাথায় ডাকা করাতেই এলো, এবং এসে নিজেই বলে, রতন খুড়ো তুমি যা বলবে তাই হবে। ওদের দলের সাথে থানা পুলিস্ কোর্ট চলছে। কথা বার্ত্তা বন্ধ। রতন খুড়ো ডাকটা শুনে আমার পরাণ কি যে ঠাণ্ডা হয়েছিল, কি আর বলবো, দেখাবার নয়। আড়ালে ওর সাথে আমার কথা হয়েছে - সবমিটমাট করে নেবে। অন্য কারও কথা শুনবো না, গোছা গোছা টাকা যাচ্ছে, গাঁয়ের ঐ শালাদের পেট ভরছে।

কালু — খুব ভালকথা। কিন্তু রতন খুড়ো। তুমি যে ঐ শালা বললে, ওটা না বললেই পারতে। শনি তো বসেই আছে তোমাকে হয়রানি করার জন্য। শুধু শুধু শনিদেবতাদের

গাল দিচ্ছ, এতে শনি দেবতা আরও ক্ষতি করবে। তোমরা নিজেরা ঠিক থাকলে, তোমাদের কে ঠকাবে? রতন, রতন খুড়ো সম্বোধনে একেবারে গলেই গিয়েছিল, তাই সে তখন দেবু, দেবু করবে ডাকে দেবু কাছেই ছিল। ডাকে একটা ঢ্যাঙা মার্কা লোক এলো। সে এসে বলে — কি বলছিলে খুড়ো।

— বৈরাগী বাবুর কথা শুনলি।

— কি কথা! একটু একটু শুনলুম। বড্ড ভাল কথা বলেছে।

কালু — দেবুদা! তোমার কথা শুনলুম। তোমরা কোর্ট কাচারির ঝামেলা মিটিয়ে নেবে শুনে আমরা সকলেই খুব খুশী। আচ্ছা বলতো তুমি একটা প্রবীন মানুষকে খুড়ো বলে সম্বোধন করলে, তোমার কিছু পয়সা টয়সা লাগলো। আর আসল কথা, মানুষ, কে কদিন বাঁচবে বলতো, তবে কেমন লাঠালাঠি ঝগড়া ঝাটি - সামান্য কারণে। আর বড় কারণ হলেই যা সেটা আলাপ আলোচনা, অনুশোচনা ও ক্ষমা ঘেন্নাতেই মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। আর আমরা যদি সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা থাকি, তাহলে ঝগড়া ঝাটি হবেই বা কেন? সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলে অভিমান ও রাগ ত্যাগকরে পরস্পরে অন্যায় স্বীকার আর ক্ষমাতে মিটিয়ে নেওয়া ভাল নয় কি!

শশা — দারুণ! দারুণ! আমাদেরও খেপার সাথে মিটমাট করে নিতে হবে। না হলে আমাদের ঠ্যাঙা লাঠি, শেষে থানা পুলিশ, কোট কাছারি হতে কতক্ষণ।

কালু হাসতে হাসতে — দারুণ! দারুণ!

সকলেই হেসে ফেলে। মায় রবি পর্য্যন্ত।

দেবুই বলে — শশা খুড়ো, তুমিই খেপা ডেকে বলো সবমিটে যাবে। এই যে রতন খুড়ো আমাকে ডাকা করালো, তাতে কি খুড়ো ছোট হয়ে গেল। আমাদের ছোক্‌রারা একটু ভুল করতেই পারি, তাই বলে বড়দের কি উচিত নয় ভুল শোধরানো! তুমি বললে আমিই খেপাবো ডেকে নিয়ে যাবো তোমার কাছে।

মনা — খুব ভাল! কথা বলেছে এটাও দারুণ দিল দেবু।

গোপাল — মনা খুড়ো! দারুণ দিচ্ছ তোমরা।

শশা — দারুণ, দারুণ। বলেই হেসে ফেলে। ঐ তো রয়েছে। একবার ডাক্ না। বলবি - গোপাল বা খুড়ো ডাকছে।

গোপাল — আমার নাম না করে, কালু ভাই্ এর নাম করবি।

কালু — না আমারও নয়। শশা খুড়োরাই নাম বলর্বি। দেখলে রতন খুড়ো, দেবুদাকে কেমন ডেকে নিল। অন্তর দিয়ে ডাকলে ভগবান সাড়া দেয়, আর কোথায় তোমার খেপা।

দেবু — ঠিক বলেছে, বৈরাগী ভাই। কি যে আনন্দ হচ্ছে, আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

একটু দূরেই পাথর বইছিল, খেপা খেপা হাঁক দিতে দিতেই পৌঁছে গেল। মিনিট খানেক পরেই হাজির।

দেবু বোধ হয় কথাটা বলেই রেখেছিল, আসার সময়। এসেই একবার শশার দিকে তাকিয়ে বলে, - শশা মামা ডাকছিলো।

শশা — হ্যাঁ। দ্যাখ্ আমাদের সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, লোক আবার ফাঁপিয়ে

ফুলিয়ে লাগান বাজান করছে, এতে লাঠালাঠি, কোর্ট কাছারি হয়ে যাবে কোন দিন, আবার হয়তো কারও লাস্ পড়ে যেতে পারে। কি লাভ্ জেদ রেখে। আমি বলছি, যা হবার হয়ে গেছে, তোরাও ভুলে যা আমরাও ভুলে যাই। একটা হাঁস তুই সাধনকে দিয়ে দিবি। আর যদি না পারিস আমিই দিয়ে দেবো।

খেপা — সে কিগো মামা। তুমি দেবে কেন, আমিই দিয়ে দেবো।

গোপাল — তোমাদের কাউকে দিতে হবে না, আমিই দিয়ে দেবো, তাহলে হবেতো।

কালু — গোপাল, তুমি, আমি দিলেও দিতে পারি। তবে কৃতকর্মের ভুলটা ঠিকমত শোধরানো হবে না।

রতন — খেপার নিজের দেওয়াই ভালো।

খেপা — বিকেলে, দিয়ে আসবো তোমাকে, তুমি দিয়ে দেবে।

শশা — তাই দিয়ে আসবি।

কালু — শশা খুড়ো থাকবে। খেপাভাই নিজেই দেবে তাতে ওদের মধ্যে মন কষাকষি কেটে যাবে।

গোপাল — সেটাই ভাল, না হলে একটু আধটু রাগ থেকে যাবে।

রতন — খুব খাঁটি কথা। একেবারে ওদের বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আসবি।

শশা — ঠিক আছে। এই যে খেপা আমাকে আবার মামা বলে ডাকলো, আমার কি কম আনন্দ হচ্ছে। আর এটা বাদ দিয়ে লাঠালাঠি, থানা পুলিশ করলেই কি ভাল হোত।

খেপা — মামা কিছু মনে করো না। আমাদের জেদেই খাচ্ছে। আমাদেরই দশটা হাঁস আছে, একটা মনে করবো শিয়ালেনিয়ে গেছে।

রবি — দুটো ডিম পাওয়া যাবে।

খেপা — কেনে বলতো।

রবি — একটা টেষ্ট হবে, বলেই হেঁসে ফেলে।

কালু — রবিদা তুমি আমাকে ডোবালে দেখছি।

রতন — এই বয়সে আমিষ ছাড়লে চলে।

শশা — ঠিকতো। মাছ, মাংস, ডিম না খেলে কি খাবে। আর এখানে দৈনিক আনাজপাতি পাওয়া যায় না।

রবি — সেদিন দেখলেতো, ভোলানাথ খুড়োর মা কেমন করে মাছ খাইয়েছে। সবাই চায় এখন থেকে নিরামিশ নয়।

শশা — খাবে নিরামিশ। পরে।

খেপা — তুই যাবি। গোটা চারেক দুবো।

কালু — খেপুভাই। আজ থেকে রবি সকলের দাদা। সমস্ত মহিলারা, রবিদা জিন্দাবাদ জানিয়েছে তা জান।

শশা — রবে খোঁড়া, রতন ভাইএর পাঁঠাতো নয়, শুধু রবি দা। রতন ভাই - রবি তোমার পাঁঠা কি সত্যিই।

রতন — ওকে ওভাবে ডাকতে শুনলে, আমার কষ্ট হোত, কি করবো, কেউ কারো কথা শুনবে না।

মনা — মেয়েরা যখন বলছে, তখন ঠিক, রবি, রবিদাই হয়ে যাবে। মেয়েরা ছেলেদের শাসন করলেই হোল।

গোপাল -— ঠিক কথা, মায়েরা ছেলেদের সামালালেই ঠিক হয়ে যাবে। আর তোমরা মোড়ল মুখ্যেরা তো রইলেই। এটা আবার তোমাদের কাছে ব্যাপার।

লাইনের মধ্যে একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল, "মুড়ি খাবো, মুড়ি খাবো।" রতন ও শশারা হুকুম দেয়, সকলে শেষ বেলায় যেন একটা করে পাথর নিয়ে যায়। কালুও একটা নেয় কাঁধে। কালুকে নিতে দেখে গোপালও নেয়। রবি চেষ্টা করে কিন্তু পারবে কি করে, একহাতে ওর লাঠি। শশা ও রতন নিষেধ করে গোপাল ও কালু শোনে না। একসময় ওরা পৌঁছে যায়। অবাক বিস্ময়ে দেখে কালু ও গোপালের কাঁধে পাথর। অনেক পাথর জমেছে। গাঁয়ের অনেক লোক এসেছে। ইউরিয়া বস্তায় গোটা দশেক বস্তা। একটা মাঝারি জামবাটিতে মেপে দিচ্ছে মুরালি, ভোলানাথ দিচ্ছে দুটো করে চপ, আর একজন কাঁচা লংকা, আর একজন পিঁয়াজ। মুরুব্বিরা সকলে দেখছে। রামচরণ খুড়ো জিজ্ঞাসা করে মায়ের পূজো হয়েছে কিনা। হয়নি জেনে তাড়াতাড়ি পূজো সেরে নিতে বলে। সকালেই সে স্নান করছিল। পূজোয় বসে। শশারা বলে, কেউ মুড়ি খাবি না। মায়ের পূজো হলে আমরা খাবো। কালুর হৃদয় নাচছে আনন্দে। গোটাচারেক বৌমানুষ দাঁড়িয়েছিল পূজোর জন্য। ভরা গলায় মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। মন্ত্রও শুদ্ধ উচ্চারিত হয়। ঘন্টা ও মন্ত্রের ধ্বনিতে, ধূপে অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকলের মনে ভক্তি জাগে। পূজো সারা হয়।

শশা বলে — প্রসাদ দাও মায়ের, তারপর মুড়ি খাবো। বংশীরা বৌদের জানায় সামান্য প্রসাদ রাখছি। বাকি বিলিয়ে দিই। বৌরা জানায় বেলপাতা থাকলেই হবে। আজ বেশী লোক আছে জেনেই ২কেজি চিঁড়ের ভোগ এনেছে। বংশী প্রসাদ দিলে তবে ওরা মুড়ি খেতে শুরু করে। শশা ভোলানাথের কাছে জানতে চায় মুড়ির কথা ছিল না। উত্তরে ভোলানথ সব কি কৈ ফিয়ৎ থাকে। ধর মা কালীই জুটিয়ে দিয়েছে। জান ফেলারমা পুরো এক শলি মুড়ি দিয়েছে। তাহলে আর কে না দিয়েছে বল। শশা বলে ওঠে 'জয় মা কালী', সকলে জয় মা কালী ধ্বনিতে, শ্মশান প্রান্তর ভরে ওঠে। খাওয়া সারা হতে হতে শশা, রতন, মনা জানায় গোপাল ও কালুর দুধাপ সিঁড়ির কথা। একবাক্যে সকলে স্বীকার করে নেয়, ওতে মন্দিরটা আরও সুন্দর হবে। তাই একটু পাথর বেশীই লাগবে, দেরী হবে - দেড়টা দুটো হয়ে যাবে তাদের, তারা বালি বয়ে তবে স্নান সেরে ফিরবে। যদি চানের জন্য তেল পেলে ভাল হোত। সকালে কাজে আমার সময় সকলে ঝুড়ি কোদাল এনেছে। ভোলানাথ - সে নিজেই তেল নিয়ে আসবে। মুড়ি ওরা তৃপ্তিতেই খেল। পরে আবার কাজে লাগে। হাসির উচ্ছ্বাসে, মনের ভাবাবেগে প্রকাশিত হয় বনানীতে, বনানীও মুখরিত হয়, হয় আমোদিত। দেখতে দেখতে প্রায় সকলে শুনে ফেলেছে, রতন আর দেবুর শশা ও খেপার ঝগড়া মিটে গেছে, রবে খোঁড়া এখন রবি দাদা। সকলেই আলোচনা করে মন্দিরের কথা সবশেষে গোটা গাঁ একত্রে খাওয়ার কথা। সুতরাং কালুর প্রতি সকলের একটা ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে। আর গাঁয়ের রামচরণ খুড়ো, নিতাই খুড়ো, ভোলানাথ, মুরালি, বংশী, গোপালের গোটা ফ্যামিলি, ভোলানাথের মা কালী পিসির কথা মুখে মুখে ঘুরছে। গোটা গাঁ একটা উত্তেজনার আগুন পোয়াচ্ছে। আর তো মাত্র মাস দেড়েকে। আগামীকাল শুরু হবে মন্দিরের

কাজ। বেশী মিস্ত্রি লাগানো হবে। চারজন মিস্ত্রী লাগবে, আট দশ জন যোগাড়ে লাগবে। ঠিকহয় - শশা প্রতিদিন চারটা আর রতন ও মনা উভয়ে মিলে প্রতিদিন তিনটি করে ছয়টি, মোট দশটা কুলি পাঠাবে। দিন দশেকের মধ্যে ঢালাই হয়ে যাবে, আর লাগবে প্রায় একমাস ফিনিশিং করতে। কেউ কেউ বলেছে মার্বেল বসবে। মন্দির ও বারান্দা একসাথে হবে, কংক্রিটের পিলার আটাচালায় ও মন্দিরে থাকবে। আর ছাদের উপর রথের আকৃতি করা হবে চূড়োর সাহায্যে। কত কথা হয় মন্দির নিয়ে উৎসব নিয়ে, রান্না ঘর, স্নানের ঘাট থেকে মার শোবার বিছানায়। একসময় পাথর বোওয়া শেষ হয় প্রায় দুটোর সময়। সকলেই বিশ্রাম করে, বটের ছায়ায়, পরে বিশ্রাম করে, বালি তোলার কাজে লাগে, বালি আসছে আরও দ্রুত গতিতে, দূরত্বও কম। ঘন্টা খানেকের মধ্যে বালি নেওয়া শেষ। দু'শয়ের উপর লোক এরূপভাবে একসাথে বিনিপয়সায় কাজ করেনি কোন দিন। একসাথে কাজ করার সাথে যেন একটা নেশা আছে। নেশার ঘোরে হাজার গল্পে বালিও তোলা হচ্ছে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই একটা ছোট খাট বালির টিলা তৈরী হয়। আর বালি লাগবে না। হীরু মিস্ত্রি জানিয়ে দেয়। বিকেলে অন্য মিস্ত্রীদের হেডকে এনেছে, বাড়ী মুর্শিদাবাদে। ওরা মাপজোপ করছে। এদিকে ভোলানাথ ও রামচরণ খুড়োর দলবল হাজির। ওদিকে কালু আর রবি খাওয়া দাওয়া করছে। শশারা তেল নিয়ে নদীর দহের কাছে যায়। অর্ধেক তেল মেয়েদের দেয় - কালুর কাছে একটা পাত্র নিয়ে। স্নানটা ওদের জমেছে ভালই, একসাথে এতো মেয়ে পুরুষ কোন দিন স্নান করে না। নদীগর্ভে ওদের হাসিতে, স্যাঁতারে, গল্পে গল্পে প্রাণ ফিরে পায়। নদীও খুশী মহাকালের অনন্ত প্রবাহে ওরাও কিছু স্বাক্ষর রেখে যেতে পারবে জেনে ওরা চাইছে আজকের দিনটাকে স্তব্ধ করে দিতে। কেউ কেউ মাছ ধরছে গামছা দিয়ে বালির লম্বা নলের মতো করে ট্যাংরা মাছ।

মেয়েরা আগে ভাগে উঠে যাচ্ছে, কারণ তাদের বাড়ীর রান্নার কাজ আছে। অবশেষে সূর্য্য ডোবার আগে নদীগর্ভ শান্ত হয়। শেষে কালুকে ভোলানাথের দল জানিয়ে দিয়ে যায়, কাল সকালে পূজো সেরে, মন্দিরের কাজ শুরু হবে। আরও জানায় দুই ধাপ নয় তিন ধাপ পৈটে হবে সমস্ত মন্দির ও আটচালা ঘিরে। আর মন্দির ও আটচালা একসাথে জোড়াই হবে।

মায়ের মন্দিরের উপরটা গোলাকৃতি চূড়ো হবে ইত্যাদি। কালু শুধু জানায় ও আপনারা যেভাবে করবেন সেটাই হবে। ওরা জানায় তুমি যেমন বলেছিলে সিঁড়ি বা পৈটা হলে ভাল হয়। রাজমিস্ত্রী বলেছে, ওটাতেই আরও খোলতাই হবে। ওরা ফিরে যায় বাড়ীতে রাত হওয়ার মুখে।

রাত নামছে। রবি একটু গাঁয়ে গেছে। বলেগেছে ওর দরকার আছে, আলো জ্বালে না, ওরা যাবার পর যে শুরু আছে আর উঠেনি। নদী প্রান্তর, শ্মশান শুন শান। ছম্ ছম্ করছে গোটা পরিবেশটা। শুয়ে শুয়ে আকাশ প্রান্তর, আঁধারে নিজেকে হারিয়েদিতে ভালই লাগে। মৃদু মন্দ দখিনা বাতাস হয়। মনটা শান্ত এক অদ্ভুত আবেশে। ছম্ ছম্ করছে কিন্তু ভয় লাগে না। একসময় রবি হাজির হয়। আলো জ্বালা হয় নি বলে বিরক্ত হয়।

— রাতে একা থাকলে অন্তত একটা আলো জ্বালবে।

— এত দেরী হোল।

— তোমার সম্বন্ধে, মন্দির সম্বন্ধে কত কথাই লোক জানতে চায়। তো সব কিছু জানাতে জানাতে দেরী হয়ে গেল।

— গামছাতে ওগুলো কি?

— ডিম আছে আর বেগুন আছে। খেপা আটটা ডিম দিয়েছে। গোপালের ঘরে বেগুন নিয়ে এলুম।

— মা, কাকীমারা, ঠাকুমারা কিছু জিজ্ঞেস করছিল।

— হ্যাঁ, তা আবার জিজ্ঞেস করেনি!

— আর তুমি সব ভাতে ভাতের খবর বলে দিলে।

— না বলে পারলুম কৈ। যা উকিলের মতো এজাহার।

— তুমি হাত পুড়িয়ে রাঁধছো বলে দুঃখের শেষ নেই।

— উপায় কি বল। বেশ তো রাঁধতে সময় কেটে যাচ্ছে। এরপর রান্নায় একটু রাত বাড়বে, সকাল খেয়ে ঘুমোনো ভাল লাগে না। তোমার কোমরে কি ওটা।

— ওটা বাঁশী।

— বাজাতে জান।

— একসময় খুব বাজাতুম। বন্ধ হয়ে গেল আমাকে যখন পাঁঠা বানিয়ে ফেললো - তখন দুঃখের যন্ত্রনায় ছেড়ে দিলুম।

— আজ তবে, আবার বাঁশী কেন?

— আজ আমার দুঃখ নেই, তাই বাঁশী আবার বাজাব।

— কেন দুঃখ নেই?

— আজ আমি সকলের রবিদা, জান খেপাদের পাড়া গিয়েছিলুম সকলেই মেয়ে মরদ মুচকি হেসে রবিদা বলে ডেকেছে। হেসে হেসে বলছে কারণ পুরোনা কথাটা এখনও ভুলতে পারে নি, তা হোক, বলতে বলতে একদিন সবঠিক হয়ে যাবে। মনটা বেশ হাল্কা লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। তবে একমাত্র শশা শুধু মুচকি হেসে বলে — পাঁঠা মানুষ হয়ে গেল। আমি বলেছি, শশা খুড়ো তুমি আর ওসব মনে করিয়ে দিও না বরং তোমাকে একদিন একটা বোতল দুবো। শশা হেসে বলে — দূর বাবা বোতল নিলে পাপ হবে, কালু বাবাজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম সেটা মিছে হয়ে যাবে। আর কেউ বলবেক নাই, বললে আমাকে জানাস্ আমি হাড় গুঁড়ো করে দেব।

— দাঁড়াও লন্ঠনটা জ্বালাই।

— না রবিদা লন্ঠনটা জ্বালাতে হবে না। আঁধারেই ভাল।

রবি লন্ঠন জ্বালায় না, শুরু করে বাঁশী বাজাতে। বাশী অনেক ক্ষণ ধরে বাজায়। রবি বাঁশী বাজাচ্ছে দারুণ। মনে হাজারো ঢেউ উঠেছে বাঁশীর সুরে। মনতরঙ্গে বাঁশীর সুর মিলে মিশে একাকার। নদী প্রান্তর বনানী আকাশ বাতাস মুখরিত। রাতের আকাশ সুরে সুরে মোহিত হয়ে গলে গলে শিশির হয়ে নামছে। বাঁশীর, সুরে হৃদয় অতীত জীবন তরঙ্গ উজানে বইছে। মনে পড়ছে, জবার ভীষণ ইচ্ছের কথাটা - টিভি, সিডি সাথে সাথে বাঁশীর কয়েকটা ডিস্ক। ডিস্ক চলবে, বাঁশী বাজবে, শুনতে শুনতে রাধা নীল যমুনায় পাড়ী

দেবে, আবগাহন করবে শেষে কদমতলায় কালাচাঁদের সাথে এক হয়ে যাবে। কালুরও মনের মাঝে একই অবস্থা, সে যেন তার রাধাকে খুঁজে পায়। শেষে সেই বাচ্ছাটাকে। দারুণ ভাল লাগছে। জীবনে যদি কিছু শান্তি থাকে তবে এই নদীকূলে শ্মশানে প্রান্তরে, বনানীতে। আর কোথাও শান্তি নেই। এখানেই সকল শান্তির সমাবেশ। তারমত সুখী আর কে? এখন সে যেন জবাকে ও তার সন্তানকে পেয়েছে। সাথে সমস্ত অতীতে, আর অতীতের মাঝে মা, বাবা, আত্মীয় স্বজন, বাল্য কৈশোর সকল কিছু, যা একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। একসময় বাঁশী থামায়। রবিও চুপ করে অনেক ক্ষণ বোবা হয়ে থাকে। রবিও হয়তো অতীতে অবগাহন করে শান্ত নির্মল দেহে অবগাহনের স্নিগ্ধতা উপভোগ করছে। আকাশে তারা ফুটেছে, ওপারের বনানী, টিলা, নদী প্রান্তর বনানী ও যেন বেজায় খুশী। ওরাও ওদের মতো, বাঁশী সুরে বেজায় খুশী হয়ে ধ্যান গম্ভীর চুপচাপ। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, পাখীর ডাক কিংবা পাখীর পাখনার ঝট পটানিও নেই, অন্য দিন দু একটা শেয়াল ডাকে তারাও ডাকে না। সকলেই স্তব্ধ, নিস্তব্ধ নীরব . . .।

রবি বাঁশী বাজিয়ে আজ যেন প্রানটাকে নির্মল করে নেয় অনেকদিনের আবর্জনা সরিয়ে।

রবি ভাই বলে — বাঁশী বাজিয়ে জীবনটা যেন হাল্কা হোল।

— সত্যিই।

— কতদিন বাঁশী বাজাই নি।

— কত দিন?

— বছর দশ পনেরো হবে?

— বাজাওনি কেন?

— কি আর বলবো, বলার মতো কিছু নেই। আমি খোঁড়া হলেও বিয়ে করেছিলুম। মাস পাঁচ ছিল। বাবা মা গত হওয়ার পর এক সংসার ভেঙ্গে গেল। আমাকে আলাদা করেদিল। বিয়ের কৈফিয়ৎ ছিল, বাবার এক বিঘে জমি, বাবা আমাকে দিয়ে যাবে। তিন ভাই তা মানল না। ভিখারী অবশেষে। জাত গেল, মান রইলো না। ভিখারীর সংসারে শ্বশুর শ্বাশুড়ী বৌকে থাকতে দিল না। বৌ যেতে চায়নি ভুলিয়ে ভালিয়ে - নিয়ে গেল। মাস খানেক পরে শুনলুম স্যাঙা দিয়েছে। এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ভালই হয়েছে, নিজেই খেতে পাইনা। ওকে কি খাওয়াতুম।

— তোমার বৌ, তোমাকে খেটে খাওয়াতো।

— তা পারতো, শরীরটাও মজবুত ছিল। কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ি থাকতে দিল না যে। ওদের একটাই কথা ভিখিরীর কাছে মেয়ে রাখবে না। হ্যাঁ কালু ভাই ভিখিরী কি এতই খারাপ!

— কি জানি! আমরা যখন ভিখারী, তখন আমরা কি বিচার করবো।

তবে এখন আমাদের মতো সুখী আর কে আছে। যদিও আমরা লোকের করুণায় বেঁচে আছি।

— আমার তা মনে হয় না।

— কি মনে হয়?

— মনে হয়,আমরা করুণার পাত্র হয়ে, ওদের করুণা করতে সুযোগ দিচ্ছি। সুযোগ দিচ্ছি পূণ্যি করতে।

— তা ঠিক, একটা কারণ খাড়া করা গেছে।

— সত্যি বলছি, ভিক্ষা দেওয়ায় যদি পূন্যি থাকে, তবে পূন্যি করতে সুযোগ দেওয়াতেও কম পূন্যি নয়।

— যাক্ একটা সান্ত্বনা থাকা ভাল। তবে যদি সবাই পূন্যি করতে মানুষকে সুযোগে ভিখারী হয় তাহলে কে ভিখ্ দেবে?

— তা অবশ্য বটে, তবে ওটা কোনদিনই হবে না। যাকগে রাতের রান্নাটা করতে হবে না?

— হবে হবে! শুধুভাতে ভাত।

— ভাতে ভাত নয়। ডিম আর বেগুনের টেস্টটা।

— আজকেই।

— নতুন খোলাটা পুরোনো হয়ে গেলে, যদি সেরকম না হয়।

রান্না চাপে, রান্নার নানা কথা বার্ত্তা হয়। ডিম ভাতে দেয় কাপড়ে বেঁধে দেয় পরে ওটা হাঁড়ির গলায় বেঁধে দেয়, সহজে বের করা যাবে। ভাত হতে থাকে। রবি বেগুন. আলু কাটতে থাকে। পরিমানে বেশীই দেয়। আগামী কাল সকালে কেমন প্রকৃতির ফ্রীজে কেমন জমে, তা দেখা দরকার। ভাত রান্না হয়। ডিম ছাড়ানো হয়। মসলা বাঁটে রবি। নূতন রান্নার খোলা আগুনে চাপানো হয়। ডিমটাকে, আলুভাতের মতো চটকানো হয়। খোলায় তেল দেওয়া হয়। ডিম চটকানো তেলে ছেড়ে দেওয়া হয়. অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া হয়, পরে আলু বেগুন মুগুরী কলাই দিয়ে পরে মসলা দিয়ে কষতে থাকে। পরে নুন। জল দেওয়া হোল একটু বেশী। কারণ এটাই ডাল, এটাই তরকারী। গল্পে গল্পে রান্না আগায় রাতও বাড়ে। এক সময় রান্না শেষ হয়।

খেতে বসেছে ওরা। তরকারী মুখে দেয়। অপূর্ব স্বাদ হয়েছে জানায় রবি। কালুও নিজে খেয়েছে। সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। পরম পরিতৃপ্তিতে খায়। কালু এখন ফিরে গিয়েছে, সেদিনের সেই ধানের কুঁড়ে বন্ধু হলধর, কানাই এর মধ্যে। তুলনা করে সেদিন ছিল ফাঁকা মাঠ, প্রান্তর আর শ্মশান। এখানেও নদীতীর, প্রান্তর শ্মশান। অপূর্ব মিল। মনটাও ঠিক যেন তেমনই আছে। তরকারীর স্বাদ অপূর্ব হয়েছে, সেদিনের মতোই। খাওয়া হয় দারুণ তৃপ্তিতে। রবি বারে বারে প্রশংসা করে। তার মতে অপূর্ব . . . অমৃত। কিছুটা তরকারী রাখে রবির জন্য ঠিক তেমনি ভাবেই। চালার উপরে ফাঁকা আকাশের নীচে রেখে দেয়, যত্ন সহকারে। পরের দিন সকালে, ভোরেই, বাসী ভাত ও ডিমের তরকারী নিয়ে বসেছে। রবির মতে গতকালের চেয়ে আজ সকালে আরও স্বাদ ভাল হয়েছে। কালু এখন খাবে না। মাকে পূজো দিয়ে তার পর। আজ আবার নতুন গাঁথনির ব্যাপার আছে। সকালে স্নান সারে নদীতে ফুল তোলে অনেক। লোক আসতে শুরু করেছে। আসছে গাঁয়ের মেয়েরা। হাতে পূজোর সরঞ্জাম। দেখতে দেখতে এসে গেছে সকল মাতবরেরা। ভোলানাথের মা, গোপালের ঠাকুমা, গোপালের মা, কাকীমা, ভোলানাথদের ছোট বৌ ছাড়া বড় ও মেজ বৌ, মুরালীদের বৌ ও জা, বংশীদের বৌ, কালীপিসি এসেছে। সাথে এসেছে তিন ভাই এর বৌ, নিতাই, কিংকর

কানাই, আরো অনেক বৌ ঝিরা ছেলেপুলেও কম নয়। একটা জিনিষ লক্ষ্য করে অবাক হয়, সকলেই স্নান করছে, মায় - রামচরণ, কিংকর, নিতাই, গোবিন্দ খুড়েরা সকলেই। কেউ স্নান না করে আসেনি। এমন কি শশা, রতন, দেবু, মনারাও। যে এখানে এসেছে সেই স্নান করেই এসেছে। মিস্ত্রীরাও, কুলি কামিনরাও বাদ যায় নি। ঘরটা পরিষ্কার করে গোপালের মা কাকীমারা, সাথে আরও মহিলারা, পূজো সাজানো হয়েছে, জ্যামবাটি খরাতে। ফলমূল যথেষ্ট এসেছে। দেখতে দেখতে পূজারিণীদের লাইন দেখা যায়। একসমসয় ভোলানাথের মা বলে — মনে হচ্ছে, গোটা গাঁয়ের লোকই পূজো দেবে।

দেরী করতে হবে। রামচরণ খুড়ো জানায় মনে হচ্ছে গোটা গাঁয়ের লোকই পূজা দেবে। দেরী হোক, সকলের পূজো এলে পূজো আরম্ভ হবে। লোক আসছে তো আসছেই, আধ ঘন্টা পরে ভিড় কমে এল একটি দুটি করে আসছে। এইদিকে কালীপিসি মহিলাদের জানায় কিভাবে মন্দিরটা হবে, ভোলানাথের কাছে শুনে ছিল গতকালই। তাই সে পূর্ণ উদ্দামে বলে যায়। সমস্ত মন্দির ও আটচালা সহ তিনতে পৈঠা হবে তার উপর মূল ভিত। মায়ের মন্দির হবে গোলাকার চূড়ো দিয়ে, আর ছাদের চার পাশে রথের মতো অনেক চূড়ো থাকবে। পয়সা বাড়লে মেঝে পিঁড়েতে মার্বেল বসবে। ভোলানাথের মা জানায় — মায়ের ইচ্ছা হলে মার্বেল কতক্ষণ সোনাতে মোড়া যাবে। গোপালের ঠাকুমা গাঁয়ের লোকের যা ভক্তি তাতে সবকিছু হয়ে যাবে। গোপালের ঠাকুমার কথায় সকলেই সায় দেয়। এদিকে পূজো উপাচারে পিড়েটাও ভর্ত্তি হতে চলেছে। মহিলারা গলবস্ত্র করে এসেছে। রামচরণ খুড়ো জানায় এবার পূজো শুরু করলে ভাল হয়। সকলেই একমত। পূজো আরম্ভ হয়। কালু এতোক্ষণ ব্যাস্ত ছিল নৈবেদ্যেতে ফুল ও বেলপাতা দিতে। ধূপের ও ধূনার গন্ধ এক অপূর্ব শান্ত স্নিগ্ধ। কালু আজ যেন তার সমস্ত ভক্তিই উজাড় করে দিয়ে মন্ত্র পাঠ করছে। মন্ত্রে উচ্চারণ ও সুন্দর ফাঁকা প্রান্তর শ্মশান প্রতিধ্বনি হয়। রোমাঞ্চিত হয় না শুধু সমবেত মানুষের মন, রোমাঞ্চিত হয় গোটা এলাকাটা। একটু কথাও শোনা যায় না কেবল গোপালের ছোটকাকীমা আর কালীপিসি ধুনো ও ধূপের তদারকি করে। ভোলানাথের মা একসময় নির্দেশ দেয় ঠাকুরের ফুল চড়াতে। নীরবে ফুল চড়াতে থাকে কালু, আর জোরে জোরে মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। এক সময় ফুল পড়ে। মহিলারা মা, মা বলে ধ্বনি দেয়। সকলেই খুশী। এবার ভিত পূজো হবে। ভীত পূজো শেষ হয়। কালু এবার সকল দর্শনার্থীদের তাকায়। পরে মসলা বানাতে বলে। মসলা বানায় এক কড়াই। গোটা দুই তিন পাথর আনতে বলে। একসময় কালীপিসিকে ডেকে জিজ্ঞেস করে এখানে কার কার বেশী বয়স হবে। কালীপিসির মতে, গোপালের ঠাকুমা, তারপর ভোলানাথের মা ও রামচরণ খুড়ো। কালুর নির্দেশে কালীপিসি ওদের ডেকে আনে। মসলা আনতে হুকুম দেয়, গোপালের কাকীমাকে শাঁখ বাজাতে নির্দেশ দেয়। মসলা আনা হয়, কালীপিসিকে দিয়ে ভিতে মসলা ঢালানো হয়। কন্নিক দিয়ে মসলা ফেলে দেয় কালীপিসি। শাঁখ বাজতে থাকে, কালু মন্ত্র বলছে উচ্চস্বরে, এই ফাঁকে - রামচরণ দাদু, ঠাকুমাদের একখানা করে পাথর বসাতে বলে সিমেন্টের উপরে আর মেয়েদের বলে উলুধ্বনি দিতে। শঙ্খে, ঘন্টায় উলুধ্বনিতে মুখরিত পূজা প্রাঙ্গন। নড়বড়ে দুহাতে ওরা এক একখানা পাথর বসিয়ে দেয়। শেষ ভিত্তি প্রস্তর

স্থাপনপর্ব। শশা সেই মূহুর্তে বলে — দারুণ! দারুণ! পরে ধ্বনি দেয়, "কালী মায়ী কি জয়"। সকলের কণ্ঠই ধ্বনিতে মিশে যায়, "কালী মায়ী কি জয়।" তালে তালে বেশ কয়েকবার ধ্বনি দেয়। সকলের মুখেই হাসি, সকলেই খুশী সকলের মনে এক অজানা আনন্দে মন পুলকিত হয়। সকলেই দাঁড়িয়ে। মিস্ত্রীরা পাথর গাঁথতে যাওয়ার ঠিক সময়েই কালু গাঁথতে নিষেধ করে বলে একটু দেরী করতে। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে কিছু প্রসাদ নিয়ে আসে, প্রথমে রামচরণ খুড়ো ও ঠাকুমাদের, জন দুই খুব ছোট বাচ্ছাদের পরে মিস্ত্রীও কুলি কামিনদের প্রসাদ দেয়। ওদের প্রসাদ খাওয়া শেষ হলে, গাঁথতে হুকুম দেয় কালু। মেয়েরা তখন শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি শুরু করে, কালু মন্ত্রপাঠ করতে থাকে, ওরা পুলকিত মনে পাথর গাঁথতে থাকে।

শশা আর একবার বলে — দারুণ! দারুণ! বলেই "কালী মায়ী কি জয়"। মন্দির প্রাঙ্গন ভরে যায় - মা কালী জয় ধ্বনিতে।

মেয়েপুরুষ ছেলেপুলে সকলেই বেশ কয়েকবার "মা কালী কি জয়" জয়ধ্বনি দেয়। জয়ধ্বনির রেশ যেন অনেকক্ষণ সকলের মনে ও মন্দির প্রাঙ্গনে প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত হয়। সকলেই নির্বাক কিছুক্ষণ। এবার অনেকে বাড়ী যাওয়ার অপেক্ষায়। বিশেষ করে মহিলারা। বাড়ীতে ওদের না গেলেই নয়, অনেক কাজ পড়ে আছে, অথচ এখানে থাকতেও ইচ্ছে হচ্ছে। ভোলানাথের মা একসময় বলে — চাল আলু টালু ঘরের এক জায়গায় ঢেলে রেখে যাও, আর ফলমূল প্রসাদ সামান্য কিছু বড় গামলাটাতে দিয়ে যাও, অনেক লোক এসেছে, তাদের প্রসাদ দিতে হবে। তার সাথে একটা মেয়েকে বলে — যা তো মা ঐ সিমেন্টের বস্তাটা ধূয়ে শুকুতে দে, এখানে চালটাল রাখার কিছু জায়গা নেই। মেয়েরা ভোলানাথের মায়ের কথা মত প্রসাদ রেখে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। অনেকে গেল, এখনও কিছু থেকে গেল, ওদের বেশ ভালো লাগছে প্রায় নতুন পরিবেশ। এদিকে তো আসাই হয় না, তেমন, এক পূজোর সময় ছাড়া। মহিলা পুরুষ সকলেই খুশী কালুর পূজা ও সাধারণ বুদ্ধিতে। বিশেষ করে কালীপিসি তো মহাখুশী, ভোলানাথের মা ও গোপালের ঠাকুমাও কেন খুশী নয়। এতো সম্মান দিল ছেলেটা। কৈ কারও মাথায় এব্যাপারটা আসেনি। রামচরণ খুড়োর মতে - কালুকে যদি মা কালী এখানে রাখতে পারে তাহলে মন্দিরের ভাল নয় শুধু গাঁয়েরও ভাল। ওরা সকলেই শুনেছে মুচিপাড়া ও বাগ্দীপাড়ার দলাদলি মিটে গেছে, রবে খোঁড়াকে আর কেউ রবে খোঁড়া কিংবা পাঁঠা বলছে না। ওদের সকলের মতে ছেলেটা ভেল্কি জানে। মুরালী ও বংশী গামলায় সকলের দেওয়ার প্রসাদ বিতরণ করতে থাকে শাল পাতার ঠোঙায়। মহিলারা ঠোঙায় বানিয়ে দেয়, কাছেই শালপাতা তুলে। পরম তৃপ্তিতে প্রসাদ খায়, শশা ঠোঙা দুই প্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত। এদিকে কালু, পূজো সারা হতে তার ডেরায় ফিরে যায়। গোপালের মা, কাকীমা ও অন্যান্য মহিলারা চাল আলু ও তরকারী আলাদা আলাদা করে জড়ো করে রাখে। পরে ঘরটা সমস্ত ধূয়ে পুঁছে ঠিক করে দেয়। কাজ সারা হলে, গোপালের মা কাকীমারা ও ভোলানাথের বাড়ীর মহিলারা ও অন্যান্য অনেক মহিলারা কালুর কাছে যায়, এক ঠোঙা প্রসাদ নিয়ে। গোপালের মা কাকী সারা ঘরের ভিতর ঢুকে দেখতে থাকে খুঁটিয়ে। বকুনি দেয় প্রতিদিন গোবর না দেওয়ার জন্য। রবিকে ডাকে। রবিকে বলে — তুই সকালে উঠে মায়ের ঘর পরিষ্কার করবি গোবর দিবি পরে তোদের ঘরটা গোবর

দিবি, এটাও করতে পারিস না। রবি ও ভুল স্বীকার করে নেয়, আর ভুল হবে না বলে জানায়।

ভোলানাথের মা বলে এবার মাঝে মধ্যে এলে দেখে যাবে, ডাক্তারতো হাঁটা চলা করতে বলেছে, গোপালের ঠাকুমা, কালী ঠাকুরঝি আসবো দেখে যাবো। তোরা কি করছিস্?

মহিলারা বাড়ী ফেরে। পুরুষরা রয়ে গেছে। বোধ হয়, দুপুর না হলে যাবে না। মুরালী বলে একটা বেঞ্চ হলে বসা যেতো। ভোলাদা তোমার তো তিনটে বেঞ্চি আছে। একটা দিনকতকের মতো পাঠিয়ে দিও। তখন দেবু বাগ্দী ছিল। দেবুকে আনতে বলে - দেবুও আধঘন্টার মধ্যে নিয়ে আসে। ওরা আরামে বসে, দেখতে থাকে রাজমিস্ত্রীদের কাজ। চোখের সামনে একপাট ভীত গাঁথা হোল। ছটা মিস্ত্রী লেগেছে, তার মতো কুলিকামিন। মিস্ত্রীরা জানিয়েছে তিনটে পৈঠা সহ দাওয়া পর্য্যন্ত তিনদিন লাগবে। তারপর পিলার ঢালাই। শুধু মন্দিরের দেওয়াল হবে সেটা সহ পিলার পর্য্যন্ত আরও দিনচার। তার পর পাটা স্যাটারিং, মন্দিরের মূল চূড়োটা একটু সময় নেবে। ঢালাই হতে আরও দিন আষ্টেক। খুব তাড়াতাড়ি করলেও মোটামুটি লাগবে, বারো দিন ঢালাই পর্য্যন্ত। এই বারোটা দিন কিভাবে পার হবে। এরই মধ্যে কালীমূর্তিও গড়াতে হবে। সময় কম। দেখতে দেখতে দেড় মাস চলে যাবে। পূজো এসে যাবে। পূজোর যোগাড়ও আছে। লোকগুলো যেন একটা ঘোরে আছে! বাড়ীর কাজও ডকেতে উঠেছে। অবশ্য বাড়ীতে এদের বেশী একটা কাজ দেখাশুনা করতে হয় না। ছেলেরা ভায়েরা দেখাশুনা করে তাই এখানে সময় দিতে পারে। সিমেন্টের বস্তাটা শুকুতে মুরালী ও বংশী চাল বস্তায় কুড়োয়। বেগুন আলুও কেজি চার পড়েছে। ষোল আনা গোটা কুড়ি পড়েছে। চাল মোটামুটি আধ মন হবে। বংশী সকলকে জানায় আজকের পূজোতে যা পড়েছে। ভোলানাথ বলে টাকাটা কালুকে দিয়ে আয়। বংশী টাকা দিতে চায়। কালু হেঁসে বলে, তার টাকার প্রয়োজন নেই। চাল টাকাতো মায়ের। এগুলো মায়ের উৎসবের সময় লাগালেই ভাল। তাহলে গাঁয়ের লোকেদের ওপর চাপ পড়বে না। ভিক্ষেতেই আমাদের চলে যাবে। একদিন ভিক্ষে করলে দুইদিন চলে যায়।

বংশী বলে — যদি না নাও তবে আমার সাথে চল ওদের কাছে।

কালু — যাচ্ছি, চল তবে।

ভোলামাথ — চাল, পয়সা নেবে না কেন?

কাকু — না থাক্। যখন প্রয়োজন হবে তখন ধার নিলেই চলবে। দুটো লোকের কত আর দরকার। একদিন ভিক্ষে করলে দুদিন চলে। ওগুলো মায়ের জিনিষ মায়ের কাজে লাগবে। সেটাই ভাল হবে।

কিংকর খুড়ো — তোমাকে ভাই যত দেখছি, ততই আশ্চর্য হচ্ছি। পূজারী চাল টাকা নেবে নাতো কে নেবে।

কালু — দাদু, ওগুলোতো মাকে দিয়ে গেছে। জানি মায়ের জিনিষ ছেলেরও। তবে কোলে বসে মায়ের আদর খেয়ে ছেলে কি ঠিক যথার্থ মানুষ হবে না থাকবে। তাই আমি ঠিক করেছি ভিক্ষাতেই আমরা চালিয়ে দেব।

রামচরণ খুড়ো — আরও অবাক করলে দেখছি। তেমার মাথায় কখন কি উদয়

হয় একমাত্র ভগবানই জানেন। তবে ভাই তোমার ইচ্ছাটা আমার ভালই লাগবে, তবে তোমার যখন খুশী যা নিয়ে নিও। এটা তোমরই জিম্মায় থাকবে আমাদের ব্যাপার নয়। টাকাটা রেখে দাও, দিও প্রয়োজন হলে।

কালু — না দাদু! আপনিই রাখুন। না হলে একটা প্রণামী বাক্স তৈরী করিয়ে দিয়ে যাবেন তাতেই জামা থাকবে। বাড়ীতো তৈরী হচ্ছে। কংক্রিটের সাথে বাক্সটা জাম্প করে দিলে ভাল হবে।

ভোলানাথ — মুরলি! তুই একটা প্রণামী বাক্স লেদে অর্ডার দিয়ে আসবি। তবে চাবিকাঠি কিন্তু কালুভাই তোমার হাতেই, হাসতে হাসাতে কালু বরং — তাতে রাজী আছি। কাজ ছাড়ে মিস্ত্রীরা দুপুরে। মিস্ত্রী ও কামিনরা খাওয়া দাওয়া করতে বাড়ী যায়। মুরব্বীরাও বাড়ী যায়। কালুও রান্না চাপায়। রান্না হয়। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম দেয়, রবি ও কালু। আজও ভিক্ষায় যাওয়া হয় না, পূজোতে ব্যস্ত থাকায়। আগামী কাল যাবে। মিস্ত্রীরা আসে। যাওয়ার সময় মুরব্বিরা বলে গিয়েছে মাঝে কাজটা দেখতে। রবিকেও বলে গেছে দেখতে। ওরা কাজ শুরু করেছে। কালুও বেঞ্চে গিয়ে বসে, রবিও যায়। একটা পৈঠা গাঁথা হয়েছে। কিছু ছাড় দিয়ে দ্বিতীয় পৈঠার কাজ হচ্ছে। ওরা গল্পে গল্পে কাজ আগাতে থাকে। হীরুমিস্ত্রী বলে — "উদ্বোধনটা ভালই করলে বাবাজী।"

রবি — কাজটা দারুণ হয়েছে। ভোলানাথ, গোপাল, রামচরণ খুড়ো, কালী পিসির দায়িত্বও আরও বেড়ে গেল।

হীরুমিস্ত্রী — ভালই হয়েছে। এভাবেই তো কাজের মধ্যে সকলকে জড়িয়ে দেওয়াই ভাল। ওদের সম্মানও দেখান হোল। সত্যিকারের জিনিষটা দারুণ হয়েছে।

ছবি বলে একটা কামিন — ওদিকে দিয়ে প্রথম পাথর বসাতে তো পয়সা কড়ি লাগেনি। তাতে তো ভালই হয়েছে। বড়দের সম্মানও জানান হোল কাজের কাজও হল।

হীরু — বুদ্ধি আছে বল, বাবাজীর?

ছবি — তা কেনে? ওকি আর অত ভেবে কাজটা করেছে। এমনিই দেখেছে, বড়দের সম্মান জানানো ভাল। আর ওরাই তো সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

রবি — দেখ ছবি! তাহলে, লেখাপড়া আর মুখ্যুর মধ্যে ফারাক থাকতো না।

হীরু — সেটি ঠিক! তা বাবাজী কতদূর লেখাপড়া করেছ।

রবি — কলেজে পড়েছে।

ছবি — তাহলেতো, অনেক পড়েছে। তাই এত বুদ্ধি। বুদ্ধি মানে ভাল বুদ্ধি। বাপরে বাপ কলেজের ছেলেরা যখন বাসে কলেজ যায়, তখন কি খিস্তী করে যা আমরা মুখ্যুরা মুখে আনতে পারি না। কানে আঙুল দিতে হয়। তাদের সব কুবিদ্যে। তাইত দেখছি, লেখাপড়া শিখছে, চাকীর পাচ্ছে। বিয়ে করছে। আর বাপ মাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এমন বিদ্যে যে বাপমাকে ভাত দিতে পর্য্যন্ত চায় না। লেখাপড়ার মুখে ঝাঁটা।

হীরু — একটা কথা বলেছিস্ বটে। এই সেদিন দেখে এলুম খাওড়ার পাশের গাঁয়ে কাজে গিয়ে। পাশের বাড়ীর একটা বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছে ছেলে ছেলে করে। ছেলে আমেরিকায় বৌ বেটা নিয়ে দিব্যি আছে। যদি না ভাসুরের ছেলেরা থাকতো,

তা না হলে এতদিন শ্মশানে দুব্যো গজিয়ে যেত। ছেলে পালাতেই বছর খানের মধ্যে বাবা মারা গেছে।

রবি — তোমাদের বাবাজী, সেরকম লেখাপড়া শেখেনি, ও সকলের কথা ভাবে। যেমন — আমার কথা, যেমন পাড়াপড়শীর কথা — বাগ্দি পাড়ার — আর মুচি পাড়ার ঝগড়াগুলো এককথায় মিটে গেল। দেখলে তো, পূজোয় চাল পর্য্যন্ত নেবে না বলছে।

ছবি ছাড়া গাঁয়ে অন্য কামিন আশা বলে — কৈ তোমার কথাটা তো বললে না,

হীরু — কি কথা?

ছবি, আশা অন্য কামিন তা হাঁসাতে হাঁসাতে — রবি পাঁঠা থেকে রবি দা।

এবার কালু — মুখ খোলে — দেখ হাসির ছলে লোককে খারাপ ভেবোনা। এটাও খারাপ, লোকের মনে ব্যাথা দিয়ে কি লাভ?

ছবি — না, না বাবাজী, তুমি রাগ করো না। অনেকদিনের অভ্যাস, ওকে দেখলেই খেপাতে ইচ্ছে করে। আর কখনও বলবো না।

হীরু — তিনটে ধাপ হওয়াতে মন্দিরটা আরও খোলতাই হবে। ধাপগুলো কমকরে — এক ফুটের উপর রাখতে হবে। তবে মানানসই হবে। দেখো বাবাজী মন্দিরটা সুন্দর দেখতে হবে। সব কিছু জুটে যাচ্ছে, আমিন ভাইকেও পেয়ে গেলুম। মুর্শিদাবাদের মিস্ত্রীরা ডেকোরেশনের দিক থেকে একটু এগিয়ে।

কালু — দেখো হীরুদা ভাল হলেও মায়ের, খারাপ হলেও মায়ের ইচ্ছে। তবে মায়ের ইচ্ছেটা ভালই দেখছি। ভোলানাথেরা সব ফিরে আসে, একটু বেলা গড়িয়ে যেতেই। ততক্ষণে দ্বিতীয় পৈঠা সারা হয়ে গেছে। আজকেই পাথর ভাঙ্গতে হবে পিলার ও ছাদের জন্য। পিলারের জন্য দুই একদিনের মধ্যেই লাগবে। শশা রতন, মনাকে জানিয়ে দেবে আজই পাথর ভাঙ্গবার জন্য। ওরাও অর্থাৎ রামাচরণ খুড়ো বংশীরা ভালোভাবে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে এসে গেছে ঢালাইয়ের দিন। পাক্কা দশদিন পর। আজ ঢালাই এর দিন। আর কিছুক্ষণ পরে ঢালাই শুরু হবে। এখানেই চা তৈরী হচ্ছে। এটার দায়িত্বে বংশী আর মুরালী হেল্পার — রবি। ঢালাই শুরু হয় মাকালীর জয়ধ্বনিতে। শশাই জয়ধ্বনি শুরু করে। 'মা কালী কি জয়' জয়ধ্বনিতে ভোরে যায় মন্দির প্রাঙ্গন। উপচে পড়ে বনানী ও নদী অপর তীরও। মায়ের কাজ, কাজে ফাঁকি নেই। মিকচার মেসিন লাগবে বলেছিল। শশা ও রতন বলছে ওসব কিছুই লাগবে না, দুবারে না হলে চারবারে মাখাব। বেকার বেশী খরচ করে দরকার নেই। শশা ও রতন একটা যুক্তি করে। পরে শশা জানায়, চালতো মায়ের মন্দিরে রয়েইছে, শুধু কিছু ডাল, এই তো মাত্র জনা ষাট লোক আছি। চালে ডালে শলি খানেক হলেই ভেসে যাবে।

মুরালি বলে — কাজটা মন্দ নয়। ও ভোলানাথ দা শশা কি বলছে শুনছো।

ভোলানাথ — আমি ও শালাকে আবার চিনি না। দেখছিলুম ওরা কি বলে? কিগো রামচরণ খুড়ো চাল, ডাল কিছু চাপিয়ে দিই। দুকড়াই হলেই হয়ে যাবে। আজকের দিনে কিছু না হলে ভাল দেখায় না।

শশা — আমিতো জানি। কিছু না হলে আবার ঢালাই হয়।

মুরালি বলে — বংশী চল তবে, কড়াই খুন্তি, ডাল এসবের ব্যবস্থা করিলো। সত্যিই খাইয়ে না খাওয়ানো ভাল দেখায় না।

রামচরণ খুড়ো — শশা দুজনকে পাঠিয়ে দেয়, কড়াই, গামলা সব আনবে। তার সাথে রান্নার জন্য হরাকে ডেকে আনবি। একদা ফর্দ করিয়ে মশলাগুলো বাঁটিয়ে আনবি কারও ঘরে।

শশা — আমাদের গাঁয়ে বেশী পুকুরও নেই, কাছে পিঠে বাজারও নেই।

ভোলানাথ — শশাকে বাগানো মুস্কিল। এক কাজ করবি, আমাদের পুকুরে কেজি ছয়, সাত মাছ ধরিয়ে আনবি।

গোপালের মেজকাকা — কিগো বড়দাদা। শ দুই মিষ্টি না হলে ভাল দেখায় না।

গোপালের বাবা — তাহলে বলে দে, ময়রার দোকানে শ দুই মিষ্টি করতে বলবি। বলবি, বেলা তিনটার মধে চাই। এখনও ছানা সব বাজারে যাইনি।

রামচরণ খুড়ো — ওর চেয়ে বলে দাও, ছানা ওয়ালাদের, রাইপুর থেকে ফেরার পথে এনে দেবে।

গোপালের মেজকাকা — সেই ভাল।

শশা — দারুণ! খিচুড়ি। মাছের ঝাল আর মিষ্টি। "কালী মায়ীকি জিন্দাবাদ"।

সকলেই জিন্দাবাদ জানায়। হাসির ফোয়ারা ছুটছে কুলি কামিনদের মধ্যে।

রতন — মা কালী সব জুটিয়ে দিচ্ছে।

শশা — দেখছিস্। মা কালী কখনও সন্তানদিকে পেটে মেরে কাজ করাতে পারে। মাকালীর পাপ হবে না।

সকলেই আবারো হাসতে থাকে।

ঘণ্টা দুই পর মুড়ি তেলেভাজা এলো। মুড়ির সদ ব্যবহারও হল মহানন্দে। খুন্তি হাতে সেই সময় হরনাথের প্রবেশ। পিছনে কড়াই, গামলা আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র আসছে। দু তিন জনকে হরা ডেকে নেয় যারা রান্নার কাজে একটু পটু আছে। বংশী, ভোলানাথ ও কিংকর। গোপালের বাঁবা, কাকা ও অন্যান্যদের হাতে মুড়ি ও তেলেভাজার ঠোঙা।

বংশী বলে — আজ ঢালাই শেষে, খিচুড়ি খেয়ে তবে ছুটি। কাপড় গামছা বাড়ী থেকে এনে দুবো। তোমরা সব না থাকলে চলো।

ভোলানাথ — তা, জানিস্ এরকম করে কোনদিন কোন কাজ আমার বাড়ীতে অমি করিনি, আর গাঁয়েতেও হতে দেখিনি।

রামচরণ খুড়া — আমার চার কুড়ি পার হলো, আমিই দেখিনি আর তোমরা। আশ্চর্য্য লাগছে, কোথায় থেকে কি হচ্ছে, ভাবা যাচ্ছে না। খিচুড়ি হচ্ছিল না, খিচুড়ি হোল আবার মাছ, মিষ্টিও হোল, আবার কি আছে কে জানে?

শশা — দাদু বলা খুব মুস্কিল। কখন কি হয়। ঠিক সেই সময় কালী পিসি, ভোলানাথের মা, গোপালের ঠাকুমা, রামচরণ খুড়ার স্ত্রী আরও জন দুই হাজির।

শশা — ও বাবা, কখন কি হয় মানে, হয়ে গেছে, আর কেউ রুখতে পারবে না।

ভোলানাথ — কিরে কি, রুখতে পারবে না।

শশা — তুমি দেখই না, কি হয়? কালী পিসি তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কালী — কেনে, বাড়ীতেই ছিলুম। চান করার সময় মনে হোল কি হচ্ছে একবার দেখে আসি। জানিস সব সময় মনটা পড়ে থাকে, এখানে কি হচ্ছে?

শশা — তা তো হবেই। কার মন্দির হচ্ছে একটা তো কালীর? সকলকে সাক্ষী মানায়। সকলেই এক বাক্যে জানায় — কালীর মন্দিরই তো।

শশা — তবেই দেখ সবাই এক বাক্যে বলছে। কালীর মন্দির, তোমার নাম কি বল? — কালী তো? তোমার মন্দির হচ্ছে আর তুমি ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সেটি হবে না। আর আমাদের — মার মাছ মিষ্টি পর্যন্ত হয়ে গেছে। বাকি বন্দেতে এসে ঠেকেছে। বন্দে নিয়ে এখানের সকলের চিন্তার শেষ নেই। তুমি বন্দের কি করছ বল? সকলেই ওদের কথাবার্ত্তা শুনছে, হাসছে সকলে। কালী পিসি মুস্কিলে পড়েছে। একবার চারদিকে তাকায়।

এবার রতন ও মনা বলে — শশা — মনে হচ্ছে হোল না?

শশা — কি বলছিস রে, হবে নাই মানে। দেখলি না জিনিস কাউন্ট করছে কতগুলো হেড, এই বললো বলে ককেজি লাগবে।

রতন — শশা ভাই — আমি বাজী ধরে বলতে পারি তোর কাউন্ট করাই হোল।

শশা — তাহলে, তোমার প্রেসটিজ পানচার হয়ে যাবে দেখছি। তোর সাথে বাজী রাখছি, এতেই প্রেস্টিজ পানচার। কোথাও কোনদিন ফেলিওর হই না। মা কালী , এ যাত্রা মুখ রেখো। সকলেই মজা উপভোগ করছে। মুরালী বলছে, একশ জনের কম হবে না। কত আর লাগবেস হারা ময়রাকে বললে এক্ষুনি তৈরী করে দেবে। মুরালী আবার বলে — শশা বন্দে বন্দে করে কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঢালাই এর কাজ। বন্ধ করা ঠিক হবে না।

কিঙ্কর খুড়ো — কেজি পাঁচ লাগবে মনে হচ্ছে।

শশা — খুড়ো ঠিক করতে পারছে না — পাঁচ কেজি না দশ কেজি। মুখের কথায় পিসি আমায় ষাট হাজার টাকার জমি দিয়ে দিলো। আর রতনদা বলছে হবে না। বাজী ধরবে রতন দা?

রামচরণ খুড়ো — ওমা কালী কি বলছিস্, কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে।

শশা — কোন কালীকে বলছো। আসল কালীকে বললে এতক্ষণ কালী এক বড় গামলা বন্দে দুম করে আকাশ থেকে ফেলে দিত। কালী পিসির কাছে চাওয়াটাই ভুল হয়েছে। আসল মা কালীর কাছে চাই।

কালী পিসি বুঝেছে না দিয়ে উপায় নেই। তারপর জমির কথা তুলে সুড়সুড়ি দিয়েছে। আর না বলে থাকতে পারে না মুরালি ভাই, হারা ময়রার কাছে কেজি সাত বলে করিয়ে নিবি।

শশা — বন্দে মাতরম্। কালী পিসি কি? জয়! কালী পিসি কি, জয়! বন্দে......মাতরম্-কালী পিসি কি জয়।

মনের অন্তর স্থল থেকে উঠে আসা জয়ধ্বনিতে ভরে যায় আকাশ বাতাস। সকলের মুখে চোখে হাসির জোয়ার।

গোপালের ঠাকুমা — মায়ের কি ইচ্ছা মাই জানে। কোন কিছুতেই আটকাচ্ছে না। সবই জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। আজ হলেই তো আসল মন্দির হয়ে গেল।

ভোলানাথের মা — মা আমার জেগেছে। দেখ! কোনদিন গাঁয়ে এরকম জিনিস দেখিনি। আমার সারাক্ষণ মন্দিরটার কথাই ভাসছে।

হাসতে হাসতে শশা — আমি ঠাকুমা — রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখি। গতকাল মা কালী বলছে, কাল ভাল করে কাজ করবি, আমি তোদের খিচুড়ি, মাছ, মিষ্টি, বন্দেও খাওয়াব। ফাঁকি দিসনি। দিলে বুঝবি ঠেলা। এই মিস্ত্রীরা, কুলি কামিনেরা কথাটা যেন মনে থাকে।

রামচরণ খুড়োর স্ত্রী — বলে — গাঁয়ে কাঁটা দিচ্ছে।

উপস্থিত সকলেই যেন শিহরিত হয়।

সত্যিই কিনা জানি না, শশা আবার বলে — স্বপ্ন দেখার পর, আমি ঘুমুতেই পারি নি। মনে হয়, এই কোদাল, বেলচা নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ি।

মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে দেখলো, নানা কথা বললো, নানা কথা শুনলো শেষে জানালো আজকে তাদের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। হবে কি হবে না সংশয় ছিল। আজ সংশয় পেরিয়ে, পৌঁছে যাচ্ছে গোটা গ্রাম তাদের স্বপ্ন সৌধে। এটা কি কম আনন্দের কথা। ওরা মেয়েরা এবার স্নান সেরে বাড়ী ফিরবে। ভোলানাথের মা জানায় মাছ বেছে কেটে পাঠাবে। কালী পিসি জানায় হারাকে অর্ডার দিয়ে যাবে ফেরার পথে।

এবার মুরালি ও বংশী সমস্বরে জানায় -— পিসি পুরোপুরি অর্ডার দিও।

শশা —পাতলা, পুরুর কি বুঝলুম না, হেঁয়ালি ছাড়া কথা বলতে পারো না।

বংশী — পিসি যা বোঝার বুঝেছে।

শশা — কিগো পিসি কি বুঝেছো,পাতলা, পুরুর কি ব্যাপার।

ভোলানাথেরা ও কামিনগুলা হেঁসে পড়ে যাবার উপক্রম। সকলের হাসি ধরে না। এবার কালী পিসি — মুখপোড়া তোরা চুপ কর, যা বোঝার বুঝেছি, ঠিক আছে।

মুরালি — শশাতো?

কালী পিসি — তাই হবে যা।

শশা হাসতে বলে — এবার বুঝেছি, দশকেজি বন্দের অর্ডার। ঠিক বলছি তো?

শশা আবার ধ্বনি দেয় — বন্দে মাতরম্! কালী পিসিকি — জিন্দাবাদ! কালী পিসিকি জিন্দাবাদ।

কালী পিসি এবার হাসতে হাসতে বলে, এখানে থাকলে বিপদ ঘটবে চল আমরা বাড়ী যাই। ওরা চলতে থাকে। কালু এসে জানায় ঠাকুমা বিকেলে সকলে আসবেন, ভোজন দর্শন করে যাবেন। আপনারা এলে এরা সকলেই ভরসা পায় ও আনন্দ পায়।

রতন — বাবাজী লাখ কথার এক কথা বলেছো।

শশা — এতো লেখাপড়া জানা ছাড়া বলবে না। তুমি আমি বলবো। পিসিমা তোমরা সকলেই আসবে। তার সাথে একটু সেবাও করতে হবে।

কালু হাসতে হাসতে বলে — শশাদা! এই তো তুমি দারুণ কথা বলেছো। তুমি

বলছো কথা বলতে জানি না।

হাসতে হাসতে শশা — দারুণ! দারুণ!

শশার এই দারুণ, দারুণ মুদ্রা দোষে, সকলেই দারুণ হাসি হাসে। ওরাও জানিয়ে যায় আসবে, দরকার হলে ওরা মেয়েরা পরিবেশন করবে।

· ঢালাই চলছে পূর্ণ উদ্দ্যমে। তিনটে বেজে যাবে। মন্দিরের চুড়োটাই বেশী সময় লাগছে। সবাই তদারকি করছে। আটটা পাথর, চারটা বালি আর দুটো সিমেণ্ট। এটা হিসেব রাখছে, অমল বলে, হিসেবি ছেলে। মশলা মাখা হচ্ছে সুন্দর ভাবে। হাসিমুখে, কাজ এগিয়ে চলে। বুড়োরা ও আধবুড়োরা স্নান করতে যাননি, খেতেও যায়নি। এখানেই খাবে। তদারকি করছে রান্নারও। এ কয়দিনে যা জমা হয়েছ তাতেই চলে যাবে। শুধু ডাল আর তরকারী। যা এসে যাচ্ছে যথা সময়ে। পাঁচশ বিড়ি শেষ হয়ে গেছে। আরও পাঁচশ আনার হুকুম দেয়। সাথে তেল। কামিনরা জানায় সাবান লাগাবে। পুরুষ কুলিরা বলেছে তোদেরও লাগবে সাবান, সাথে আসে মহিলাদের তামাক ও গুটকা। আনন্দে মন্দির প্রাঙ্গন ভরে যাচ্ছে কথা বার্তায়। প্রায় শেষের মুখে, বেশ কিছু সিমেণ্ট মসলা বাড়বে। কালু ভোলানাথকে কি বলে। শেষ হয় ঢালাই। শশা আবার জয়ধ্বনি দেয়। সকলের মন ভরে আনন্দে কানায় কানায়। বিড়ি খায় বিশ্রাম করে। ভোলানাথ সকলকে বলে, সকলে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আবার রড্ কাটা হোল, বাইন্ডিং হোল, ঢালা হোল গোটা আষ্টেক স্লাব যা দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেঞ্চ তৈরী করা হবে। সকলেই বুঝতে পারে, এটা একটা বেড়াবার স্থান হিসেবে গুরুত্ব পেতে চলেছে। ওদের সকলের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ভোলানাথ তো গামছা পেতেই শুয়ে পড়লো। রামচরণ খুড়ো, কিংকর খুড়োরা একটু দূরে গিয়ে দেখতে থাকে মন্দিরটাকে। হীরু মিস্ত্রী গোটা গয়েক ত্রিপল জোগাড় করে রাখতে বলেছে। যদি বৃষ্টি হয়, এও বলেছে আর ঘণ্টা চার কেটে যায় তাহলে আর লাগবে না। মুরালি জানায় এখান থেকে গিয়ে জোগাড় করে রাখবে মেঘ দেখে। আজই হিসেব নিয়ে বসতে হবে। দেখতে হবে, মোজাইক না মার্বেল। অমলকে কাছে ডাকে খাতা পেন্সিল নিয়ে, বসে, মাতব্বরেরা সকলকে। মোটামুটি ডে হিসেবগুলো জানাই আছে। চাঁদা আদায় ও ব্যয় হিসেব চলে। ব্যায় বাদ যাচ্ছে মিস্ত্রীর হিসেব মতো। শুধু ভোলানাথ দেবে সিমেণ্ট ও রডের দাম। এরপর মুর্শিদাবাদের মিস্ত্রীকে বলতে বলে মার্বেলে কত খরচ হবে। মিস্ত্রীরা একবার ফিতে নিয়ে মাপজোপ করে। ওরা খরচটা জানিয়ে দেয় হিসেব করে। অমলও জানায়, আর মাত্র দশ হাজার টাকা হলে হয়ে যাবে মার্বেল। সকলেই চিন্তায় পড়েছে। এমন সময় নিতাই খুড়ো বলে, তার নাতি সেনাদলে ট্রেনিং পেয়েছে, কাজ হলে ওর একমাসের বেতন ছয় হাজার টাকা দেবে। অবশ্য টাকাটা দু একমাস দিয়ে রাখলে ভালো হয়, না হলে চেষ্টা করতে হবে। সকলেই অনুরোধ করে একটু কষ্টই করো মায়ের জন্য মা তোমার মুখ তুলে চেয়েছে। রামচরণ খুড়ো বলে তাহলে, তাকেও দিতে হয়। মাকালীকে সেদিন মানসিক করেছিল, নাতির সেনাদলে চাকরীর জন্য। রামচরণ ও নিতাই এর দুই নাতিই ট্রেনিংয়ে যাবে। আর দিন দশ পর। ওদের দুঃখ ওরা দেখতে পাবে না পূজো। সকলেই জানায় পরের বছর দেখবে। একজন জানতে চায় নিতাই খুড়ো — সেও মানত করেছিল কিনা? নিতাই খুড়ো ও হ্যাঁ সেও দিন কয়েক আগে মানত করেছিল

স্বীকার করে। ভোলানাথ অনুরোধ করে — রামচরণ খুড়োকেও তাহলে ছয় দিতে হচ্ছে। হাঁসিমুখে মেনে ফের দুই খুড়ো আবার জানায় মায়ের ইচ্ছেতেই সবকিছু হচ্ছে। রতন শশাকে জানায় মাত্র বন্দের জন্য জিন্দাবাদ জানালি, এতো টাকা, ছাদের জন্য কিছু না!

শশা এবার জোরে শ্লোগান দেয় — " ভোলানাথদা কি জিন্দাবাদ, সকলে জিন্দাবাদ জানায়। তিনবার করে? কালী পিসি কি জিন্দাবাদ, রামচরণ দাদুকি জিন্দাবাদ, নিতাই দাদুকি জিন্দাবাদ — মুরালি খুড়ো জিন্দাবাদ, বংশী খুড়ো জিন্দাবাদ, গোপাল ভাই জিন্দাবাদ, সুবল খুড়ো, বলাই খুড়ো, কমল খুড়ো জিন্দাবাদ......।

কালু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। সবশেষে যখন চুপচাপ। তখন কালু শ্লোগান দেয়। " "গোটা গ্রাম কি" জিন্দাবাদ কয়েক বার শ্লোগান দেয়। সকলেই চুপ শ্লোগান শেষে। এবার রামচরণ খুড়ো জানায় বিরাট অপরাধ করে ফেলেছি মা কালীর চরণে। তোমরা বলতো কি? অশীতিপর বৃদ্ধ গলায় যতটা জোর আছে এনে বলে — "কালু ভাই" জিন্দেবাদ। এবার সকলে আরো জোরে জিন্দাবাদ, মায় সকল কামিনেরা। সকলের নজর কালুর দিকে। সকলেই একবাক্যে জানায় কালু সব সময় আমাদের উপরে টেক্কা দিচ্ছে। আমরা পারছি না ওর সাথে।

কালু জানায় আমাকে লজ্জা দেবেন না ওকথা বলে। আমি আপনাদেরই তো একজন। আরও বলে, কম্পিটিশন ভাল, অনেক কমায়। অনেক কম্পিটিশন পরশ্রীকাতরতার আবার বীজ বপন করে। এতে শুভর চেয়ে অশুভই হয়। মঙ্গল হয় না।

এমন সময় নজর পড়ে হারা ময়রাকে গামলা মাথায়।

শশা এবার বলে — "বন্দেমাতরম জিন্দাবাদ।"

কুলি কামিন সকলেই — "জিন্দাবাদ জানায়।

ভোলানাথ বলে কাজের কথায় আসা যাক্। কালই কিংবা পরশু মিস্ত্রীকে নিয়ে ঝাড়গ্রাম যেতে হবে। মুরালী, বংশী আজকে চাকুরে বাবুদের টাকাটা আদায় করতে হবে, বেতন পেয়েছে মনে হচ্ছে। এই তো ইংরেজী মাসের পাঁচ তারিখ। তেল সাবান একটা ছেলে দিয়ে যায়। স্নানে যাবার সময় কথা হোল বাড়ী থেকে জামাকাপড় ছেড়ে সাড়ে চারটের মধ্যে সত্যি সকলে হাজির হবে। কংশাবতীর জলকে দুফাঁক করে ওরা স্নান করে। কলরবে নদীগর্ভ ভরে যায়। মেয়েরা স্যাঁতার কাটে, ছেলেরাও......। অনেকদিন এভাবে স্যাঁতার কাটেনি তারা। সকলেই যেন শৈশবে ফিরে গেছে। মেয়ে পুরুষ ভেদাভেদ নেই যেন। মাতব্বরেরাও স্নান সেরে বাড়ী ফেরে। সাড়ে চারটার আগেই সকলেই হাজির সাথে দুএকটা করে বাচ্ছা এনেছে। মিষ্টিও এসে গেছে। এসে গেছে মহিলার দল, যারা পরিবেশ করবে। এসেছে গোপালের ঠাকুরমা সহ প্রায় সকলেই বাদ গোপালেই বৌ, সে বাড়ী আগলাচ্ছে, এসছে ভোলানাথের মা সহ বড় মেজো বৌ, কালী পিসি ? মুরালি ও বংশী বাড়ী থেকেও এলো মা ও তাদের সকল বৌ। আরও এসেছে অতি উৎসাহী বৌ ও শ্বাশুড়ীরা প্রায় জনা কুড়ি হবে। সকলেই প্রায় পরিবেশনের জিনিষ পত্র এনেছে। সকলেই প্রথমে প্রণাম করে মা কালীকে — পরে অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে মন্দিরটাকে, সত্যিই দারুণ হয়েছে। একজন বৌ মানুষ হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলে — "গাঁয়েতে এরকম মন্দির হতে পারে ধারণাই ছিল না"।

ভোলানাথের মা — নাত বৌ দারুণ কথা বল্লেছে"

কালী পিসি — মার্বেল বসলে, রং হলে একটা সত্যিকারের দারুণ জিনিষ হবে। এতল্লাটে এরকম একটাও মন্দির নেই। সকলেই মেনে নেয় কথাটা।

কালী পিসি আবার জানায় — আট চালার ছাদে চার কোণে চারটা রথের মতো চুড়ো হবে। আর ছোকরারা বলছিল, এশিয়ার পেণ্ট লাগবে। দেখতে বড্ড সুন্দর হবে।

একটি বৌ — পিসিমা বলে, এশিয়ার নয়, এশিয়ান পেণ্ট।

কালী পিসি — আমরা কি আর জানি মা অতশত। না আমার বাপ ঠাকুরদাই জানতো। মন্দির ও মন্দিরে মার্বেল আমাদের কাছে স্বপ্ন। বৃন্দাবনে যা দেখেছি মার্বেল পাথরের মন্দির। এইয়ে নাতবৌ। তুমি বেশ লেখাপড়া জানো। তা কেমন হবে বলোতো!

নাতবৌ হাসতে হাসতে বলে — ঠিক আপনার মতো। আপনার এই বয়সেই যা দেখছি গড়ন। কাঁচা বয়সে কি ছিলেন আপনিই আর দাদু জানতেন। রং করলে আপনার সেই কাঁচা বয়সের মতো হবে।

কালী পিসি হেসে বলে — ছুঁড়ির কথা দেখ। অন্য সকলে বলে; নাতবৌ একটা কথার মতো কথা বলেছে। ভোলানাথের বৌমা বলে — নাতবৌ লেখাপড়া জানা মেয়ে, কি সুন্দর কথা বললো। সত্যি নাতবৌ, কালী ঠাকুমা কাঁচা বয়সে দেখবার মতো ছিল।

নাতবৌ — তাহলে বলুন ঠাকুমা — আমি ঠিক বলিনি?

ভোলানাথের মা -- ঠিক আবার বলছি গোপালের ঠাকুমাকেও জিজ্ঞেস কর, তোমার কালী ঠাকুমা কিরকম ছিল।

হাসির ঝলক বয়ে যায়। সকলেই প্রায় হাজির, একসাথে সকলকেই বসতে হবে।

ভোলানাথের বৌ — ভোলানাথের ঠাকুমা ও শ্বাশুড়ীকে বলে আগে বসতে বলুন। তারপর হেড গুণে খেতে দিতে হবে।

গোপালের ঠাকরমা — কেন বলতো বৌমা?

ভোলানাথের বৌ — দেড়শোর উপর হলে, মাছ ভাজতে হবে। পিস আছে প্রায় একশ আশিটা নব্বুইটা। ভাগ্যিস ছ কেজি না ধরে বারো কেজির উপর ধরানো হয়েছিল। মিষ্টি কুলিয়ে যাবে।

সকলে বসে পড়ে, মাতব্বরেরা বাদ দিয়ে। ভোলানাথের মা সেই নাত বৌকে গুণতে বলে। নাতবৌ গুণতে থাকে। সকলেই অবাক চোখে দেখতে নাতবৌ এর গোণা। নাতবৌ দেখতে ভাল। হাসতে হাসতে গুণছে। সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। নাতবৌ এর পায়ে নুপুর। নুপুরের শব্দে হেঁটে যায় এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চারটে লাইন। গোণা শেষ। জানায় একশ পঁয়ত্রিশ। ভোলানাথের বৌ বলে একপিস হবে, ধরা ছিল দুপিস। তাহোক, ভালই হয়েছে। পাত পড়ছে, গাঁয়েরই তৈরী বড় বড় কাঁচা শালপাতা। একটাতেই এককেজি ভাত ধরবে। বুড়িরা দাঁড়িয়ে আছে, বাকি অন্য সকল জনা বারো বৌ, নাতবৌ পরিবেশন করছে। গোপালের ঠাকুমার হুকুমে মোড়লেরা ও রাঁধুনীরাও বসে। কালু ও রবি বসেছে। রতন একসময় জানায় খেতে শুরু হবে, সকলের পাতে খিচুড়ী পড়লো। তরকারী হবার কথা ছিল না। কপির তরকারীও হয়েছে। এখনতো কপি খুব সস্তা, কিনতেও হয়নি, এর

তার মাঠে গিয়ে নিয়ে এসেছে। কালু উঠে দাঁড়ায় — দাঁড়িয়ে বলে — আপনারা একটু অপেক্ষা করুন মিনিট কুড়ি।

সকলেই বলে কেন?

কালু — মাকে একটু ভোগ দিই। মাকে দিয়ে খেতে দোষ কি?

গোপালের ঠাকুমা গায়ে হাত দিয়ে বলে, সত্যি আমার কালাচাঁদ দেবতা বটে। কারও মাথায় আসেনি।

রামচরণ খুড়ো — এবারের ও আমাদের হারিয়ে দিল। একটা পুচকে ছেলের কাছে বার বার হেরে যাচ্ছি।

সকলেই তারিফ করে। মেয়েরা সব কিছু ছেড়ে ? ভোগ নিয়ে যায়। তরকারী মিষ্টি নিয়ে যায়। মাছ দিতে নিষেধ করে মেয়েরা।

কিন্তু কালু জানায় কিছু দোষ হবে না বরং মা খুশীই হবেন। বলুন তো মাকে কিংবা ছেলেদের না দিয়ে কোন কিছু খেলে খেয়ে তৃপ্তি হয়। আর ছেলেরা আর বুড়ো বুড়িরা ভালমন্দ জিনিষ পেলে তাদের মহা আনন্দ। এ আনন্দ থেকে মাকে আমরা বঞ্চিত করতে চাইনা। আঁশ হোক। আমাদের পছন্দই মায়ের পছন্দ।

সকলেই মহানন্দে রায় দেয় ঠিক ঠিক। শশা — দারুণ কথা বলেছ ভাই। মাকে খাইয়েই ছেলেদের খেতে হয়। এটা তো আর শহরের শিক্ষিত নয় যে, মাকে বাদ দিয়েই ভালোমন্দ খেতে হবে। পূজো সারা হোল। প্রসাদও সমস্ত খাবারের সাথে মিশিয়ে দেয় মেয়েরা। আটজন খেচুড়ি, চারজন তরকারি আর দুজন সাজিয়ে ভর্তি করে দিচ্ছে। মেয়েরা ভীষণ খুশী, এ ভারটা পাওয়ায়। তারপরে এতো লোক এবং বাড়ীতে নয় অন্য জায়গায়। পাতে খিচুড়ী ও তরকারী দেওয়া শেষ। শশারা এবার কালী মায়ের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলে। "কালী মায়িকী জিন্দাবাদ"। শেষে শুধু "গ্রামের সবাই জিন্দাবাদ"। খিদেটা পেকেছিল। যাদের পাকেনি, পাত সামনে পড়ে থাকায় তাদেরও পেয়ে গিয়েছিল। হাপুশ, হুপুস শব্দ নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হয়। নিস্তবদ্ধতা ভাঙ্গে রামচরণ খুড়ো — হরা ভাই, যা রেঁধেছিল মুখে অনেকদিন লেগে থাকবে।

সকলেই রান্নার তারিফ করে।

শশা বলে — হরার খুব মুরোদ। এমন রাঁধে। মুখ ছেড়ে যাচ্ছে যেন অমৃত।

ভোলানাথ অন্য সকলে শুনতে চায় ব্যাপারটা কি?

ভোলানাথ বলে — হরাই তো রেঁধেছে।

শশা আবার বলে — খুব মুরোদ।

হরা তাকিয়ে থাকে শশার দিকে মুখ করে। সে উদগ্রীব।

শশা বলে — এটা অমৃত হয়েছে, মায়ের প্রসাদ বলে?

রামচরণ খুড়ো — ঠিক বলেছিস্ শশা। সাধারণ কথাগুলো আজকাল কেন যে বুঝতে পারছি না।

শশা তা নয় — আমাদের ভীমরতি বলেই ভুলে যাচ্ছি। মা খুশী হলে সবকিছুই ভাল হয়। আর একবার ধ্বনি দাও। "কালী মায়ীকি জিন্দাবাদ"।

আকাশ বাতাস মুখরিত হয় জয়ধ্বনিতে। যেন একটা ভোজ নয়, মহাভোজ। বুড়িদের চোখে জল। বুড়িরা জানায় মা স্বয়ং অধিষ্ঠান হয়েছে। সকলেই যেন শিহরিত হয়। পরম উৎসাহে মহিলারা পরিবেশন করে যাচ্ছে। হাসি খুশী সকলেই। এক একজন যেন বালতি বালতি টানছে। ওরা নজর দেয় গামলার খিচুড়িতে। ওরা ডুবিয়েই চলেছে, কমার কোন লক্ষণ নেই। এরপর ভোলানাথের স্ত্রী ও গোপালের মা মাছ নিয়ে যায়। ধনারা মাছ খেয়ে বলে — খুড়ো — মাছটা আবার কি হয়েছে দেখ। মাছও কুলিয়ে গেল। এখনও গোটা কতক পিস পড়ে আছে। সকলেই মাছ ছেড়ে মাছের বাটনা চায়। দুটো বৌ বাটনা দিয়ে যাচ্ছে। খাওয়া প্রায় শেষের পথে। আর কেউ খিচুড়ি খাচ্ছে না। মিষ্টি দিচ্ছে রামচরণ খুড়োর বৌ আর মুরালিদের বৌ — এবার বন্দে দেওয়ার পালা, কালী পিসি দিতে রাজী হয় না। গোপালের মেজ ও ছোট কাকী বন্দে ধরেছে। বন্দে পাতে পড়তেই ধ্বনি দেয় একটা কেউ, শশা বা রতন নয়। "বন্দে মাতরম্ জিন্দাবাদ"। নাতবৌটি দুই ধ্বনির মিশ্রণে হেঁসে পড়ে যায়। একবার বন্দে দিয়ে আবার দেখায়। কালী পিসির নির্দেশে শশা, রতন ও মনাকে চারটি বেশী দেয়, এবার শশারা কালী পিসির নামে ধ্বনি তোলে। খেতে খেতে মনে হয় গ্রামের সকলেই এক পরিবারের। এদের মধ্যে কোন কালে ঝগড়াঝাটি ছিল না। সত্যিই সকলে একবার অনুভব করে উৎসবের মাঝে জীবনের উৎস। খাওয়া শেষ। মা কালীর নামে আবার ধ্বনি তোলে সকলেই। সকলের মাঝের এতো প্রাণ, এতো আনন্দ, এতো জীবন আছে যেন তারা নুতন করে সন্ধান পেল।

রামচরণ খুড়ো হাত ধুয়ে বলে — আমরা খেলুম তো, তোমরা খেয়ে নাও। মেয়েরা খেতে চায় না, না না করে।

মুরালি — খুড়ো তুমি চুপকর। ওরা খাবে না মানে। না খাইয়ে ওদের যেতে দিচ্ছে কে?

রান্নার কাছাকাছি জায়গায় ঝাঁট দিয়ে, মুরালি আর বংশী পাতা দেয়— কালী পিসি তোমার দলবল নিয়ে চলে এসো। তোমরা না খেলে, মা কালীর খেয়ে কি তৃপ্তি হবে। চলে এসো দেরী করো না এখানে আলো ব্যবস্থা নেই।

কালী পিসি — নাত বৌ চল, তোমরা ও বৌমা, ও ঠাকুরঝি, ও ভোলার মা, গোপালের মা বলে সবাই এসো।

নাতবৌ সবার আগে বলে — ঠাকুমা, না খেলে, সমস্ত আনন্দটাই মাঠে মারা যাবে। তারপর দাদুরা যে রান্নার সুখ্যাতি করছিল, সেটাই তো যাচাই করা দরকার। যদিও ঠাকুমার কথা মতো হয়নি।

রামচরণ খুড়োর স্ত্রী — তুমি থামবে তো, এত লোকের সামনে, বেশী কথা বলো লোকে বলবে কি?

নাতবৌ — না, না, বলবো না তুমি বসতো।

সকল মহিলারা বসেছে। ওরা খাচ্ছে। ওরাও তারিফ করে রান্নার। এদের ভাগে বেশি বেশি পড়ছে তরকারি, বন্দে, মিষ্টি। মাছ, যা আছে সকলের হবে, দুপিস পড়বে। মুরালি জানায় কালীপিসি তোমাদের দুই নাত বৌকেই দুটো দিচ্ছি রাগ করো না। বরং মিষ্টি

তোমাদের আর একটা করে দিচ্ছি। প্রায় সকলে মাছের বাটা না চায়। বন্দেও ভালমতো ওদের পড়েছে। এখনও বালতি খানেক আছে খেচুড়ি আছে মাছ বাদে অন্য সব আছে। ওদের খাওয়া সারা হলে, চার পাঁচজন কামিন ছিল তাদের ডেকে বলে এগুলো নিয়ে যা। আর কড়াই গামলা কালকে ধুয়ে নিয়ে আসবি আমার ঘরে। আমি পাঠিয়ে দুবো। মেয়েরা তোমরা তোমাদের জিনিষ নিয়ে যাবে। মহিলারা খাওয়ার ভীষণ ভক্ত। পরিবেশনের আনন্দ আর ভোজনের তৃপ্তি মিলিয়ে ওরা ভীষণ খুশী। তারা এক প্রস্থ মায়ের প্রশংসা ও মায়ের জীবিত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত হয়। মুখ আঁধারি হয়ে গেছে। ওরা মাকে প্রণাম করে, আগামী পূজোতে কি হবে, স্বপ্নে জাল বুনতে বুনতে বাড়ি ফেরে। পরদিন যারা যায়নি তারা শোনায় কি কি হোল। কত লোক খেল কে কে গিয়েছিল, কারা কারা খেতে দিল। কেমন রান্না হয়েছিল......। নানান কথা, মার্বেল ও এশিয়ান পেণ্ট......। গাঁয়েতে একটা কালী মন্দির নিয়ে জোয়ার বইছে। মহিলারা জোয়ারকে আরও প্রবল করে তোলে। সকলেই পূজোর দিন গুনতে থাকে। আর মুরব্বিরাও দিন গুণতে যথা সময়ে সব কিছু শেষ করার জন্য। মাটি দেওয়া হয়েছে ঠাকুরে। মার্বেলও এসে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মহিলা, বৃদ্ধ, যুবক, শিশুরা দেখে গেছে কেমন করে মার্বেল বসানো হচ্ছে। ঢালাই এর দিন দশ পর স্যাটারিং খোলা হচ্ছে। কাজ চলছে ছাদের উপরে রথের চূড়ো, এগুলো হলেই, প্লাসটার হবে। পূজোর দিন পাঁচ আগেই মন্দির রেডি হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে মন্দিরের প্লাসটারের কাজ শেষ হয়। অন্যদিকে শ্বেত পাথরের মিস্ত্রীও কাজে লেগে পড়েছে। সকলেই তারিফ করে। নানান ঠাকুরের প্যারিস অফ্ প্ল্যাসটারের সুদৃশ্য পট। ওগুলো সেঁটে দেওয়া হয়েছে; পিলারগুলোতে ও মন্দিরে। তাতে আরো খোলতাই হয়েছে। প্লাসটার শেষে রং মিস্ত্রী এসে, পেণ্ট লাগাচ্ছে। সকলেই খুশী, মন্দির দেখে। সকলেই বলছে এতদিন একটা কাজের কাজ হয়েছে। আর মাতব্বরেরা আরও উৎসাহিত হচ্ছে। একদিন শ্বেত পাথরের কাজ শেষ হয়, দেওয়ালে লেখা হয়েছে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম......ও নানান বাণী ও মন্ত্র। ধ্বজাতে লম্বা শিক দেওয়া হয়েছে, শিকের উপর একটা ত্রিকোণ আকৃতির লোহার পাতের চাদর, রং হয়েছে লাল, চোখ পড়ে বহু দূর থেকে। অবশ্য পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। পূব দিক থেকে দেখা যায় না, বটের আড়ালে চলেছে যেন একখানা রথ। একয়েকদিন কাজের চাপ।

আজ সে ভিক্ষায়, এটা তার দ্বিতীয় দিন পায়ে পায়ে একটু দূরবর্ত্তী পাশের গাঁয়ে, প্রথম দিনের যে গাঁয়ে প্রথম ভিক্ষা করেছিল, সেখানেই গেল। জয় রাধামাধব বলে দাঁড়ায় দুয়ারে। কোথায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়, কোথাও হয় না। কোথাও দিয়ে যায় বুড়িবা, কোথাও বৌরা, কোথাও বা সন্তান দেয় ভিখ, মায়ের কোলে বা সাথে। নানান জনে ভিখ্ দেয় নানান ভাবে। কেউ দেয় শ্রদ্ধায় আবার অনেকে দেয় অশ্রদ্ধায়, গজগজ করতে করতে। সংসারে নানান ঝামেলা, ভাইয়ে ভাইয়ে, বৌয়ে, বৌয়ে, শ্বাশুড়ী বৌয়ে......কত সমস্যা। খারাপ লাগে বিরক্তিতে আবার মনটা ভাল হয়ে যায়, যখন কেউ বলে, একটু দাঁড়াও, আবার অনেকে যখন শুধায় জল টল খাবে কিনা। ভালও লাগে। এইতো গাঁয়ে দ্বিতীয়

দিন। এই দ্বিতীয় দিনে একটা বাড়ীতে একজন প্রৌঢ়া বলেন — জল খাবে কিনা। তার মায়েরই বয়সী। চোখে জল আসে। কি মনে করে হ্যাঁ বলে। একটা ছোট মগ্ভা দিয়ে জল খায়, প্রাণটা জুড়ায়। চোখে জলের আভাষে প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করে আশ্রম কোথায়......বাড়ি ছাড়ার কারণ কি? শুধু জানায় এমনি, অবশেষে জানাতে বাধ্য হয়, — "মা যদি অনেকদিন পর হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে তৃষ্ণায় জল দেয়,সন্তানের চোখে জল আসতে কতক্ষণ। এরপর মহিলা মাতৃত্বের দাবিতে সব কিছু কুরে কুরে বের করে নেয়। মিথ্যা বলতে পারেনা। পরে জানাজানি হয় এই সেই ভিখারী, যার আসার পর পাশের গাঁয়ে ইন্দ্র গেলে আশ্রম হচ্ছে। আরও ভক্তি বেড়ে যায়। সেদিন সে সেখান থেকে কোন মতে বেরিয়ে আসে। মহিলা বারে বারে জানায়, এলে বাড়ী দিয়ে এসো বাবা। এমনি করে দুয়ারে দুয়ারে রাধা মাধব নাম দেয় আর ভিখ নেয়। ভরে ওঠে থলি। বেশ খারাপ লাগে প্রথমে পরে অভ্যস্থ হয়ে যায়। তার নিজের খারাপ লাগে চোখটাকে কিছুতেই সামলাতে পারে না। কি জানি কিসের আকর্ষণে বার বার ধেয়ে যায়। এই যেমন এই বাড়ীটার পাশে বাড়ীতে একটা একটি মাঝ বয়সী. বৌ মুড়ি চাল নাড়ছে, মুখ তার ঘামে জব জব করছে কোমরের উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। হাতার তালে তালে দেহটা দুলছে। একটা ছন্দ বয়ে বয়ে যায় সর্বাঙ্গে; আভায় ও ধোঁয়ার বেষ্টনীতে একটা মায়াজাল সৃষ্টি হয়। শরীরের রং, গড়ন সবকিছুই আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না. যখন "রাধামাধব" শুনে কেউ আসে না ভিখ্ না নিয়ে। ফেরার জন্য ঘুরতেই শোনা যায়, "এই ছুটকি কালা নাকি, একটু হুঁশ করবি, চাল দিয়ে যা"। একটি বৌ বের হয়ে আসে এক কাপ চাল নিয়ে, চাল দিয়ে জানায় কিছু মনে করোনা শুনতে পাইনি। আবার শোনা যায় — "কানে তেল দিবি"। ফিরে আসতে আসতে ছুটকি বলে বড়দি — "তুমি একটু হুঁশ করবে, যতই হোক আর শোনা যায়নি পরের কথাটা। কিন্তু পরের কথাটা কি হতে পারে, এই নিয়ে গবেষণার শেষ নেই মনে মনে। এমনি করে ভিখ্ শেষ। রোদটাও বেড়েছে। সাড়ে এগারো বারো হবে। ফিরছে আবার সেদিনের পথ দিয়ে। সাঁওতাল গাঁটা আসতেই মনে পড়ে যায় সেদিনের কথাগুলো, যাবার সময় মন্দিরের কথা ভাবতে ভাবতে আনমন হয়ে পার হয়ে গিয়েছিল। ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে। তাদের মধ্যে একজন বলে, আজ কোথায় গিয়েছিলে। চল আমাদের ঘরে। আহবানকে উপেক্ষা করা যায় না। বাড়ীতে ঢোকবার আগেই রাধামাধব নাম দেয়। বসতে চৌকি দেয়, কালু বলে, সাঁওতালী ভাষায় কি কথা বললো দরজার মুখ বাড়িয়ে। একটু পর সেদিনের মহিলারা এসে যায়। তারা হাসতে হাসতে বলে, ভাল আছিস। কিন্তু ওরা যখন দলবদ্ধ থাকে তখন আরও সহজ আরও সরল, নির্মল। নির্মল হাসিভরা মুখে — "ভাল আছিস্" শুনে হৃদয় জুড়িয়ে যায়। মনে হয় অনেক দিনের পর রোদে পুড়ে বাড়ি ফিরে এক গ্লাস মাটির কলসের সুশীতল জল পান করছে। তৃষ্ণায় সুশীতল জল পানের যে তৃপ্তি যে জানে সেই জানে। মন ভরে যায়। ওরা ভিখ্ দেয়, চাল আলু বেগুন......। সাথে নির্মল হাসি'। আবার অনুরোধ করে — 'আবার আসবি। এই সময় — বারোটা একটার সময়। সকালে মজুরি পাই, আর এই সময়ে খেতে আসি। সকালে এলে দেখা পাবি না'। সে জানায় আসবে, দেখা করে তবেই যাবে। হাসি মুখে বিদায় দেয়। মন ভরে আছে

এক অদ্ভুদ আমেজে। বনানীর ভিতরে সরু পথে, শালবন, কুটুস, ? নানা রকমের গুল্মের পরশে কেউ যেন হাত ধরে টানে, কিংবা হাতে হাতে আলিঙ্গন করে, কেউ কাপড় ধরে টানে যেন, কেউ কেউ পায়ে জড়িয়ে ধরে বলে একটু বস তোমার সাথে কথা বলি। বেশ ভাল লাগে নানান্ লতা পাতা ও ফুলের পরশ শাল, মহুয়া, পিয়াল, ইউক্যালিপটাস ও পোনা ঝুরি ছায়ায় হাঁটতে, হাঁটতে একটা ফাঁকা জায়গায় পিয়াল গাছের নীচে একটু কাঁকর ভর্তি ফাঁকা জায়গায় আর চারিপাশ শালঝোপ, বেঞ্চি আর কুটুসে ভর্ত্তি একটা বৃত্ত। তালাই দুই ফাঁকা জায়গা। কাছাকাছি মহুয়া, শাল, গাছও আছে। বসতে ইচ্ছে হয়, পিয়াল ছায়ায়, বৃত্তটা যেন লাল হলুদের ছাপানো সবুজ শাড়ী। কুটুস গাছগুলো ছেয়ে আছে হলুদ, লাল ও বেগুনী ফুলে। এরকম জায়গা বনের মধ্যে হাজার হাজার আছে। শীতল ছায়ায়, মৃদু মন্দ বাতাসে, আরও ভাল লাগে। ভাবতে ভাবতে ভাবে কত সুন্দর এরকম জায়গা আছে পৃথিবীতে অথচ, দেখার লোক নেই। যদি দেখার লোক থাকতো এ দৃশ্য দেখার, তাহলে আরও পৃথিবীটা সুন্দর হোত। ভূক্ষয়ে বের হয়ে যাওয়া শিকড়ে বসে বসে দূরে নজর পড়ে, রাণী বাঁধ খাতড়া সমুদ্রের মতো ঢেউ তোলা নীল পাহাড়ের শৈলশিরা। উঠতে মন চায় না। উঠতে হয়। বেষ্টনী ভেদ করে আসার সময় কুটুস গাছগুলো চাইছিল বোধহয় তাদের সাথে একটু সময় কাটাতে, ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে, ওরা কাপড়ে কাঁটা দিয়ে পথ আটকাতে চায়। কাপড় ছাড়ায় কাঁটা থেকে। দুই একটা পাতা ছেঁড়া যায়, একটা অপূর্ব গন্ধ বের হয়, পরে পাতা নিয়ে শুঁকে দেখে, ওটা কুটুস পাতার সুবাস। এরপর কুটুস গাছ দেখলেই পাতার ঘ্রাণ নেয় একটু এক থোকা ফুল নিতে চায় মন, নেয় না কি ভেবে। বোধ করি ভাবে গাছের সৌন্দর্য্য হানি হবার চিন্তায়। ফিরতে দেরীই হয়েছে। রবি চাওয়াচায়ি করছে। ওকে দেখে হাঁফ ছাড়ে। দেরীর কারণ জিজ্ঞেক করে। বলা কি যায় সকলকে সবকিছু? রান্না চাপায়, রবি জ্বাল দেয়। রান্না শেষ হয়। ভাতে ভাত, বেগুন ভাতে ও আলু ভাতে। খিদেতে তাই অপূর্ব লাগে। কানের মাঝে বার বার ভেসে আসে, "একটু হুঁশ করবি"। আর কথাটার প্রত্যুত্তর 'তুমি একটু হুঁশ করবে যতই হোক......'। আবার সাঁওতাল রমণীর? সম্বোধন — "আবার আসবি"। আবার মনে পড়ে যায় প্রৌঢ়ার আবেদন — "জল খাবে বাবা"। শেষে মন ভেসে আসে রাণীবাঁধ খাতড়ায় নীল শৈলশিরা, কুটুসের সুবাস ও সৌন্দর্য্য মনকে আবার অলোড়িত করে। দেখতে দেখতে সূর্য্য ঢলে পড়তে থাকে। কালু বাড়ী ছেড়ে নদী কিনারে, ঢিল ছোঁড়া দূরে তৈরী বেঞ্চের নিকটে বসে। ঢালাইয়ের দিনে গোটা আষ্টেক যে স্লাব ঢালা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা সে এখানে বসিয়েছে। মাত্র হাত দশ দূরে খাড়া পায়, এখানে পাড়ের উচ্চতা প্রায় কম করে হলে দেড় তাল গাছ হবে। বটের একটা সমান্তরাল ডাল শেষ হয়েছে নদীর পাড়ে। আর সেই বটের ডালের নীচেই বেঞ্চি তৈরী হয়েছে। হাত দুই উঁচু পাথর গাঁথা হয়েছে আর তার উপর সিমেন্ট দিয়ে স্লবিটা এঁটে দেওয়া হয়েছে। দেখা যায় পশ্চিমে নদী গর্ভে দহের নীল জল। নদী গর্ভ বেয়ে পশ্চিমে তাকালে চোখে পড়ে নদীর স্রোত ধারা। সাথে চোখে পড়ে ক্ষয়জাত শিলা মহাকালের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য। দুদিকে আরো দূরে ? দেখা যাবে ছোট ছোট নীল টিলার মাঝে রূপালী রূপসী কংসাবতীকে হেলে দুলে আসতে। নদীরেখার

দুপাশে উত্তরে ও দক্ষিণে কোথাও বনানী কোথাও জনপথ আর কোথাও উত্তরে ও দক্ষিণে শৈলশিরা — এখান থেকে প্রায়ই সে বসে বসে সূর্য্যাস্ত দেখে, অপূর্ব লাগে বনানী নীল শৈলশিরাকে আর মেঘের সাদা, নীল, সোনালী পাহাড়, হ্রদ, সাগরে সোনালী বেলায় সব একাকার হয়ে যায় দেখতে। আকাশে মেঘের তুষার ভর্ত্তি পাহাড়, কিংবা তুষার বিহীন নীলচে পাহাড় আর ওদের দেশে হ্রদ বাতাস কিংবা সমুদ্র ওরা পৃথিবীর নীল শৈলশিরা নদী, প্রান্তর, বনানীর সাথে একাকার হয়ে যায়, সোনালী আলোয়। শুধু কি তাই মেঘের পাহাড়, হ্রদ আকার বদলায়, রং বদলায় ঘন ঘন। স্বর্গ মর্ত্ত একাকার হয়ে যায়, মৃদু মন্দ দখিনা বাতাসে নিজেকে মনে হয় কোন এক স্বর্গের বাসিন্দা। বেঞ্চ থেকে সরাসরি উত্তরে সেই কেঁদ, শাল, পিয়াল নানান গুল্মে ভরা ছোট্ট টিলা, পূবে নদীর উচ্চ গতি সম্পন্ন স্রোত ধারা, আর ফাঁকা পুরের নীলাকাশ। সকালের আকাশেও সে মাঝে মাঝে মেঘের নদী পাহাড় বনানী অথবা মেরু চূড়ায় আলোর বর্ণালী দেখে। দুপুরে মধ্য নীল গগন মাঝে নীলকাশ। দুপুরে কখনও কখনও চোখে পড়ে শুভ্র মেঘের তরণী বাওয়া, সাথে শঙ্খ চিল আর গাঙ শালিকের হাজারো পাখির কলরব। নির্জন নদী প্রান্তরে বড্ড ভাল লাগে ঘুঘুর ডাকটা, তার মনে হয় শরতে আরো রূপবতী হবে এই নীলাকাশ। বড্ড ভাল লাগে একা একা এই সোনালী সন্ধ্যায় কিংবা রূপালী চাঁদনী রাতে। চাঁদনী রাতে আরো মোহময়ী হয়ে যায় প্রকৃতি। প্রান্তর, বনানীও এই শ্মশান। আরও বেশী মোহময়ী রূপবতী হয় যখন রবি বাঁশী বাজায়। তখন যেকোন মূহুর্ত্তে অপ্সরা, পরী, দেবকন্যারা জল কেলিতে নামতে পারে বাঁশীর সুরে গোপ বালারা আর রাধিকারা নীল যমুনায় হারিয়ে যেতে পারে। বেঞ্চের জায়গাটা নির্বাচন এতটাই সঠিক হয়েছে যে নিজেকে এক সুদক্ষ শিল্পী মনে হয়। মন্দিরে একবার পূজো হয় স্নান সেরে সকালে ৮টার মধ্যে। রাতে সন্ধ্যা দেবে ভেবেছিল, অনেক কথা ভেবে দেয়না। দিলেই রেওয়াজ হয়ে যাবে। সব সময় নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে চায় না। যদিও নিয়মের মাঝেই সবকিছু চলছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। সেখানে তাই নিয়মের এতটুকু গলতি নেই। তার মনে হয় যারা বিরাট, বিশাল তারাই নিয়মের বন্ধনে বাঁধা, যে সবল সেও নিয়মের বাঁধনে বাঁধা, যে দুর্বল সেই হয়তো অনিয়মের ঘূর্ণাবর্ত্তে অসহায় ছন্নছাড়া। ছন্নছাড়া হয়ে থাকতে ভালই লাগে। শরদ আকাশে শুভ্র মেঘের মতো তরণী বাওয়া মাঠে ঘাটে ফেরা সেটাও কম ভালো লাগে না তার। যেটুকু নিয়মের মাঝে না রাখলে চলে না, সেটাই ভাল। রান্না খাওয়া, সকালে মায়ের পূজা, নিয়মের মধ্যেই পড়ে অনিয়মের মধ্যেই পড়ে এই প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া রূপময় মনজগতে। প্রকৃতি আর পার্থিব জগৎ থেকে মন জগৎ আরো বৈচিত্রময়। সেখানে চেতনে অবচেতন দৃশ্য, কত ঘটনা, কত দৃশ্য যেমন বৈচিত্রময় তেমনি বর্ণময়। নিমেষে যেমন দৃশ্যান্তরে যাওয়া যায় তেমনি নানান রঙে রঙীন করা যায়। সুতরাং মনজগতের জন্য কিছুটা সময় রাখতে হবে। সেটা তার নিজস্ব। এই ভাবা দেখেই রবির কেমন মনে হয়। তাই সে জিজ্ঞেস করে কি এতো ভাব সারাদিন। শুধু হেসে উত্তর দেয় কি আর এমন — এমনি। তাকে বোঝানো যাবে না এ আর অন্য জগৎ, সে জগতের সন্ধান পেলে ভাসতে ভাসতে অনন্ত কাল লেগে যাবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়, এমন একটা জায়গায় ভাবতে ভাবতে নদীতীরে

শ্মশান এসে ঠেকেছে, একটা গতি হবে নিশ্চয়ই। কি হবে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। গাঁয়ে মন্দির ছাড়া কথা নেই, আর উৎসব ছাড়া চিন্তা নাই। প্রাণমন ঢেলে, গোটা গাঁখানা জড়িয়ে গেছে। মার্বেল পাথর বসানো হোল, পালিসও শেষ। রবি ও অন্যান্যরা ধুয়ে মুছে পরিস্কার করেছে। রবি বার বার বলছে ধরণে শুলেই ঘুমিয়ে পড়বে যেকেউ। কথাটা ঠিক, প্রকৃতির ফুরফুরে হাওয়া, আর শ্বেত পাথরের মসৃণ ঠাণ্ডা সহজেই ঘুম পাড়িয়ে দেবে। রবি বলে আট চালায় শুলেই হবে। আবর্জনা, ঝোপঝাড় আর রাতে লতার ভয় থাকবে না। মসৃণ জায়গায় লতার পক্ষে যাওয়া শক্ত। অনেক জায়গার লোকেরা সাপকে লতাই বলে সময়ে অসময়ে। রবি যে কথাগুলো বলে শ্বেত পাথরে শোয়ার ব্যাপারে। গাঁয়ের সকলেই সে কথা বলে। বিকেলে সকালে বেড়াতে আসছে অনেকেই। মুরুব্বিরা ও বৃদ্ধারা সকালে বিকেলে বেড়াতে আসে আর আসে উৎসব ব্যাপারে কথা বলতে। ঠাকুরে রং দেওয়া হয়েছে। আর পূজোর দিন চার বাকি। চাঁদা ফেলানো হয়েছে। কেউ না বলেনি এ পর্য্যন্ত। জেনারেটর আসবে তার সাথে আসবে পিড়রগাড়ী থেকে লাইটের কিছু ডেকোরেশন ও মাইকের বায়না পত্র হয়ে গেছে। হাটবাজার বাকি আছে, বন্দের চিনি, বেসন, জালডা, খিচুড়ির চাল ডাল, তরকারী ইত্যাদি বনের কাঠ তো আছেই। গোটা পাঁচ ঢাক আছে গাঁয়েরই, পাশের গাঁয়ে ব্যাণ্ড পার্টি নিজেরাই বলেছে বিনা পয়সায় বাজিয়ে দিয়ে যাবে। ভিক্ষের সময় পথে পড়া গাঁ ? সেই সাঁওতাল মহিলা বলেছে, তাদের যেন বাদ দেয়া না হয়। এ গাঁয়ের পুরুষরা ও মন্দিরের পূজোর প্রস্তুতিও মজে গেছে। ওরাও বলেছে এদের যেন নিমন্ত্রণ হয়। কালু পূজোর মিটিং এর সময় কথাটা পাড়ে সকলের অনুমতি নিয়ে ভয়ে ভয়ে। প্রথমে প্রায় সকলেই রাজী হয় না। গুঁই গাঁই করে। যেহেতু কালুর প্রস্তাব ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। কালুও জানায় মন্দিরের অংশীদার হতে চায় না আর কালী পূজোর ব্যাপারে মাথা গলাতে চায় না, ওরা চারটি খাবে দুবেলা আর আনন্দ করবে। চাঁদাও দেবে কিছু, কালীপূজোতে। সেটার পরিমাণও কম হবে না। কালু আরও বলে — উৎসব তো সকলে মিলে আনন্দ করা, সকলের, আগমনেই পূজো মণ্ডপ ঝল্‌মল্‌ করে, আলোতে নয়। সবার স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানই পূজোর সাফল্য। কালু আরো বলে, অতগুলো মানুষের যোগদানের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন, অনুরোধ মিথ্যে করে দেবেন না। একজন বললো ভিড়ের মধ্যে কত টাকা দেবে। এই কয়দিনে ওদের মোড়লের সাথে জন দুই এসেছিল, জানিয়ে গেছে, মেয়েদেরও ছেলেদের ইচ্ছেটাই প্রবল। আর জানায় ওরা ওই পূজোর সময়ে একটু নাচগান করবে। আর সেটাই বা মন্দ কিসের। তাছাড়া ওরা ঘর ঘর ত্রিশ টাকা করে দেবে। বললে পঞ্চাশও দিতে পারে। ভোলানাথ জিজ্ঞেস করে — কি গো রামচরণ খুড়ো, কালু ভাই যা বললো শুনলে।

রামচরণ খুড়ো — সবাই তো শুনলুম। গাঁয়ের সবাই বললে অসুবিধে কোথায়?

মুরালি — কালু ভাই এর কথা ফেলনা নয়।

বংশী — কালু ভাই আমাদের মূল গাঁয়েন। ওর ইচ্ছেই আমাদের ইচ্ছে।

মুরালি — জোরে সকলকে শুনিয়ে বলে কি গো তোমাদের কি ইচ্ছে। ওরা আসবে, খাবে, আর আনন্দ করবে। আর ওরা এমনি কোথাও পাত পাড়তে চায় না। মা কালীর ইচ্ছে হয়েছে তাই বোধ হয় অত বড় কথা বলেছে।

জনতা এক বাক্যে জানায় সকলেই রাজী।

শশা বলে — তাতে যদি এক মুঠো কম বন্দে আর লুচিও দুচারটে কম হলেও বলবে।

সকলেই শশব্দে বলে — বাঃ, বাঃ, খুব সুন্দর কথা বলছিস্ তো।

সকলেই বলে — সাঁওতালদের আসতে দাও। মাকালী ওদের পাঠাচ্ছে। আসুক। মা কালী রাগ করবে।

ভোলানাথ — দেখ সকলেই বলছো, শেষে দু চার জনের উপর দোষ পড়বে না তো।

শশা — দোষের কি আছে, পারলে ওসব চাঁদা না দিয়েই খাওয়ালে আরও ভাল হোত। খেতে চায়। আমাদের গাঁয়েরই সুনাম।

ভোলানাথ — দু-আড়াই হাজার টাকা পেলে আমাদের বন্দে লুচিতে কিছুতেই টান পড়বে না। তবে আমাদের জিনিষ পত্রের কিছু কিছু বাড়াতে হবে এই আর কি?

রামচরণ খুড়ো — আমাদের গাঁয়েতে প্রায় হাজার দুই, কুটুম, বাটুম শপাঁচ, আর খয়রা শোলের হবে মোটামুটি শচার সাকুল্যে তিন হাজারের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এসব মাকালীই ব্যবস্থা করে দেবে। ভুল ভ্রান্তি হলে কেউ কিছু দোষ কারো ঘাড়ে চাপাবে না। এটা ছোট কাজ নয়। দেখাই যাক্ মায়ের কি ইচ্ছা।

রতন — খুড়ো। দেখার কিছু নাই। মা সব ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে। তোমরা শুধু ছোকরাদের হুকুম করবে। দেখি কেমন না হয়। কোন দিন ভেবেছিলে এত ভাল মন্দির তৈরী করতে পারবে, দুমাসও লাগলো না। এ তল্লাটে নয় জেলাতে এরকম মন্দির তো আমি দেখি নাই। তোমরা ধারে পাশে জেলাতে দেখেছো কিনা জানি না।

রতনের কথায় সকলেই সেদিন অনুভব করে। অনেকেই বলতে থাকলো তা অবশ্য এরকম সুন্দর মার্বেল পাথরের মন্দির দেখেনি। মন্দিরের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে আনন্দের সাথে সকলেই রাজী। শশা অনেক দিনের পর আবার বলে — দারুণ জিনিষ হবে। হাজার তিন লোকের দুবেলার সেবা, খেচুড়ি, লুচি, বন্দে......দারুণ দারুণ।

পরক্ষণেই শশা বলে — একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বলে ক্ষমা করে দিবে সবাই।

মুরালি — কি কথা?

শশা — চৈত্র মাসের অমাবস্যার রাতে তো পূজো। পূজোতে যে সব পাঁঠা দেওয়া হবে সেই প্রসাদের তাহলে কি হবে? তারপর অনেকের মানসিক পাঁঠা আছে। আবার বলছো গোটা দিন আরো বাড়ীতে ধোঁয়া ওড়া চলবে না।

বংশী — শশা দামী কথা বলেছে। ঘরে আগুন জ্বলবে না অথচ সেই প্রসাদের কি হবে।

ভোলানাথ — ওটা ভাবিনি যে তা নয়, ভেবেছি। আমার মতে ওটা খিচুড়ীর যে তরকারী কুমড়ো হবে, সেটার সাথে মিশেয়ে দেওয়া হবে। সেদিন রাতে মায়ের থানে যত পাঁঠা বলি হবে, সবই তরকারীতে মিশে যাবে।

শশা — দারুন নুতন জিনিষ হবে। মাংস আর খিচুড়ি, আনআন্ ডাক ছাড়বে। তা হালুই কর গোটা চার আসছে তো।

মুরালি — পাশা পাশি গাঁয়ের জন পাঁচ ভাল হালুইকর আসবে, তার মধ্যে হেড থাকবে রায়পুরের জয়দেব। আশ্চর্যের কথা কেউ কিছু নেবে না বলেছে। ওরা সাথে আনবে ওদের যোগাড়েদের।

বংশী — তাহলেই হবে।

শশা — রতন, তুই কি বলিস্। মাংস কুমড়ো আর খিচুড়ি জমবে ভাল। তারপর যদি জয়দেবের রান্না হয়। সত্যি বলতে কি, দিনগুলো যেন দিন বড় হচ্ছে। সেদিনটা আসতেই চায় না।

সবাই হেসে ফেলে। শশার সাথে নিজেরাও তো একই পথের পথিক। সেদিনটা যেন আসতেই চায় না।

কিংকর খুড়ো — মাকে ষোলআনা থেকে তো জোড়া পাঁঠা দেওয়া হবে প্রতিবছর।

ভোলানাথ — জোড়া পাঁঠাতো মাকে দিতেই হবে। এখানে কিপটেগিরি করা চলবে না। সারা বছর পর মাকে একবার।

রামচরণ — মায়ের ক্ষেত্রে কিপটেগিরি করা চলবে না, তেমমি চলবে না কোন রাজনীতি। যদি রাজনীতি করতেই হয় এই কয়টা দিন আমরা সবাই এক। যার যাকে ভাল লাগে ভোট দাও। নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করে কি লাভ। রাজনীতির উর্ধ্বে থাক আমাদের মায়ের ব্যপার। আর রাজনীতির উর্ধ্বে থাক আমাদের গ্রাম্য বিচার আচার।

ভোলানাথ — সমবেত জণগণকে উদ্দেশ্য করে বলে, খুড়ো যা বললে তাতে আমরা সবাই রাজী তো তাহলে।

সকলেই জোরে জানায় সকলেই রাজী।

ভোলানাথ — পাড়ায় পাড়ায় যাদের উপর চাঁদা তোলার ভার দেওয়া হয়েছে দেখবে যেন কেউ বাদ না পড়ে। কেউ যদি বেশী দেয় ক্ষতি নাই। আগামী কাল চাঁদা চাই। পরশুদিন গাড়ী জুড়ে বাজার যেতে হবে। প্রতি পাড়ায় যেন কম করে একজন করে যেতে হবে। পরে একদিন বসে কাজটা কিভাবে চালানো যায় সকলেই আলোচনা করতে হবে।

কিংকর খুড়ো — সেটা তো করতেই হবে।

নিতাই খুড়ো — সেটা একেবারে লিস্ট করে নিতে হবে।

এবার কালু — আপনাদের অনুমতি হলে বলি খয়েরা গোলের বাসিন্দাদিকে। ওরা চাঁদা দিতে চায় ওদিকেও চাঁদার টাকা তুলতে হবে।

রামচরণ খুড়ো — কালুভাই! সবাই তো বললো, আবার অনুমতি কিসের। সকলে মিলে আনন্দ করুক এটাই চাই।

কালু — তাহলে, কালই বলবো।

ভোলানাথ — আরও বলবে পূজোর দিনে চাঁদা অবশ্যই চাই। পারলে রামচাঁদকে দেখা করতে বলো।

মুরালি — সেটা ভালই বলেছ। শশা! কাঠতো রেডি।

শশা — কোনদিন রেডি হয়ে গেছে। একদিন বয়ে আনলেই হবে।

মুরালি — দুদিন আগে বয়ে এনে সব ঢাকা দিতে হবে। আর একদিন চেঁচে ছুলে,

ন্যাতাটাতা দিলে ভাল হয়।

রতন — ওটা আবার কাজ আমাদের পাড়ার মেয়েদের বললেই পরিষ্কার করে ন্যাতা দিয়ে যাবে।

মনা — তার পরের দিন আমাদের মেয়েদের পাঠাবো। পর পর দুদিন হলে আরও ভাল্ হবে।

শশা — তাহলে পূজোর দিন আমাদের গুলো আসবে। আর পূজোর দিন ঝাঁট পাট দরকার। মাটিতে বসে খেতে হবে।

বংশী — ভালই হোল, কোন মেয়েদের মনে কিছু ক্ষোভ থাকবে না।

শশা — যত মায়ের কাছে যাতায়াত করবে ততই ভালো। ঘরে বসে বসে ঝগড়াঝাটি করার চেয়ে ভাল।

কালু — শশাদা, তুমি ঠিক বলেছো। যত যাতায়াত করবে, তত নিজের মত মনে করবে।

রামচরণ খুড়ো —দেখ আরকি বাকি থাকছে কাজের। কাঠ, রাঁধুনি, বাজার, মাইক, লাইট, জেনারেটার আরকি......? জয়দেবকে দিয়ে মসলা পাতি, জিনিষ পত্রের হিসেবটা দেখিয়ে নেবে।

মুরালি — ঠিক বলেছো খুড়ো। লোক হাজার তিন হলে আর কতকি লাগবে আর একবার দেখিয়ে নিলে ভাল হয়। হরনাথ আছ কি? তাহলে একবার এসো।

গোপাল — আছে, আছে!

হরনাথ কাছে গিয়ে বসে একবার তাকায় সকলের দিকে। দেখাতে চায় সেও কম্ নয়।

বংশী — অমল তুই একবার কাগজ কলম ধর।

মুরালি — কত আটা লাগবে।

বংশী — শুধু আটা না রুল কিছু মেশাবে? হাফ্ হাফ্ না সিকি সিকি?

ভোলনাথ — হরনাথ কি বলছো? সিকিই ভাল তবে দেখে করতে হবে ওখানে জয়দেব দাকে দিয়ে জিনিষপত্র একেবারে চেক্ করে নেবে। মোটামুটি কত আটা লাগবে।

মুরালি — বুধন কুন্ডু ফর্দ ফেলে দিয়ে কতকিং লাগছে দেখে পরে হাফ্ না সিকি চিন্তা করলেই হবে।

এবছর তো প্রথম। তার পর এত বড় কাজ হোল। সেটা রায়পুরেই দেখা যাবে।

সকলেই এটা ওটা ধরিয়ে দেয়। হরনাথ মোটামুটি শতকরা হিসেব অনুযায়ী বলে যায়। অমল লিখে যায়। মোটা জিনিষগুলোর দাম ফেলা হচ্ছে। হারা ময়রা দাম বলে যায়। অমল দাম ফেলে যায়। আবার আটকে গেল বন্দের কথায়।

বংশী বলে — পার হেড্ কত?

মুরালি — একশ গ্রাম।

ভোলানাথ — একটা গ্রামে কত লাগছে?

অমল — তিন হাজারে লাগথে ৩ কুইন্ট্যাল।

ভোলানাথ — কেজিতে কত পড়ে বলতো? হারু।

হারু বলতে ইতস্ত করে, কি বলা যায়, ভাবছে দেখে, কেউ কেউ শুনিয়ে বলে আসলটা বলবে না।

রেগে হারু বলে — বলছি দাঁড়া — তোরা তো করালেই হিসেব পেয়ে যাবি। একটু পরে বলে পনেরো টাকার কাছাকাছি, বেশী করাচ্ছোতো তাতে একটু কমও পড়তে পারে।

মুরালি — তাহলে চার হাজার লাগবে।

বংশী — মনে হয় ওতেই হবে।

রামচরণ — তবে একশ করেই হোক।

ভোলানাথ — তাই একশই হোক।

কালু এবার বলে — আর একটু বাড়িয়ে দিন, বছরেরর একটা দিন, ছেলেপুলে সকলেই খুশী হবে।

ভোলানাথ — ছেলেদের তো একশোও লাগবে না।

কালু — তবু বলছি, একটু ভেবে দেখুন, ঐ দিন একটু ভাল করেই খেতে চায়।

রামচরণ খুড়ো — কালু ভাই যখন বলছে, একটু ভেবে দেখতে হবে। অন্য কেউ হলে চলতো।

ভোলনানাথ — আমাদের টোটাল আদায়টা কত হচ্ছে দেখতো?

কালু — আপনারা পরে হিসেব করবেন। আমি একটা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

বংশী — বল।

কালু — কিছু মনে যদি না করেন বলছি। মোড়লি বা ধৃষ্টতা ভাববেন না।

ভোলানাথ — বলই না, তোমার কথা সকলের থেকে আলাদা।

কালু — সারাবছর প্রণামী বাক্স ও চালটাল যা পড়ছে তাতে আর একশ বন্দের খরচ চলে যাবে অনায়াসে।

কালু — আমি ভিক্ষা করে চালিয়ে নেব, সেজন্য ভাববেন না। মাই চালিয়ে দেবে। রবি আর আমার খেতে কতগুলো আর চাল লাগে।

নিতাই খুড়ো — রবি শুদ্ধু তোমার ওখানে?

রামচরণ খুড়ো — কালু ভাইকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি।

ভোলানাথ — গড় দু'শো করে হলে, যাচাই হয়ে যায়।

মুরালি — দুশতে হবে যাচাই?

ভোলানাথ — ছেলে বুড়ো মিলে অর্ধেক হয়ে যাবে। ছেলে বুড়োরা গড় একশ করেও খেতে পারবে না বড় জোর পঞ্চাশ ষাট।

রামচরণ খুড়ো — দু'শ হিসাবেই থাক্। যদি তৈরী করতে করতে বেশী তৈরী হয়ে যায় ক্ষতি নেই।

বংশী — দু'শ হিসাবেই থাক্। ওতেই যাচাই হয়ে যাবে। বরং দেখ আর কিকি বাকি থেকে যাচ্ছে। বাসনকোষণ, কড়াই ইত্যাদি কত কি লাগবে? নাপিতকে বলেছো?

কালু — একজন ভট্চাই চাই। আমি পুজো করবো, আর একজন মন্ত্র বলবে।

কিংকর খুড়ো — তাহলে বদ্দী ভটচাইকে একেবারে বলে দিয়ে আসবে, আর না হলে ওর ছেলেকে।

রামচরণ খুড়ো — একেবারে লিখে নাও। বাজারে ঢোকবার আগেই তোমরা ভটচাইকে বলে যাবে।

ভোলানাথ — আর একটা জিনিষ এখনও হয়নি, গোটা আষ্টেক উনুন লাগবে। আজকেই না হলে কাঁচা থাকবে। শশা তোরা সময় করে গোটা আষ্টেক বড় বড় উনুন করে দিবি।

. শশা — কোন জায়গাটাতে হবে?

ভোলানাথ — কুয়োর কাছাকাছি। জলের সুবিধেও তো দেখতে হবে। খাবার পত্র রাখার জন্য একটা ত্রিপল দিয়ে আচ্ছাদন করতে হবে। বটের ছায়ায় হবে না। পাখী, আছে পাতা চোতা আছে। তারপর আবার বৃষ্টির জল। আর একটা করতে হবে কুয়োর জলের জন্য হাত দশ ড্রেনটা ছাড়িয়ে দিলেই হবে। রাস্তাও কাদা হবে না।

ঠিক হোল আগামী কাল কে কে যাবে রাধাপুর; একটা গাড়ীও লাগবে। আটা, চিনি, মসলা, ডাল আর এটা ওটা। ভোর ভোর বের হতে হবে। না হলে ফিরতে দেরী হবে।

একজন বললো — ঠাকুরের সাজও দিয়ে আসবে। মিস্ত্রী একেবারে সাজিয়ে দিয়ে যাবে। মিস্ত্রীকেও থাকতে বললে ভাল হয়।

রামচরণ খুড়ো — ভাল কথা বলেছো, যেই বল। এটা একটা যজ্ঞি হচ্ছে কত ভুল হবে। আর একটা কথা বদী ভটচাইকে ফর্দ করিয়ে একেবারে কিনে আনবে, আসলটাই ভুলে যাচ্ছি। নতুন মন্দির হোমতো করতেই হবে। ঘিয়ের যোগাড় চাই। ঘিটা তো বেশীই পোড়াতে হবে পোয়া পাঁচ হলে ভাল হয়।

মুরালি — ওটা পাঁচ পোয়া কেন পাঁচশের হয়ে যাবে।

কিংকর খুড়ো — তাহলে তুমিই আদায়ের ভারটা নাও, না হলে অন্য কাউকে দিয়ে দাও।

মুরালি — সেটা ভাবতে হবে না। নাপিতকে বলে দিতে হবে পূজোর যোগাড় পাতি করার জন্য।

ভোলানাথ — পাঁঠার দরদাম হয়েছে, না আগামী কাল ঘোঁড়া ধরা যাবি।

বংশী — গাঁয়েতেই ভাল। আজই চল ঠিক করে নিই। জগা, জানায় চিত্তর কাছে ছাগল পাওয়া যাবে। এইতো চিত্ত রয়েছে। চিত্ত! একজোড়া পাঁঠা চাই, দিতে হবে।

চিত্ত — আজই দেখবে। তবে একটু বড় হবে, কেজি দশ করে হবে।

ভোলানাথ — ঐরকমই চাই। গোটা গাঁয়ের ব্যাপার। তাহলে ঘোঁড়া ধরার হাটে যাবার দরকার নেই। একেবারে পূজোর দিনেই পাওয়া যাবে। আর দুতিনদিন রাখার ঝামেলা পোয়াতে হবে না। বংশী, মুরালি, শশা, রতন, মনা, হেবুকে নিয়ে যা। পাঁঠার ব্যবস্থা করবি। আমিও যাই আমাকে আবার মেয়ে জামাই, বুন ভগ্নিপোতদের খবর দিতে হবে।

বংশী — মেয়েরা তো আসবেই, কুটুমে কুটুমে ভোরে যাবে।

কালু — যাক্ বরং সকলকে বলে দিন কাছাকাছি কুটুম বাটুমদের খবর দিতে। আত্মীয় স্বজন, মেয়ে জামাইরা না এলে পূজোটা জমবে কেন?

মুরালি — বলতে হবে না, কুটুম বাটুমেরা আগেই খবর পেয়ে গেছে।

কালু — সেতো আপনাদেরই ভাল। আপনাদের আত্মার সাথে যাদের বন্ধন, তারাই

আসবে। আত্মাটাতো দুদিনের জন্য শান্তিতে থাকবে। তাতে আপনি শাক ভাতই খাওয়ান।

শশা — দারুণ, দারুণ। কুটুম না এলে পাড়া মানায়। সত্যি করে আমার কুটুমরা জেনে গেছে, আমি ওদের আসতেও বলেছি। গাঁয়ে পূজো যেমন থাকে নাই তেমনি সুদে আসলে এবছর থেকে পুষিয়ে যাবে। তারপর এরকম পূজো। হাদুর কথাই ঠিক — মহাযজ্ঞি। দিনকতক কাটবে ভালই।

মুরালি — তাতো বটে। কিন্তু ঐ দিনটা কি করে কাটবে? সারা দিন-রাত তোদের সকলকে থাকতে হবে।

শশা — অত চিন্তার কি আছে? "যার কর্ম সেই করবে"। মাই করবে।

কালু — শশাদা ঠিকই বলেছে। গীতার বাণীর মতো আমরা নিমিত্ত মাত্র।

ভোলানাথ — শশা তুইও দেখছি, বেশ ধর্মটর্ম করছিস।

শশা — তা নয় গো! একদিনে কালুভাই আমাদের অনেক কিছু পালটে দিয়েছে। নিজের জন্য অত সব চিন্তা ভাবনা না করাই ভাল। দেখছো, এই কয়দিনে গ্রামটাতে হিংসা নেই মারামারি নেই, শুধু মন্দিরের কথা, ভোজের কথা আর মা কালীর কথা। মনটা যেন মায়ের মন্দিরেই পড়ে আছে। এসবের মূলে তো কালু।

কালু — আবার ভুল করছো শশাদা। তুমি এই মাত্র বললে, "তোমার কর্ম তুমি কর মা"......। মাই সব করছে। সকলেই হাসে — বংশী বলে — নিমিত্ত মাত্র।

কিংকর খুড়ো — গাঁটা এরকম ভাবেই থাকে যেন চিরকাল। শশার মুখে এসব কথা শুনে, ভীষণ ভাল লাগছে। তবে শশা তোরা একবার যা ছাগলের ব্যবস্থা করে আয়। আর মাঝে দুদিন।

ওরা চলে গেল, সভা ভেঙ্গে গেল। গোটা গাঁটা পূজোর প্রস্তুতি। মেয়েরা ঘরবাড়ী পরিস্কার করছে, কাপড় চোপড় কাচাকাচির বহর দেখে বোঝা যায় গাঁয়ে কিছু একটা হচ্ছে। আজ ভোরেই রান্না চড়েছে। কালু যাবে আখঘুটা শিবুদার বাড়ীতে ওদিকে নিমন্ত্রণ করতে। পূজো সেরে চারটি খেয়ে বের হবে। যদিও জানে শিবুদার স্ত্রী অর্থাৎ দিদি তাকে না খাইয়ে ছাড়বে না তবুও নিজের কথা না ভেবে রবির কথা ভাবতে হয়েছে। যদিও সে রবিকে কারও ঘরে বলে দিলেই হোত। রবি কি ভাববে। পূজো সারা হলে, চারটি ভাতে ভাত খেয়ে নিয়ে রবির খাবার ঢাকা দিয়ে পথে পা বাড়ায়। তার আগে গোপালদার সাথে কথা হয়। দিদি এলে ওদের বাড়ীতেই থাকবে। ওরাতো রাজী হয়েই আছে। ওরা যৌথ পরিবার ওরা আত্মীয় স্বজন, অতিথি ফকির কাউকে অবহেলা করবে না। সকলেই যেন বাড়ীতে গিয়ে একটু প্রাণের পরশ পাবেই। পথে হাঁটতে হাঁটতে সামান্য বনানী পার হলেই "খয়রা গোল"। আজ সোজাসুজি মহিলাদের বাড়ী না গিয়ে রামচাঁদ খুড়োর বাড়ী যাবে। কিন্তু পথে একজন পরিচিতার সাথে দেখা নাম তার ঠাণ্ডা মণি। ঠাণ্ডা মণি হেসে অভ্যর্থনা জানায়। ওকে নিয়ে যেতে বলে রামচাঁদ খুড়োর বাড়ীতে। রামচাঁদ মুমুর বাড়ী এখন দেখা হয়নি। পথেই কথা হয়েছে, পাড়ার অন্য সকল মহিলা ও পটুদের সাথে। রামচাঁদের বাড়ী কাছেই, ঠাণ্ডামণির বাড়ীর দুটো ঘর পর। একেবারে বাড়ীর ভিতরে যায়। কালু — রামচাঁদ খুড়ো বলে — তার আগমন বার্তা জানায়, বেরিয়ে আসে রামচাঁদ। আদিম সদর অভ্যর্থনা

জানায়। চৌকি দেয় বসতে। রামচাঁদ ঠাণ্ডমণিকে বড়কে ডাকতে পাঠায়। ওরা ঘরেই আছে। সাথে সাথেই পাওয়া গেল।

কালু কথাটা পাড়ে — আমি গতকাল বলেছিলুম তোমাদের ব্যাপারটায় সকলেই দারুণ খুশী কিন্তু দুএকজন বলে প্রথম বছর তারপর মন্দির হ'ল। পরের বছর থেকে হলেই ভাল হয়। ওরা বলতে চাইছিল খরচটা খুব বেশী পড়বে। তাই আমিও জানাই তোমাদের কতটা আন্তরিকতা। আসলে তোমরা তো একটা পাড়ার মতো। আমি জানালুম ওরাও পূজোতে অংশগ্রহণ করতে চায়। ওরা তোমাদের আনন্দে উৎসবে একটু ভাগীদার হতে চায়। আমি আরও জানাই এসব মায়ের ইচ্ছে। না হলে ওরাই বা বলবে কেন? তাছাড়া তোমরা তো কোনদিন কোথাও কালীপূজো ইত্যাদিতে চাঁদা টাদা দাওনা। সুতরাং এটা মায়ের ইচ্ছে ছাড়া আর কি হতে পারে।

রামচাঁদ — তা বটে। মায়েরই ইচ্ছে। আমি অনেকদিন ওদিকে যাই নাই। কাঁড়াগুলো চরাতে চরাতে ওদিকে গেল, তাই ভাবলাম কাঁশাই এর কাছে গিয়ে চান করিয়ে আনবো। শ্মশানের কাছে গিয়ে তো তাজ্জব। শুনছিলুম বটে মন্দির হচ্ছে। ভাবছিলুম ছোটখাটো কিছু একটা হচ্ছে। দেখে তো চাকচাঁদা হয়ে গেলুম। কি সুন্দর, সাদা পাথরের, কি ঠাণ্ডা আবার রং করেছে কি সুন্দর, দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা রথ। পায়ে পায়ে মায়ের কাছে গেলুম, মাথা নোয়ালুম, মনে মনে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আমরাও তোর পূজো করবো।

কালু — "মাকে" তার ছেলেরাই পূজো করবে। তুমি আমি সকলেই মায়ের সন্তান।

পটু — ঠিক কথা বলেছিস মা তো সকলের মা।

রামচাঁদ — তারপর জানিস্। মন্দিরের সাদা পাথরে বসলুম। মনটা বেশ ভাল লাগছিল, জায়গাটা কেমন পাল্টে গেছে। আগে মনে হয় বংগা বংগা মনে হোত। তারপর বাড়ী ফিরলুম। রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে দেখলুম ওখানে মায়ের পূজা হচ্ছে। আমরা ওখানে খাচ্ছি। গাঁয়ের মেয়েরা খেতে দিচ্ছে। একটা কালো মেয়ে তদারকি করছে। তারপর কি নাচই না নাচলুম। কালো মেয়েটো আমার নাচ দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল। আর ঘুম হয় না। তারপর তোর সাথে দেখা। তোকে দেখে ঝপ্ করে রাতের নাচ গান, খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। তারপর পটু, মঙ্গলা তোদের ডেকে, পূজোর কথা বলেছি, কিন্তু নাচ গান, খাওয়ার কথা আর সেই মেয়েটার হাসির কথা বলি নাই। এই প্রথম কাউকে বললুম। আর না শুনেই তোরা তো যত করলি।

পটু — আগে বলিস্ নাই কেন?

রামচাঁদ — এরকম স্বপ্নের কথা সবাইকে না বলাই ভাল। বলতে ভাল লাগল তাই বললুম।

পটু — ওরা চাঁদার কথা কিছু বলেছে?

কালু — আমি তোমাদের না জানিয়ে বলে দিয়েছি, হাজার দুই আড়াই হবে। আর চাল টাল যদি পারে।

বড় — ঠিক বলেছিস্ পারলে আরো বেশী দুবো। আমরা তিন কুড়ি ঘর আছি, আড়াই কুড়ি করে দিলে তিন হাজার টাকা হবে। জেঠা তুই বলছিস্?

রামচাঁদ — আমি আর কি বলবো, তোরাই তো বলবি, আমি আর ক'কাল আছি, যোগাড় করবি তো তোরা।

মঙ্গলা — তুই আমাদের গাঁয়ের মোড়ল তুই না বললে কে বলবে। বড্ড তো আড়াই কুড়ি টাকা, দুটো মুনিবের দাম লয়।

পটু — ঠিক বলেছিস্, হেঁড়া খেয়ে খেয়ে সব গেল, আর দু'দিন যদি হেড়া নাই খেলুম।

বড় — দুবোঝা কাঠ বিনলেই তো আড়াই কুড়ি।

রামচাঁদ — তাহলে, আমরা তিন হাজারই দিব। আর একটা তোদের বলি নাই। এক জোড়া কালো পাঁঠা দিলুম স্বপনে। তাই বলিছ আমরা গেরাম থেকে জোড়া পাঁঠা দুবো। প্রতিবছর দুটো পাঁঠা দিবেক, আমরা কাকে কাকে পাঁঠা দিতে হবে জানিয়ে দুবো, পালা করে গেরামের লোক দিবেক।

কালু — বলি পাঁঠাতো ফিরে দেবে না।

পটু — কি বার হবে? লিয়ে লিবেক ?

কালু — না, না, ঐ দিন যত সব পাঁঠা পড়বে কাউকে দিয়ে দেবে না। সবটাই রান্না হবে। খিচুড়ী হবে আর কুমড়োর তরকারী। পাঁঠার প্রসাদ কুমড়োতে মিশিয়ে দেওয়া হবে।

রামচাঁদ — খুব ভাল কথা, ওটাই তো ভাল, গোটা গাঁয়ের লোকের পাতে পড়বে। কার মাথায় এলো ওটা। ভাল মাথা তোদের।

কালু জানায় — ভোলানাথ খুড়োর ও আর সকলের......।

রামচাঁদ — সাবাস্ ভোলানাথ, তোদের মাথা আছে। সকলকে খাইয়ে তো সুখ। আমরা বছর বছর জোড়া পাঁঠাই দুবো, চাঁদাও দুবো চালও দুবো।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেছে, তাদের আঙিনাতে......। কথায় জেনে গেছে তাদের পূজো আগামী অমাবস্যায়। ছেলেমেয়ে সকলেই খুশী। ওরাও শুনেছে রামচাঁদ স্বপনে দেখেছে ইসব। গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। ওরা সবাই জানায় আজই বসতে হবেক। না হলে চাঁদা আদায় হবেক কেনে। একটা প্রবীণা মেয়ে বলে — সবাই তো শুনে গেছে আড়াই কুড়ি করে টাকা, চাল আর পাঁঠা। আমরা সবাই জানিয়ে দুবো। চাঁদা আদায় এখুনি করতে হবে। ওদের তো যোগাড় পত্র আছে। এতগুলো লোকের। চালও স্থির হয় ঘর ঘর দুই কেজি, বেশী হলে খতি নাই। কালের মধ্যে সব চাঁদা চাই। পরশু দিন দিয়ে আসতে হবেক। রামচাঁদ আমার তো একটা বড় কালো পাঁঠা আছে। আর কার কালো পাঁঠা জানিস তোরা। এবছর দিলে সাট ঘর থাকলে — এখন বছর তিরিশ তাকে কোন পাঁঠা লাগবে নাই।

বাদল — জেঠা, আমার একটা মাঝারি কালো পাঁঠা আছে যদি বলিস, আমি দুবো উটা।

রামচাঁদ — ভালই হোল, তোর আর আমায় নিয়েই শুরু হোক। পূজা পেরুলো আগামী বছর যাদের কালো পাঁঠা বাচ্ছা হবেক, তারা দিবে। যাদের হ.বেক নাই তারা কিনে লিবেক। দেখ, সব ঠিক হয় গেল আর বেশী কিছু বলবি নাই।

কালু — তাহলে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ, পূজোতে আর পূজোর পর দিন, দু বেলার নিমন্ত্রণ, বাড়ীতে কুটুম আসবে তাদেরও। তোমরা নাচ গান দিয়েপূজোটাকে মাতিয়ে দেবে। আর একটা হাজার খানেক বড় বড় শালপাতা বানিয়ে নিয়ে যাবে।

পটু — আর একটা কথা কুটুম বাটুম নিমন্ত্রণ করবো তো। কতগুলো পাতা লাগবে, আমরা সবটাই দুবো।

কালু — প্রায় আট নয় হাজার লাগবে দুবেলায়। কুটুমদেরও নিমন্ত্রণ।

অচলা — বাপরে! কত লোক খাবেক।

পটু — কি কি খাওয়াবেক।

মঙ্গলা — দুপুরে খিচুড়ী, আর কুমড়ো আর পাঁঠার মাংস। রাতে লুচি, ডাল, তরকারী আর বন্দে।

কালু — ঐ দিন কারও বাড়ীতে রান্না চলবে না। একদিন না রাঁধলে কি কষ্ট হবে তোমাদের। সকলের মুখে হাসি।

কালু আরও বলে — বিকেলের দিকে একবার যেয়ো গো খুড়ো, পটু দা, মঙ্গলা, বড়দা, রামচাঁদ খুড়ো তোমরা সবাই। আমি ফিরে আসি। তোমার সাথে কথা হলে, গাঁয়ের ওরা সব কত বল পাবে, খুশী হবে এবার থেকে তো তোমাদের পূজো। কিগো মাতো সকলেরই।

রামচাঁদ — খাঁটি কথা।

পটু — পাতা তাহলে ঘর ঘর দেড়শ করে দিবি। বড় পাতা করবি। খিচুড়ি গড়িয়ে যাবে তা না হলে।

মঙ্গলা — ভাল রাঁধুনি আনবি যেন মুখ ছেড়ে যায়। কুমড়ো আর মাংস ভালই জমবে।

পটু — পূজোতে আমরা, ধামসা, মাদল বাজাবো। ঠাণ্ডা মণি, তোদিকে সব নাচতে হবেক।

কালু — আমি তোমাদিকে বলতে ভরসা পাচ্ছিলুম না, তোমরা নিজেরাই বলছো, ভালই লাগছে।

মঙ্গলা — নাচবো, নাচবো, সবাই নাচবেক, কত লোক নাচবেক, তোরা ধামসা, মাদল ঠিক করে রাখবি।

ঠাণ্ডা মণি — অনেক দিন নাচি নাই।

কালু — খুড়ে, আমি একবার আখ খুটো খাবো। তোমাদের কুটুমদের জানিয়ে দাও। যারা বাড়ীতে আসবে তাদের নিমন্ত্রণ।

পটু — জমবে ভাল। কুটুম আসলে।

কালু বলে — আসছি গো আমি,

কালু পথে পা বাড়ায়, সেই বনানী ভিতর দিয়ে। বনে চলতে বেশ ভাল লাগে। মনে একটা রোমাঞ্চ। ভাল লাগছে, আদিম অশিক্ষিত লোকেদের। মনের মধ্যে কোন প্যাঁচ পুঁচ নেই। এখনও কত সরল, সহজ। সকলের সাথে একসাথে মিলিত হব একসাথে খাওয়া

দাওয়া করা যে আনন্দের ব্যাপার এরা অনুভব করে। বনানীর ও বনের সরু পথে হাঁটতে ভাল লাগে। মাঝে কুটুস, গাছের পাতা হাত দিয়ে শোঁকে। ফুলের শোভা দেখতে দেখতে চড়াই পথ পার হচ্ছে। একসময় সেই প্রথম দিনের টিলাটার কাছে আসে। একবার একটু খানিকের জন্য না উঠে পারে না। উঠবো না উঠবো করে অবশেষে টিলাটায় উঠে। আবার সেই দৃশ্য উত্তরে দিগন্ত বিস্তৃত কংসাবতী উপত্যকা। কংসাবতীর অপর তীরটা আরও ভাল লাগে। ছোট ছোট টিলা গুলো ভালোলাগে। দক্ষিণে নীচে শৈলশিরায় সৃষ্ট উদাস উত্তাল স্বচ্ছ নীল ঢেউ সমুদ্র অপূর্ব লাগছে। একবার চেষ্টা করে তার আশ্রম খুঁজতে থাকে। একটা ঝোপঝাড়ের পাশে একটা চুড়ো চোখে পড়ে। অপূর্ব লাগে কমলা রংয়ের চুড়োটাকে। উপর থেকে রথের উপরটা দেখতে যেমন লাগে। সেইরকম লাগে। মনে পড়ে যায়, "তোমরা নিমিত্ত মাত্র", "আমাকে শরণ নাও"। টিলার থেকে মনে হয় একটা রথ বন থেকে বের হয়ে আসছে। অনিচ্ছা স্বত্বেও নামতে হয়। আবার পথে থেমে পড়ে। বনের ছায়ায় কখনও রাস্তাটা গিয়েছে। রোদে ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে বন শোভা দেখতে দেখতে এক সময় পাকা রাস্তায় পৌঁছে যায়। একটা চায়ের দোকানে বসে। চা খায়। বাস আসাতে বাসে চেপে পড়ে। মিনিট চল্লিশ পর বাস থেকে নামে। সোজা হাজির শিবুদার দোকানে।

শিবু — খুব যে অবসর। ভাবছ খবর কিছু রাখছি না।

কালু — তা কেন ভাববো। বাড়ীর সব ভালো তো।

শিবুদা — ভালই জমিয়ে নিয়েছো ওখানে। এমন মন্দির বানালে লোকে বলছে এতল্লাটে এমন মন্দির নাই। দারুণ উৎসব হবে বলছিলো গোপাল। ভেল্কি দেখালে ভাই। জল খাও মুখ হাত শুকিয়ে গেছে। ও জল দেয়। একটু পর চাও দেয়। তবে কবে পূজো?

কালু — অমবস্যায়, পূজোতে, আপনাদের সকলকে নিতে এলুম। যেতে হবে।

শিবুদা — কোথায় থাকবো। তোমার কি ঘরদোর আছে।

কালু — না তা নেই, তবে থাকার অসুবিধে হবে না।

শিবুদা — অনেক বেলা হোল। চল বাড়ী চল।

কালু — চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে কথা হয়। একটু পর পৌঁছে যায়। দিদিকে দেখে। দিদিকে সম্ভাষণ করে, দিদি বলে; কুশল জিজ্ঞাসা করে। মাঝ মাঝে আসতে নেই। অভিযোগ করে দিদি। জল টল খাইয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে স্নানে যায় শিবুদা। খাওয়ার দরকার নেই বলে জানায়। জানায় সে খেয়েই বেরিয়েছে। দিদি জামাইবাবু কাছে না না চলে না। দিদি জায়গা করতে থাকে। আবার সেই আসন, বাঘের আসন, মনে পড়ে যায়, জবাকে। যদি দেখতো তার আশ্রম, মন্দির উৎসব কত আনন্দ পেত। গর্বে বুক ভরে যেতো। ছেলেটা থাকলে আজ বছর খানেকের হতো। অন্নপ্রাসন হোতো। ঘরটা আনন্দের জোয়ার বইতো। স্নান সেরে ফিরে আসে শিবুদা। খেতে বসতে বাধ্য হয়। গল্পে গল্পে খাওয়া হয়। একটু গড়িয়ে নেয়। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আজ আবার বিকেলের দিকে বসতে হবে বিশেষ করে সাঁওতালদের ব্যাপার নিয়ে। আরও অনেক টুকিটাকি কাজও আছে। ওরাও যাবে বলেছে। কি বলতে কি বলে দেয়। তাহলে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। একটু গড়িয়ে নিয়ে, দিদিকে অনুরোধ করে পূজোতে যাবার জন্য। দিদি রাজী, ওরা তিনজনেই

যাবে। স্বামী স্ত্রী ও ছেলে। দিদি খুব প্রশংসা করে ভাইয়ের। গোপালের মুখে সব শুনেছে উৎসবের খুঁটিনাটিও। কালুর সাথে শিবুদাও আসে। কিছুক্ষণ বসতেই একটা রায়পুর গামী বাস এসে গেল। সেটাতে চেপে পড়ে, শেষবারের মতো অনুরোধ করে। বাস থেকে নামে, এবার বনের মধ্যে হাঁটতে হবে। পড়ন্ত বিকেল না হলেও হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে। বনানীর শোভা দেখতে দেখতে। ফিরতে ফিরতে চারিদিক তাকাতে থাকে। একটু ফাঁকা জায়গায় এলেই দূরে নীল শৈলশিরা চোখে পড়ে, বড্ড ভাল লাগে, একটু দাঁড়ায় আবার হাঁটে। গাছ গাছালির আলিঙ্গন, পরশ নিতে নিতে। হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই টিলায়, দেরী হয়ে যাবে, আর উঠে না। রামচাঁদদের গাঁয়ে পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে সেসব বুঝতে পারে। এদের কাজ বেশ জোর কদমে চলছে। প্রায় চাল এক কুইন্ট্যাল কুড়ি কেজি, ঘর ঘর দু কেজি। ওটা আজই পৌছে দিয়ে আসবে। ওকে দেখে দাঁড়াতে বলে।

রামচাঁদ বলে — তুই দাঁড়া, তোর সাথেই আমরা যাব। একেবারে চালটা সঙ্গে নিয়ে। গোটা পনেরো কুমড়ো আদায় হয়েছে। সেটাও নিয়ে যাচ্ছে। চাল, কুমড়ো নিয়ে, পটু, মঙ্গ লা,বড়, ডাবু, রূপচাঁদ রামচাঁদ......। বের হয় সাত আট জন, ওদের সকলের মাথাতে ছোট ছোট সারের বস্তায় চাল। একমাত্র রাম চাঁদ থলি হাতে। গল্পে গল্পে হাজির হয়, কালী থাকে। প্রায় বিকেল। তখন কালী মন্দির জম জমাট। কালী মন্দিরেই রাখা হচ্ছে দোকান বাজার পূজোর আগের দিন, বের করে নেওয়া হবে। ওরা সকলেই ছিল। ওদের মাথায় বস্তা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না ওরা রেডি হয়ে এসেছে। ভোলানাথ ও মুরালি সাদরে ডেকে নেয় — রামচাঁদ আয়। মাথাতে ওগুলো কি?

রামচাঁদ — চাল আর কুমড়ো। চাল আদায় হয়ে গেল তাই নিয়ে চলে এলুম। পটু দেখ তোরা কেমন মন্দির হয়েছে। আমি বাপু এরকম মন্দির কুথাও দেখি নাই। বসে দেখ কেমন ঠাণ্ডা, প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

পটু — দারুণ জিনিষ হয়েছে।

রামচাঁদ — মাকে প্রণাম করে আসি পরে কথা বলবো।

রামচরণ খুড়ো — তোরা আগে মাকে প্রণাম করে আয়। তারপর কথা বলবো।

ভোলানাথ — দেখে মনে হচ্ছে ওরা বেশ তৈরী হয়েই এসেছে।

রামচরণ খুড়ো — কালু ভাই যেখানে আছে, সেখানে কোন চিন্তা নাই। সত্যি ছেলেটা যাদু জানে।

মঙ্গলা — দারুণ জিনিষ করেছিস তোরা। দেখে চাকচাঁদা হয়ে গেছি, কিরে ডাবু ঠিক কিনা

ডাবু -- একেবারে তুই ঠিক কথা বলেছিস্।

রূপচাঁদ — এতো কাছে কখন হোল টেরই পেলুম না।

পটু — বলে যায় স্বপনের কথা। জোড়া কাল পাঁঠা, মেয়েরা পরিবেশন করছে আর একটা কালো মেয়ে দেখভাল করছে। আর আমরা খিচুড়ি খাচ্ছি। তাই কালু বাবজীকে বলেছিলুম আমরাও যেন বাদ না পড়ি। কালু আরও জানায় ঘর ঘর দুকেজি চাল আদায়

করেছি তিন কুড়ি ঘরে, টাকা আড়াই কুড়ি করে। আর পিত্যেক বছর দুটো করে কালো পাঁঠা দিব। শুনলুম পাঁঠার প্রসাদ কুমড়োর সাথে মেশানো হবে, বলি পাঠা ঘরে ফিরৎ যাবে না। ভোলানাথের মাথা আছে। ভালই জমবে।

ভোলানাথ গলে গিয়ে — সবই মায়ের ইচ্ছে। এই দেখ মায়ের ইচ্ছে হয়েছে, তোদের জানিয়ে দিয়ে পাঁঠা পর্য্যন্ত আদায় করে নিলে। মা চায় পূজো ধুমধামে হোক। সবাই মিলে আনন্দ করি। তোরাও তো আমাদের অন্য পাড়ার লোক, একটু দূরে যা। তোরা কি, আমাদের পর। বস সব তোরা একটু দেরী করে বাড়ী যাবি। পূজোর ব্যাপারে কিছু কথাবার্ত্তা আছে।

প্রায় সকলেই এসে গেছে। আজ ওরা বসেছে শ্বেত পাথরের উপর আট চালায়। পটুরাও বসে। বংশী ও মুরালী বাজার করতে গিয়েছিল। অমল বসেছে খাতা, কলম নিয়ে। বুদো কুন্ডুকে সব কিছু বলতে বুদো কুন্ডুর বরাটদের এক হালুইকর ডেকে বন্দের ফর্দ করতে বলে এক কুইন্ট্যালের। ফর্দ মতো আর আমাদের বাজেট মতো দুশ নয়, আড়াইশ বন্দেই।

সেরকমই মালপত্র এনেছি। আর বরাটদের কারিগর সব শুনে বলেছে, তারাই করে দিয়ে যাবে। কিছু লাগবে না। আমরাও আসতে বলেছিলুম, চারজনকে।

রামচরণ খুড়ো — বেশ করেছিস্। ভালই হয়েছে। আড়াইশ করে হলে যাচাই হয়ে যাবে। ভালই হয়েছে, বছরের একটা দিন অন্তত ছেলে পুলে, বৌ ঝিরা পেট পুরে খাক।

বংশী — জয়দেবকে দিয়ে ফর্দ অনুযায়ী মালপত্র নিয়েছি। পয়সা কড়িতে হাফ্ রুল হাফ আটাও হয়ে গেল। তাই সে রকমই নিয়ে নিয়েছি। আর একটা কথা বুদোকুন্ডুতো নিজের থেকেই তিনশ টাকা ছাড় দিয়েছিল চাঁদা স্বরূপ। আমরা চারশ টাকাতে রাজী করিয়েছি।

ভোলানাথ — খুড়োর কথাই ঠিক। কালুর ইচ্ছেটা পুরণ হয়ে গেছে। ভালই হচ্ছে। বদী ভটচাই কি বললো।

মুরালি — ও নিজেই আসবে। ফর্দ অনুযায়ী পূজোর জিনিসপত্র নিয়েছি, সাজও নিয়েছি। ভালই সাজই নিয়েছি। মিস্ত্রীই সাজিয়ে দিয়ে যাবে।

ভোলানাথ — পাঁঠার টাকাটা পেমেণ্ট কবে দিবি আজই, গরীব লোক।

বংশী — তাহলে, প্রতিবছর চারটে করে পাঁঠা পড়ছেই। এরপর মানসিক পাঁঠা থাকলে ভালই।

মুরালি — যা দেখছি ভালই হচ্ছে। রামচাঁদ — তুই কি স্বপ্ন দেখিছিলি মেয়েরা খেতে দিচ্ছে।

পটু — হুঁ। মেয়েরাই সব খেতে দিচ্ছে। আর একটা শাড়ী পড়া মেয়ে কে কেমন খাচ্ছে, কাকে কি দিতে হবে তদারকি করছে।

মুরালি — রামচরণ খুড়ো! মেয়েরাই পরিবেশন করছে; পুরুষরা নয়। ওরা সব যোগাড়-যন্ত্র করে দিচ্ছে?

ভোলানাথ — সেটাই করতে হবে। সেটাই চায় হয়তো মা। আর একটা নূতন জিনিষ হবে। মেয়েরাও এই উৎসবটা আরও জাঁকাল করে দেবে। মেয়েদেরও কম আনন্দ হবে না।

শশারা একটু দেরী করে এসেছে। পটুর কথা শুনে বলেছে মা আমাদের স্বয়ং অধিষ্ঠান হয়েছে।

বংশী — কথা বুঝেছিস বন্দের বাজেট পার হেড্ আড়াইশ। যাচাই হয়ে যাবে।

শশা — দাঁড়াও আজই আমার বেয়াইকে আনতে পাঠাচ্ছি, রঘুনাথপুরের মেয়ের শ্বশুর প্রায়ই মোড়ল বাড়ীর বন্দে খাওয়ার গল্প করে। তার উত্তরটা দিতে হবে। সেটা তো মোড়লরা খাওয়ায়। আমিতো গেছি, ঐ একমুঠো করে। দেখিয়ে দুবো খাইয়ে পায়খানা করিয়ে পাঠাতে হবে।

মুরালি — তারপর শুনেছিস।

শশা — তারপর, তারপর কি করছ। বলই না।

মুরালি — বলতো বংশী?

বংশী — রামচাঁদ খুড়ো, জোড়া কালো পাঁঠা প্রত্যেক বছর দেবে; এক বছরে দিচ্ছে তিন হাজার টাকা, বস্তা দেড় চাল......।

শশা — একেবারে জোড়া। মা সত্যিই জেগেছে। জানলি পটু পূজোর পর দিন কারো বাড়ীতে ধোঁয়া বের হওয়া চলবে না। চা টাও বন্ধ নাকি?

মুরালি — কুটুমজন যাবে সকাল বেলা চা মুড়ি না দিলে কি চলে। ধোঁয়া মানে, দুপুরে আর রাতের রান্না......।

হাসতে হাসতে শশা — আমিও তাই ভাবছিলুম। পটু তোরা মেয়ে জামাই বেয়াই বেয়ানদের খবর দে। সকলে মিলে ফুর্তি করা যাবে। তা তোদের মাদল টাদল ঠিক আছে তো। নাচা গানা চলবে দিন দুই তিন। মজা করে কাটানো হবে।

মঙ্গলা — দেখিস্ কেমন নাচ গান করতে হয়। মেয়েরাও বলছিল নাচগান করবেক ওরা। বেশ তো সবাই মজা কর।

পটু — আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমরা বাজাব, নাচব, গান গাইব। ক'দিন বাঁচব, লেচে কুঁদে য'দিন চলে। মা যখন সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, লাচব নাই কেনে, ঘরে মিটিংয়ে কত কথা হয়। পটুরা সব শোনে। মাঝে মাঝে রামচাঁদেরা পটুদের মত নেয়। ওরাও ধন্য। যা বাজেট হয়েছে তাতে বেড়ে যাবে। সকলেই কাজের দায়িত্ব বুঝে নেয়। পরশু পূজো। মাইক, লাইট, জেনারেটর কালই আসবে।

শশা — উনুন গুলো আর জায়গাটা ন্যাতা দেওয়া ঠিক হয়েছে তো। একবারে বসালে হাজার লোক বসবে।

পটু — এতটা জায়গা কারা লাতা দিলেক।

শশা — আজ আমাদের পাড়ায় মেয়েরা দিয়েছে। কাল রতনদের মেয়েরা, পূজোর দিনে দেবেক মনাদের পাড়ার মেয়েরা। তোরাও তবে খাওদাওনের দিন ভোর ভোর নাতা দিয়ে যাবি। তাহলে আরামে বসে ভোজ নিতে পারবো।

পটু — তাহলে আমাদের মেয়েরা দিয়ে যাবেক, ভোজের দিন ভালই হবেক। পর পর চারদিন দিলে আঙিনাটা আর ভাল দেখাবেক। এতেই যা সুন্দর লাগছে না, আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের তাক্ লেগে যাবে।

কালু — মিটিং তো শেষের পথে। আমি ছোট মুখে একটা বড় কথা বলবো, যদি অনুমতি দেন আর কিছু না মনে করেন।

রামচরণ খুড়ো — তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভাল কথা বলবে। ভাল কথা ছাড়া তোমার

মুখে কিছু কথা বের হয় না। বল।

শশা — নিজের ঘোরেই বললো। জানিস পটু — আমাদের পাড়ার রতনদের পাড়ার দলাদলি এক কথায় মিটিয়ে দিলো এই কালু বাবাজী। দারুণ লোক।

কালু — ও কথা বলো না শশা। তোমাদের মন চাইছিল তাই মিটে গেল।

রতন — আলবাত্ বলবো, তুমি না থাকলে মিটতো না কোর্ট কাচারি।

কালু — ঠিক আছে, থাক্ ওসব কথা। এখন সেটা বলছি, আমরা সকলে কেউ ভুল, ভ্রান্তি, দোষ করলে আমাদের টেম্পার নষ্ট করা চলবে না। ভুলটা তার ধরিয়ে দিতে হবে ভাল কথায় শুধরে দিতে হবে। আমাদের দোষ না দেখে নিজের দোষটা দেখবেন। তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে। আর পূজো ভাল ভালয় পার হয়ে যাবে। আর পূজোটাও আনন্দেতে ভরে উঠবে।

ভোলানাথ — কেউ ভুল ভ্রান্তি করলে তোমাকেই সমাধান করতে হবে।

কালু — একি কথা আপনারা বলছেন, দাদুরা, খুড়োরা আপনারা থাকতে আমাকে এত বড় কাজের ভার দিলে লোকে কি বলবে। আপনারা নিজেদের উপর আস্থা রাখুন। এই তো আপনাদের আস্থাতেই মন্দিরের মতো এতো বড় কাজ হলে গেল, আর আসছে পূজোটাও ভাল করেই হয়ে যাবে। তবে আপনাদের পাশে আমরা সকলেই আছি। কি শশাদা, রতনদা, কি মনাদা, কি পটুদা কি রামচাঁদ ও রূপচাঁদ খুড়ো আমরা সবাই আছি কিনা?

রূপচাঁদের আবেগে আপ্লুত হয়ে বলে — ঠিক কথা, আমরা সকলে তুদের পিছনে আছি। তোরা যা বলবি আমরা তাই করবো। ভুল হলে বকবি। আবার শুধরে দিবি। ঠিক কথা বলেছে।

রামচাঁদ — কত বড় কথা। আগে নিজের ভুল দেখবি পরে পরের ভুল দেখবি। আমরা তো লোকের দোষ আগে দেখি। বড় ভাল লোক কালু বাবাজী। আমরা তুদের পাশে সকলে আছি।

ভোলানাথেরাও খুড়োরা গৌরবান্বিত হয় প্রশংসায়। ওরা বলে এটা সকলের কাজ। কালু বাবাজী ওদের চোখ খুলে দিয়েছে। মারামারি ঝগড়া ঝাটিতে কিছু নাই। মিলেমিশে দিন চলে গেলেই ভাল।

পটু — কালুভাই বড্ড লোক। নিজের ভাইয়েরা দাদা বলে না। আর এতগুলো লোকের মাঝে পটুদাদা, শশাদাদা, রূপচাঁদ খুড়ো যেন কত আপনার দাদা,ভাই, ভাইপো।

শশা — বলছে কেন আর? তোমাদের গাঁয়ের রবে খোঁড়া গা দিকে বেরোতেই পারতো না জানিস। সে আজ সকলের 'রবিদাদা'।

রবি কোথায় ছিল, প্রায় কান্নার সুর ধরা গলায় জানায় পটুভাই কালুভাই আমাদের কাছে মনে হয় কালু ভাই দেবতা।

রামচাঁদ — ঠিক কথা। কথা কিসুন্দর।

সকলেই কালুর প্রশংসা না করে পারে না।

রতন বলে, জান রামচাঁদ খুড়ো, কালু বাবাজী পূজোর চাল পয়সা কিছুই নেয় না আমাদের পেট ভর্তি বন্দে খাওয়াবে হবে বলে। ও বলে ভিক্ষা করেই রবি আর ও দুজনের চালিয়ে দেবে। কি ভাল বলতো।

কালু — তাহলে ওরা যাক্, রাত হোল অনেক। ঘোর অন্ধকার।

ভোলানাথ — সেই ভাল সকলেই যাই। কাজ অনেক। শশা পাতা হচ্ছে তো।

শশা — বলেছি।

রামচাঁদ বলে — আমরা ন হাজার পাতা দুবো, আজ থেকেই পাতা করা শুরু হয়ে গেছে।

শশা — ভোলানাথ খুঁড়ো তাহলে আমরা আর পাতা করছি না। ওরাই করুক, ওদের পাতা আমাদের পাতার চেয়ে অনেক ভাল। সেই ভাল। ভাল জিনিষই ভাল। যখন সব ভাল হচ্ছে পাতাতে খুঁত থাকে কেন?

ভোলানাথ — তবে ওরাই দেবে। চল্ সব বাড়ী চল। অনেক রাত হয়ে গেছে। সকলে বাড়ী যায়। হারিকেন, লণ্ঠন হাতে খুড়োরা, টর্চ হাতে ছোকরারা। এতক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গন ভরা ছিল লোকে জম জমাট। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত ছিল। শুয়ে পড়ে জিরিয়ে নেয়। আবার উনুনে হাঁড়ি চাপে। রান্না হচ্ছে। রবি জ্বাল দিচ্ছে। আজও ভাতে ভাত। খাওয়া দাওয়া সারা হয়।

ঘুম আসে না। মোটামুটি অন্ধকার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে এক সময় উঠে যায়। আজ রবিদা নূতন মন্দিরে শুয়েছে। ওখানে দোকানের জিনিষপত্র রয়েছে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে সেই নদী কিনারের বেঞ্চে যায়। দেখতে থাকে আঁধারে ঢেকে থাকা নদীতীর টিলা প্রান্তর, চাপ অন্ধকার, শোনে রাতচোরা পাখীর ডাক। আর পাখীদের পাখা ঝপটানো ছাড়া কোন শব্দ নেই। ফুরফুরে হাওয়া বয়। নদীর ওপর টিলাটাকে শুধু বোঝা যায়, আরো কালো হয়ে আছে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী ধ্যানমগ্ন। লক্ষ কোটি যোজন দূরের তারারা আলোয় ধ্যান ভঙ্গ করতে চায়। ধ্যান ভঙ্গ করতে পারে না। রাত যত হচ্ছে, তারারা আরও আলো দিতে চায় আর ততই প্রকৃতি তার ধ্যানকে আরও গভীর থেকে গভীরতর করে। ঘুম আসছে না, দুপুরের কথাটা বারবার মনে আসে। ছেলেটা থাকলে বোধ হয় অন্নপ্রাসন্ন হোত আসছে শুক্লপক্ষে। এখন মনে হয় যদি জবা ছেলেকে নিয়ে এখন আসতো তবে অন্তত এই পূজোর দিনগুলোতে ওদিকে আনতো। সন্তানকে ছেড়ে উৎসবে আনন্দ কি সঠিক হয়। জবার জন্য দুঃখ হয়। এসব দেখলে কত খুশী হোত। একবার মনে হয় যদি বাড়ির সাথে যোগাযোগ করে ওদের পূজোর সময় আনা যেত তাহলে কেমন হোত। আবার ভাবে ঈশ্বর তাকে বন্ধন মুক্ত করে ভালই করেছে। আবার আত্মীয় স্বজনের বন্ধন, আর নেই দেনা পাওনার হিসেবের চুল চেরা বিচার। মা-পিসি এতদিনে ভুলে গেছে তাকে, আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি লাভ হবে এতে। আবার বিদায় বেলায় ব্যাথা বেদনা, চোখের জল। বরং বেশ আছে সে এই নদী কিনারে। নদী, বন, প্রান্তর, মন্দির, কালীমা গাঁয়ের মানুষের ভালোবাসা আর আছে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা। কত মানুষের দেখা, আর কত মানুষের মনের ছবি। আর মানুষের ভালবাসা, দুঃখ বেদনার ইতিহাস। আর এক অন্য জগৎ। মনে হয় ভিক্ষুকের জীবন সবচেয়ে বৃহৎ। সাধারণ মানুষ তার নিজের সংসারই নিজের জগৎ। বৃহৎএর কতকটা সন্ধান পেয়েছে এই ভিক্ষুক জীবনে। যতদিন যায় তার ব্যাপ্তিটা ঝড়তে থাকে। বেশ দিন গুলো কেটে যায়। সারাদিনের ছবিগুলো ভাসতে থাকে। ঘুম আসে না। নানা রকম চিন্তায়। একটু দুর্বল হয়েছিল বাড়ীর কথায়। ভেবে নেয়

অনর্থক আবার একটা বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে দিয়ে। হাজার চিন্তার মাঝে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে অসীম আঁধারে ছেড়ে দিতে। যেমন স্রোতের টানে একখানা কাণ্ডারী বিহীন ছোট্ট তরী। স্রোতে যেমন ভেসে যায় তেমনি আবার ঘুর পায় স্রোতের বাঁকে বাঁকে। কত ঘাটে কত গঞ্জে, কত নগর পথ ধরে যায়। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় রূপসী রাতের মায়ায়। শীতে, গ্রীষ্মে, বরষায়, জ্যোৎস্নায় কিংবা গভীর অমাবস্যায়। কত দৃশ্য, কত ঘটনার স্মৃতি বুকে নিয়ে এমনি করে একদিন মোহনা হয়ে অন্তিম সাগরে। কি লাভ একটি ঘাটে বাঁধা হয়ে পড়ে থাকা। জীবন ঘাটে, হাটে, নদী, পাহাড়ে পর্বতের গিরিখাতে, বনের ধারে, গ্রামে, শহরে নগরে বন্দরে......। যে তরী এক ঘাটে থেকে ভেঙ্গে যায় সেও যায় মোহনায়। কিন্তু টুকরো হয়ে, পচে গলে । একটা গোটা তরীর নদী পথে ভেসে যাওয়া আসল গতিতে, সে ভেসে যাওয়া যথার্থই বৈচিত্র্যময়। সে তার সিদ্ধান্ত বদলায়। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে যায় প্রকৃতির কোলে। ভাগ্যিস মাথার উপর বটের ডালটা ছিল। না হলে, সারা শিশিরটাই লাগতো আবার ভাবে শিশির লাগাতেই যেন আরও সুখ ছিল।

আজ ভিক্ষায় যাব যাব করে যাওয়া হয় না। আজ বিসর্জন হবে পুরোনো প্রতিমা। ঘরটা পরিষ্কার হবে। আগামীকাল পূজো। গাঁয়ের থেকে পূজো আসতে পারে। পূজোটা কখন হবে ঠিক হয়নি। যদিও দুপুরে হবে তাহলে, একবার ভিক্ষা করে ঘুরে আসতে পারতো। সেই গ্রামের মাতৃস্থানীয়া যে মহিলা, বলেছিলেন জল খাবে বাবা! তারপর কুরে কুরে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁর প্রতি একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। যে আত্মার খোঁজখবর নেয়, সেইতো আত্মীয়। পরক্ষণেই মনে পড়ে তাদের ঘরও যেতে ইচ্ছে করে একটু হুশ করবি। মহিলাদের মধ্যে একটা প্রাণের উচ্ছ্বাস আছে, আছে উদ্দমতা। ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু ভাবতে ভাবতে গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। যাওয়া হয় না। রবিকে বলেছিল, সে আজ ভিক্ষায় যাবে। রবি নিষেধ করে। রবি জানায় আজ প্রতিমা বিসর্জন হবে, তোমার কাজ অনেক। বেলা আটটার সময় রতনদের পাড়ার মেয়েরা হাজির গোবর আর বালতি নিয়ে। রবি মন্দিরের শ্বেত পাথর সব ধুয়ে ফেলেছে। একেবারে ঝক্ ঝক্ করছে। রবির এখন সকালের কাজ এটাই। ওরা প্রথমেই ঝাঁট দেয়। কালু ঝাঁট দিতে নিষেধ করে। কারণ এর উপরই তো আবার ন্যাতা দেওয়া হবে। কমলি বলে একটা মেয়ে হেঁসে জানায় ঝাঁট পাট দিলে সমতল ও মসৃণ হবে। ওরা জানায় পর তিন চার দিন দিলে একেবারে ঘরের পিঁড়ে দাওয়ার মতো হয়ে যাবে। ওরা ঝাঁট দেয়, জল তোলে, ন্যাতা দেয় গভীর যত্নের সাথে। আর প্রাঙ্গনটা ভরে যায় হাসিতে কথায় কলরবে। অনেকে কালুকে দেখে মুখ টিপে হাসে। ওদের হাসিটা যেন স্বভাবজাত। একজায়গায় অনেকগুলো মহিলা থাকলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা বেড়ে যায়। ঘুমের আগলও কমে যায়। বিশেষ করে যদি দু'একজন পুরুষ মানুষ থাকে। তাও আবার অচেনা হলে কথাই নাই। ওরা প্রথমে মন্দির দেখে হতবাক্। এদের পাড়াটা গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে, আলে কালে এদিকে আসা। সেই সেদিন এসেছিল যেদিন পাথর আর বালি নেওয়া হয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি এত সুন্দর মন্দির মন্দির হতে পারে ওদের কল্পনাতেও ছিল না। শুনেছিল সুন্দর মন্দির হয়েছে, কিন্তু এত সুন্দর ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে একেবারে ছবির মতো। যেন ঠিক একেবারে একটা রথ। কোদাল নিয়ে দুটো মেয়ে আরও এবড়ো খেবড়ো ঠিক করে। কোথাও পলি মাটি নিয়ে এসে ডোবাগুলো সামান্য

মাটি দিয়ে ঠিক করে দিচ্ছে, আবার প্রান্তসীমা আকা বাঁকা রয়েছে সেখানে ঘাঁটু ফুলের গাছ কিংবা বৈচি কাটা কেটে ড্রেসিং করে ঠিক করে দেয়, পরে ওখানে একটু আরও যত্ন করে নাতা দিতে বলে। মাঝবয়সী একটা মেয়ে গান ধরেছে। "বড়লোকের বিটিগো......।" আবার "ঠাকুর জামাই এলো বাড়ীতে" — "মদ খেয়ে পড়ে রইলি কখন যাবি কাছে......।" ওর দেখা দেখি দু একজন মেয়ে সুরে সুর মোলাচ্ছে। বাবু দূরে একটা বেঞ্চিতে বসে মাঝে মাঝে দেখছে আর উপভোগ করছে উচ্ছল প্রাণের প্রকাশ। দূর থেকে নিষেধ করে কালু উনোনগুলোতে ন্যাতা না দিতে। হেঁসে ওরা উত্তর দেয়, হাল্কা করে ন্যাতা দিলে, তাড়াতাড়ি টেনে যাবে উনুনটা। কালু এসবের মার প্যাঁচ জানে না। চুপ করে যায়। স্নানে যায়। স্নান সারা হলে এসে দেখে প্রায় শেষের মুখে। মন্দিরের চারপাশটিই সমান ভাবে ন্যাতা দেওয়া হয়েছে। এতে মন্দিরটা আর ভাল লাগছে। হাসিতে গানে ওরা শেষ করে। গোপাল এসে জানায় আজ এক্ষুনি প্রতিমা ভাসান হবে পূজো সারা হলে। আজ অনেকেই পূজো দেবে, কোথাও যাবে না। গোপাল জানতে চায় সে শিবুদার দোকানে পৌছুবার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল কেন। কালু জানায় এখানে যে অনেক কাজ ছিল, আসতে হয়েছে খবরাশোলে ওদের সাথে দেরী হবে ভেবেই। ওদিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল। পরে আবার মিটিংও ছিল। মেয়েরা রবিকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করছে। আর মেয়ে দিকে দিয়ে ইটি সেটি কাজ ও করিয়ে নিচ্ছে। শেষে রবি যেখানে নিয়ে যায় সেখানে রান্না বান্না করে ও রাতে থাকে সেই ছোট দুচালি ঘরটায়। রবি ও হাত লাগায়, ঘরটা থেকে বেশী দূর ঝোপ ঝাড় কেটে, চেঁছে—ন্যাতা দেওয়া করিয়েছে। মেয়েরা অবশ্য নিজেরাই করে দিত বললেই। বলা হয়নি। একেবারে মন্দিরের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, ন্যাতা দেওয়া পথও। কত কথা জিজ্ঞেস করে কালু সম্পর্কে, যতটুকু জানে সে জানিয়েছে। রবিরও ভীষণ ভাল লাগছে। তাদের আস্তানাটা এক সভ্য গব্য হতে। আরও খুশী— রবিকে যথেষ্ট যেন সমীহ করে চলেছে বুঝতে পেয়ে। শুধু পারাই নয় গোটা গ্রামের ছেলেমেয়ে আর তাকে বাজে কথা বলেছে যা। শুধু মুচকি হাসে ছেলেমেয়ে বৌ, ঝি ছোকরা সকলেই। মনে পড়ে যায়— কিজন্য মুচকি হাসে ওরা। রবিও বোঝে এমনি করেই একদিন ওরা সবকিছু ভুলে যাবে। ওটাই রবির ভীষণ স্বান্ত্বনা। ওরা উনুনটাও ভালো মাটি দিয়ে বানিয়ে দিতে থাকে। ঘরটীতে সুন্দর করে ন্যাতা দেয়। ওরা বলে পুরুষমানুষের সংসার দেখলেই বোঝা যায়। রবিকে ধমক দেয়— মাছে সাজে ন্যাতা দিতে বলে। আর ও বলে যদি অসুবিধে থাকে, বলে পাঠাবি আমরা দিয়ে যাবো। আহারে লোকটা কত ভাল আর কত কষ্ট করে থাকে। রবি ওদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে "দেবতা"। সে জানায়— আমি কি খাব না খাব, কি করবো না করবো সবসময় চিন্তা করে। গতকাল আমি কি খাব — তাই ভেবে সকাল সকাল রান্না করে দিয়ে বাইরে গেল। অন্য লোক হলে কে এত সব ভাবতো। মিটিংয়ে শুনেছিস, লোককে পেট পুরে মিষ্টি খাওয়াবে বলেই। নিজে পুজোর পয়সা, চালটাল কিছু নেয় না। ? একজন বলে ওদের মধ্যে, বলে পাথর রওয়ার দিন বলেছিলো বটে ভালভালো বন্দে খাইয়ে দিবে, তুমিও তো ছিলে।" রবি ঘাড় নাড়ে হ্যাঁ জানায়/ দেখতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে, সমস্ত এলাকাটা। এদিকে মহিলারা পুজো নিয়ে হাজির হয়। গোপাল বলেছে এখন ঘট বিসর্জন

হবে। রাতে প্রতিমা গ্রামে ঘুরবে ও দিন বেলাবেলি খয়রা শোল যাবে। আরও দু-একজন স্নান করে এসেছে। পুজো আসছে তো আসছেই। একসময় শেষ হয়। মহিলারা মন্দির দেখে তাজ্জব বনে গেছে। সকলেই মন্দিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রামচাঁদ শাওতালের মহিলাদের পরিবেশন ও কালো মহিলার তদারকিকের কথায়—গায়ে কাঁটা দেয় শিহরনে । ভোলানাথের মা গোপালের মা ও কালীপিসির মত, মেয়েরাই পরিবেশন করবে। কালীপিসি এও জানিয়েছে, ছেলেরা মত না করলেও, তাদিকে মত করাতেই হবে। গোপালের কাকীমা, ভোলানাথের বৌ, রামচরণের বৌ আরও অনেকে জানায়—দারুণ মজা হবে। জন কুড়ি ত্রিশ মেয়ে হলেই চলবে/ সকলেই তারা ছোট বালতি আর ডাবু নিয়ে আসবে। সারি সারি ভাগ করে করে খেতে দিতে হবে, এক একসারি কিছু মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইত্যাদি। ঢালাই এর দিনের অভিজ্ঞতা তারা বুঝেছে এমন আনন্দ কোন কিছুতেই নেই। যারা ন্যাতা দিচ্ছিল তারাও হাজির হাত পা পরিষ্কার করে। গোপালের মা, ভোলানাথের মা, তারিফ করে ন্যাতা দেওয়ার জন্য বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে, বেশ ভালই লাগে। মেয়েরা জানায় আগামীকাল বাউরি পাড়ার মেয়েরা দেবে, খাওন দাওনের দিন, সাঁওতাল মেয়েরা দেবে, দেখবে আরও ভাল হয়েছে। পূজোয় বসে কালু। ধূপ ধুনোর গন্ধে সুবাসিত মন্দির প্রাঙ্গন। কালুর মন্ত্র উচ্চারণে আরও নীরব স্তব্ধতা মন্দির প্রাঙ্গন। পূজাশেষে কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে বিসর্জন দেয় কাঁসাইতে। সহগামী পূজারিণীরা। শঙ্খ, উলু ধ্বনিতে শেষে চোখের জলে বিদায় দেয় মাকে। মনটা কিছুক্ষণের জন্য খারাপ হয়। আবার একটু পর—মহিলারা আবার স্বভাবসিদ্ধ পথে মুখরিত হয়। কালু ভোলানাথের মা ও গোপালের মায়ের সাথে বসে বসে গল্প করে। একজনকে ডাকে চালটাল ও প্রসাদ রেখে দেবার জন্য । গোপালের মা জানে কালু এসব কিছু দেখে না, তাই সে কালী পিসিকে বলে দেয়, ঠাকুরঝি তুমিই ঠিক করে দাও। কালী আগেভাগেই চালগুলো সিমেন্টের বস্তায় । আলুটালু ও আলাদা করে প্যসা করিও আলাদা করে। কালী পিসি হিসেবে করে বলে আজ একান্ন ষোল আনা হয়েছে। এবার কালীপিসি কালুকে বলে—কালুবাবা পয়সাগুলো কোথায় রাখবো? কালও জানিয়ে দেয় প্রণামী বাক্সে। ভোলানাথের মা জিজ্ঞেস করলেন— শুনলি।

একটি মেয়ে জানায় একান্ন ষোল আনা প্রণামী বাক্সেতেই রাখে । ওরা এবার ফলমূল চিঁড়ে কিছু কিছু নিয়ে মাখে, মেখে সকলকে দেয়, দেয় যারা ন্যাতা দেয় তাদের—একটু বেশী করেই। সকলেই প্রসাদ খায়। কালী পিসি প্রসাদ দেয়। কালুকে একটা বড় থালায় দিয়েছে। একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করে—নুতন কালীঘরে এতসব কি? একজন জানায় এসব পরশুদিনের ভোজের যোগাড় যন্তর। বাব্বা এত। এত নয়! কতলোক খাবে জানিস? কত? দুবেলায় কমকরে হাজার দশ। ওরা শুনে অবাক হয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না কি বিপুল, কি বিরাট জিনিষ হতে চলেছে। ফিরে যাবার বেলায় গোপালের মাকে জানাতে ভুলে না। তার দিদি জামাইবাবুর আসার কথা। গোপালের মা ও জানায় কিছু অসুবিধে হবে না ওরা পরের দিন বিকালে আসবে। ভোলানাথের মা বলে বেশ করেছো ?! 'জগতে কে কার, আপন ভাবলেই সব আপন।' গোপালের মা বলে গোপাল ও দিকেই ছানা দেয় মিষ্টির দোকানের জন্য।"

ওরা বাড়ী ফেরে। গোপালকে খেতে বলে যায়। যাবার আগে ভোলানাথের মা জানিয়ে যায়— এখান থেকে বাড়ী যেতে মনচায় না। জায়গাটা মনটা সবসময় ছেয়ে আছে। চোখের সামনে মন্দিরটা সব সময় ভাসছে। আর মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। মন্দিরটা দেখে আশ মেটে না।" গোপালের মা বলছেন কেন কাকীমা, আমারই এখন এখান থেকে উঠতে মন চাচ্ছে না। মন্দিরটা যেন একটা ক্যালেন্ডারের ছবির মতো হয়েছে। ঠিক বলেছো বুদোকস্তুর এবছরের ক্যালেনডারের শ্রীকৃষ্ণ অজুর্নের রথের মতো হয়েছে। আর এই একটা দিন আমার ভোলানাথ পূজো আর মন্দির করে পাগল। ছাদের জন্য টাকা থাকেনি। কি করবো ভাবছিলুম ধানবিক্রী করতে হবে। দেখি একদিন আমার নামে হাজার পনেরো ফিক্সড ছিল পোষ্টাপিসে। ঢালাইয়ের আগেই ঐ টাকা পাওযা গেল। কোন অসুবিধে হয়নি। মায়ের অপার মহিমা। ভালই হোল। যা কর্মযঞ্জ চলছে। পূজোর দিনকটা পার হলে বাঁচি। গোপালের মা —কাকীমা আমার ও তাই মনে হয়। গোপালের কাকারা, বাবাও যেন মন্দির আর পূজোর কথাতেই আধপাগল। ভীষণ আনন্দও হচ্ছে। আজ মন্দির দেখে প্রাণ জুড়োলো। একটা কথা কাকীমা— ঠাকুর পো দিকে বলবেন আমরা মেয়েরাই পরিবেশন করবো। এতে ঠাকুরের ইচ্ছাও পূরণ হবে আর আমরা মেয়েরা আরও বেশী করে পূজোর আনন্দ উপভোগ করবো। জানেন কাকীমা সেদিন ভীষন আনন্দ পেয়েছিলুম।" ভোলানাথের মা—" ভোলারা কি বলবে, এটাতো মায়েরই নির্দেশ।

রামচাঁদ—না হলে ঐরকমই স্বপ্ন দেখতে যাবে কেন তার কালো মেয়েটি স্বয়ং মা ছাড়া আর কেউ নয়। আমি রামচরণ ঠাকুরপোকেও বলবো, আমরা মেয়েরাই পরিবেশন করবো।

বের হওয়ার মুখে রামচাঁদ হাজির। মনে মনে ওরা রামচাঁদকেই খুঁজছিল যেন। রামচাঁদ এসেছে একটা কথা জানতে। সকালে ওকে খবর দিয়েছে আজ বিকেলে ঠাকুর যাবে ওদের গাঁয়ে। কি করতে হবে সেটাই জানতে এসেছে।" ওকে দেখে ভোলানাথের মা বলে— ঠিক সময়েই তোকে পাঠিয়েছে মা এক্ষুনি তোর স্বপ্নের কথা বলছিলুম। কি ঘটনা বল দেখি।

রামচাঁদ— যা দেখেছে সেটাই বলে যায়। সবশুনে ভোলানাথের মা বলে —"রামচাঁদ তুমি অনেক পূণ্যি করেছ—তাই মা তোমাকে নিজে দেখা দিয়েছে।"

গোপালেব মা— গায়ে কাঁটা দিচ্ছে"।

ভোলানাথের মা —"হ্যাঁ কাঁটা দিবে বৈকি, এটা কি কম্ জিনিষ।"

রামচাঁদ—আমরা তোদের ঠাকুর দেবতাকে এমনিতে পূজো করি না। আর আমাদের মেয়েরোও তোদের ভোজে খায় না। আর কোথাও পাঠা বলিও দিই না। সপনের কথা বলতে এককথায় সবাই রাজী। জোড়া কালো পাঁঠাও যোগাড় হয়ে গেছে। খুব আনন্দ হচ্ছে। তাই আমি নিজেই চলে এলুম। গোটা গাঁটাতে পূজো লেগে গেছে। কুটুম আসবে, খাবদাব লাচ গান করবো। আমি বুড়ো বয়সে আমারই লাচতে মন যাচ্ছে। ঠাকুমাকে তা কি করতে হবে।

ভোলানাথের মা—"তা আর কি করবে গাঁয়ের মাঝে একটা বেদী করবে, আর-

খড়ি মাটি দিয়ে সাজাবে, আর কি। ওকে দেখে কালুও হাজির। কালুও বলে—ঠাকুমা যা বলেছে তাই ঠিক।

গোপালের মা— "মেয়েদের বলবে সিন্দুর পরিয়ে দিতে আর থাকলে শুকনো মিষ্ঠি মণ্ডা দিবে। "উলু দিতে বলবে, শাঁখ বাজাবে।"

কালু বলে—কাকীমা যা বলেছ সঠিক, মাকে মেয়ে ভাবতেও পার।

রামচাঁদ— পয়সাকড়ি দেওয়া চলবে তো।

গোপালের মা— খুব খুব। নোট হলে গলয়া সেপ্টিপিন দিয়ে বুনলিয়ে দিবে।

কালু বলে— ঢাকটাক করছে— কিনা জানিনা। আগেতো সোজাসুজি নদীতে বিসর্জন দিত। তবে তোমরা তোমাদের ধামসা টামসা যা আছে—তাই নিয়ে এসো, যদি ঢাক্ না থাকে তাতেই কাজ হবে। গতকাল তো বিসর্জনে ঠাকুর গোটা গা ঘুরবে জানিনা।

ভোলানাথের মা—তুমি বেশ বলেছো বিসর্জন হবে আর বাজনা থাকবে না কথা হোল।

গোপালের মা—আজ থেকে তো কাকীমা পুজো আরম্ভ হয়ে গেল। একটা কথা, কালুবাবা—তোমার কথা সকলেই শোনে, বলবে মেয়েরাই পরিবেশন করবে, আমাকে অনেক বৌ ঝি বলে গেছে।

কালু— ঠিক আছে কাকীমা, ওরা না করলে, আমি বলে কয়ে ওদের রাজী করাব। আর একটা কথা, আপনারাই তো সব, ভোলানাথ খুড়ো আপনাদের বাড়ীর কাকাবাবুরা বললে না করে কার সাধ্যি। বিশেষ করে যখন মায়েরই ইচ্ছে।

রামচাঁদ—আমারও তাই মত। মেয়েরাই পরিবেশন করছে, সাথে মা স্বয়ং।

ভোলানাথের মা— না মেয়েরাই পরিবেশন করবে। এতে বার বার বলার কি আছে। মেয়েরা কি ফেলনা।

কালু— ঠাকুরমা এতক্ষণে একটা কথার কথা বলেছেন। সকলের যোগদানেই তো উৎসবের পরিপূর্ণতা।

রামচাঁদ—আমি যাই তাহলে। তোর কথা মতো তিনটের সময় ধামসা মাদল নিয়ে আসছি। যদি ঢাক্ টাক আসে ভাল না আসে তাও ভাল।

মন্দিরের কাজ সেরে কালীপিসি ও গোপাল হাজির। গোপালেরও তাই মত। গোপাল বলে—ধামসা ও ঢাক পাওয়া গেলে আসবে। ঢাকের জন্য লোক গেছে। ঢাকীর কাল আসার কথা। এক্সট্রা দুটো বড় ব্যাটারী আনতে বলা হয়েছে, মায়ের চালে দুটো রুল লাইট থাকবে, মাইকও বাজবে। কতটা কি হয়, হঠাৎ রাতে বাড়ী ফিরতে ফিরতে ঠিক হোল।

রামচাঁদ— তাহলে আমি বাড়ী চাই।

গোপাল—আমারাও বাড়ী যাচ্ছি। তোমার রান্না কখন হবে? আর না হলে তুমি চল খেয়ে দেয়ে আসবে।

কালু—রাজী হয় না, বিসজর্নের ঝামেলা আছে বরং রাতে খাবে দরকার হলে।

গোপালের মা—রাতে রাঁধবে না, যাবে কিন্তু তোমরা দুজনেই। একটু অগেই অন্য মহিলারা চলে গেছে। গোপালের মা ভোলানাথের মা ও কালীপিসি সবার পিছনে। গোপালও

চলেছে। কালীপিসি বলে গা থেকে একেবারে মায়ের থান পর্য্যন্ত রুল লাইট দেওয়া হবে লোকের যাতায়াতের জন্য। ভালই হবে রাতেভিতে। বিশেষ করে পুজোর দিন পরের দিন রাতে খেয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আজ চাল পড়েছে কেজি দশ, টাকাও একান্ন ষোল আনা। দেখে মনে হচ্ছে মায়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়ছে। সকলেই একমত।

· কালীপিসি— ছেলেটার এতটুকু লোভনেই। নৈবেদ্যর দিকে তাকালে কি আর পূজো হয়।

গোপালের মা—সত্যিকারের ছেলেটা ভালছেলে।

ভোলানাথের মা—ব্যবহারটা কত সুন্দর, যেন, নিজের ঠাকুমা। সত্যি ওকে কত নিজের মনে হয়।

ওরা গাঁয়ে পৌছে যায় নানান কথায়।

রান্নাচাপায়—কালু—কথায় কথায় শেষ হয় রান্না। খাওয়াদাওয়া সারা হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। একটু বিশ্রাম করবে করবে ভাবছে এমন সময়, লাইটের ডেকোরেটার্স ও দুটো জেনারেটর নিয়ে গরুর গাড়িতে হাজির হয়। রবি ওখানে যায় ও জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখে। জেনারেটর নামানো হয়। কালু এখন সেই নদী কিনারের বেঞ্চে শুয়ে পড়ে। বেঞ্চটা একটু বেশ চওড়াও, দিব্বি শুয়ে থাকা যায়। শুয়ে শুয়ে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনতে থাকে। আজই কোকিলের ডাক শোনা যায়। এতদিন শোনেনি যদি মাবন বসন্ত" ফাগুন শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। ঋতুগুলো যেন একটু লেটে চলেছে। থাকতে থাকতে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে রামচাঁদের ডাকে সাড়ে তিনটেয় হাজির তার দলবল নিয়ে। শশা, রতন, মনার দলের লোকজন হাজির হয়েছে। ভোলামাথের দলও হাজির। এসেছে একজন হেল্পার লাইট ম্যান। কয়েকজন মহিলাও এসেছে, ঠাকুরমাকে উথতে হবে। ঠাকুর বের হয়েছে। ঠাকুরের পাটার উপর ব্যাটারী বাঁধা হয়েছে আর ঠাকুরের পটেরচালের উপর দুটো টিউব লাইট জ্বলবে। একটা গাড়ীতে মাইক সেট যাবে। ছেলেরাই টানবে। মাইকবেজে ওঠে "শ্যামা মা কি আমার কালোরে! ভিড় জমেছে। খবর এলো ঢাক পাওয়া যায়নি, ওরা বাড়ীর বাইরে, ব্যাগুপাটিও আসছে না কারণ ওদের দলের সব লোক আজ যোগাড় হবে না। অগ্যতা সাঁওতালদের বাজনা আর এক গাঁয়ের ঢাক আর কাঁশী। নাই মামার থেকে কানা মামাই ভাল। যোগাড় যন্ত্র সাজগোছ করতে প্রায় পাঁচটা। মহিলারা শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে ঠাকুরকে উখতে থাতে। একটা ঢাক আর কাড়া, নাকড়া, ধামসা, মাদল ও কাঁসর ঘণ্টায় ধ্বনিতে কংসাবতী তীর প্রতিধ্বনি করে। রামচরণ খুড়ো কালুর বুদ্ধির তারিফ করে। বরং ওদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি হয়েছে ঢাকী ওদের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বাজাতে থাকে। ভালোইলাগে মাইকে মিউজিক। আর এসেছে—প্যাকেট প্যাকেট বোম্ব। ভাসান জমে উঠেছে। শশারা এসেছে একটু আধটু কারণ বারি পান করে। ছেলে ছোকরারা নাচতে শুরু করে। শশার কালী মায়ীকি জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত বনানী, নদীতীর। বিসর্জন যাত্রা শুরু হোল। বুড়োরা বসে রইলো। কি মনে করে কালু পিছন ধরলো, সাথে গোপাল। গোপাল বলে, এটাও মন্দ হচ্ছে না বরং আরো শব্দ জোরে জোরে হচ্ছে। দুজনের কাঁধে একচা ঢাকের মতো যাচ্ছে—আর লোক জোরে জোরে সেটাকে পেটাচ্ছে। বুড়োরা বাদে সবাই থাকে। মাঝপথে

সন্ধ্যানামে। একটু পর পৌঁছে যায় সাঁওতাল পল্লিতে। গাঁয়ের মেয়েপুরুষ ভেঙ্গে পড়েছে গাঁয়ের মাঝে, ঠাকুর নামানো হযেছে, একাটা সাজানো বেদীতে। চারপাশে, আম, নিম, পল্লব দিয়ে, মাঝে মাঝে বুনো ফুল দেওয়া হয়েছে, আর আল্পনা দেওযা হয়েছে। ধূনোর গন্ধে ভরপুর। সাঁওতাল ছোকরা ছেলে, বুড়ো সকলের কি উদ্দাম নাচ, রামদাস রূপচাঁদের মতো বুড়োরা নাচে বাদ্যির ছন্দে ও মাইকের মিউজিকের তালে তালে। মেয়েদের মনের ইচ্চে,— পেলে একবার নাচে। সমস্ত গাঁটা জেগে উঠেছে। আদিম বাদ্যে আর আদিম স্বতঃ স্ফূর্ত আদিম নাচে। মেয়েরা সিন্দুর নিয়ে মাকে—সিন্দুর পরায় বিশাল আনন্দে, উলুধ্বনিতেও যেন কানফেটে যায়। প্রতিটি ঘরের মেয়েরা মিষ্টি দেয়, কদমা দেয়। কেউ টাকা গেঁথে দেয় ঠাকুরের গলার হারে, চূড়ায়। একটাকা —দুটাকা—পাঁচটাকা—এমনকি দশ টাকা নোট। আর শশার দল মিষ্টি গুলো সরিয়ে সরিয়ে নেয়, আর ভাগাভাগি করে মিষ্টি মন্ডা, কদমা খেয়ে নেয়। ঘন্টা দুই নাচ চলে। ওরা নূতন বৃহত জীবনের সন্ধান পায়। দুটো সংস্কৃতি মিশে গিয়ে আরও উদার আরও বৃহৎ হচ্ছে। ওরা ভীষণ খুশী। মহিলারা সিন্দুর দানে ভীষণ পরিতৃপ্ত। ফাগ দিয়ে ওরা পরস্পরকে রাঙিয়ে দেয়। কালুকে খুঁজে বের করে। মেয়েরা কালুর পায়ে আবীর দেয় দুএকটা মেয়ে। বিশেষ করে ঠাণ্ডা মনি মাথায় দিয়ে দেয়। ওর দেখা দেখি কালুকে রাঙিয়ে ফেলেছে আবীরে। গোপালও বাদ যায় না। আর মেয়েরাও আবীরে রাঙিয়ে ফেলেছে। সাঁওতাল ছেলে মরদেরা বাদ যায়নি। ঠাকুর ওদের গাঁ থেকে বের হয়ে ওদের গাঁ ইন্দ্রশোলে হাজির হয়েছে, খয়রা শোল যেন আদিম সৃষ্টির নীরবতায় ছেয়ে ফেলে। সাঁওতাল ছেলে বুড়ো মেয়েরাও ঠাকুরের পিছু নেয়। দারুণ ভীড় হয়েছে। গাঁয়ের প্রধান প্রধান স্থানে দাঁড়ায়। রুল লাইটের আলোয়, মাইকের মিউজিক, আর এরূপ বিশাল আদিম বাদ্যযন্ত্রে সাঁওতাল ছেলেময়ে পুরুষ বুড়োদের ফাগুয়ার আদিম বন্য নাচে আদিম সৃষ্টি মন্ত্র খুঁজে পায়। মহিলারা সিন্দুর পরায় উলুধ্বনি দেয়, ওরা ফাগ খেলে নিজেদের মধ্যে, আর মাকে নাড়ুও খাওয়ায়, আর শশার শিষ্যদের ধ্বনিতে শিহরিত হয়— গোটা গাঁ। কালী মায়ীকি জিন্দাবাদ।" যত রাত বাড়ছে ততই বাদ্যযন্ত্র শব্দ দ্বিগুণ উৎসাহে বেজে চলেছে। শেষে সাঁওতালদের মতোই এই গাঁয়ের ছেলেবুড়ো, বৌ, শ্বাশুড়ী, পুরুষরাও প্রসেশনে যোগ দান করে শেষে কাঁসাই-এর জলে বিসর্জন দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে হৃদয় ভরা অনাবিল আনন্দ নিয়ে। এ গাঁয়ের লোকের চেয়ে ও গাঁয়ের লোকের খুশী আরও বেশী মনে হয়, দীর্ঘ দিন দুটো গাঁয় ছিল যেন মহামিলনের প্রতীক্ষায় ছিল। এগাঁয়ের লোকও কম খুশী নয়। সাঁওতালদের স্বতস্ফূর্ত সামিল হওয়াকে আশ্চর্য্যান্বিত করেছে। ওদের দেখেই এ গাঁয়ের সকলেই মায়ের বিদায় বেলায় সামিল হয়, গোপালের ঠাকুমা, মা, কাকীমারা ভোলানাথ ও ভোলানাথের মা, কালীপিসি, অন্যান্য বয়স্করা রামচরণ, কিংকর, নিতাই খুড়োরা গোপালের বাপ কাকারা, মুরোলিরা ও বংশীরা কিযে খুশী মুখেই বলা যায় না। রামচরণ খুড়ো ও বংশী রীতিমতো কেঁদেই ফেলেছিল। কালীপিসি ও ভোলানাথের মাও কেঁদে ফেলেছিল। গোপালের ঠাকুমা, মা, কাকীমারাও ও অন্যান্য বয়স্কা মহিলাদের চোখে শ্রাবণ ধারা। একান্না বিসর্জনের মাঝে আবাহনের গথ দেখায়, এই বিসর্জনের মিছিল, মহামিলনের হাতছানি দেয়। এই মিলন বৃহতের মাঝে একতার মাঝে জীবনের লক্ষপূরণের পরিপূর্ণতার আশ্বাস দেয়, যা দেয় মনে শান্তি ও এক পরমাননন্দের অঙ্গীকার জানায়। কৃষ্ণা চতুর্দশী

আজ। গোপালদের বাড়ীতে খেয়ে এসেছে। আজও একা। কিছুক্ষণের জন্য বসে নদীকিনারের সেই বেঞ্চটায়। স্তব্দ নিঝুম, মাঝে মাঝে কোকিলের কুহু ধ্বনিও শোনা যায় না। রবি শুয়েছে আটচালায়। বিসর্জনের দিনটা বেশ ভালই লাগলো। শুয়ে শুয়ে বেঞ্চটীতে অনেক কথা মনে হয়। ইন্দ্রশোল আর খয়রা সোল দুটো গাঁ মিশে গেল, বহু দিনের বহু দূরত্বে থাকা স্বত্বেও। ভাবতে যাকে যতনিয়ম ততই বন্ধন আর ততই সে ক্ষুদ্র। আর যেই বৃহৎ নিয়মের বন্ধনকে আলগা করতে পেরেছে তাহলে সেই মহৎও । চোখের সামনে দুই গাঁয়ের মানুষের মিলে যাওয়া। খেতে বসিয়ে গোপালের মা কাকীমারা কালুর ভীষণ প্রশংশা করে। ভালও লাগে প্রশংসা আসার সময় শিবুদা ও দিদির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসে। এলো মেলো ভাবনা বারবার আঘাত করে যাচ্ছে। হঠাৎ গাঁয়ের দুর্গাপুজোর কথা। বিশেষ করে বিসর্জনের দিন। বিজয়া যে কি তখন বুঝতুম। তখন নয় বছর ও অতিক্রম করিনি। তখনই নাচতে নাচতে সারা গাঁ ঘুরতুম। চোখের জলে কাঁদতে কাঁদেতে ফিরে আসতুম বিছানায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঘুম ভেঙ্গে যেত খুব ভোরে। কারণ ছিল আর কিছু না, ভোরে নদীর স্রোতে দুর্গা ঠাকুরের ডাকের বাহনা সংগ্রহ করতে। পাড়ার কয়েকটা ছেলে সাথে থাকতো। নদীর স্রোতের সাথে ছুটে ছুটে ঐসব অলংকারের পিছনে ঘুরতো। যদি একটা কিছু পেতো আটকে যাওয়া ঘাস, আবর্জনার আড়ালে। মনে হত সাত রাজার ধন। প্রতিযোগিতা চলতো নদীর স্রোতের সাথে। প্রতিযোগিতা হোত সমবয়সীদের সাথে। এটা ছিল একটা নেশা। চোদ্দ পনেরো বছর পর্যন্ত সে অভ্যাস পরিবর্তন যায়নি। একবছরের স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি। একবছর হয়েছে কি নদী থেকে ফিরে কি কারণে ডাক নিয়ে নাড়ুর সাথে ঝগড়া বাধে। বাবা তখন আমাকে বলে ঝগড়া করলে, কোটুম এলে বলবে তোদের দুজনকে ঝুলিতে নিয়ে যেতে। ঝগড়া বেলা পর্যন্ত থামেনি। হঠাৎ হরিবোল শব্দ শোনা যায়। আর মিলে যায় সেই ভয়ের প্রতিমূর্ত্তির সাথে। গোলগাল চেহারা, একটা ঝোলা পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীটা পা পর্যন্ত লম্বা। আর পাঞ্জাবীর সমস্তটাই লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, যা যা রং পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে কিংবা হয়নি সেসব রংও তার পাঞ্জাবীতে থাকতো বিসদৃশভাবে তালি দিয়ে সেলাই করা। আর হাতে বড় বড় বালা। গলায় থাকতো বড় বড় কাঁচের আকৃতির লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন রংয়ের একগাদা মালা। জটাটুট সাদাকালো লম্বা চুল। দাড়িতে মুখ ভর্ত্তি। ফোলা গাল। রং চিকন কালো। শুধু মুখের চোখ গুলি ছিল ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি। আর ঝুলিটাও ছিল তেমনি বড়। সেলাই করা কাথা দিয়ে তৈরী ঝুলিটা। ঝুলি হাঁটু পর্যন্ত ঝুলতো। হাতে একটা চিমটে। হাতের স্পর্শে চকচক্ করতো তলোয়ারের মতো। এহেন লটবস্টুমকে দেখে ভিরমি খাবার উপক্রম। কোন উপায়ে আমরা দুজন আঁধার কোঠায় আশ্রয় নিয়েছিলুম। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে, দুসারি বাক্সোর মাঝে লুকিয়েছিলুম। আঁধার কোটা এতো আঁধার যে লণ্ঠনেও দেখা যেত না ঘরের সামগ্রী। ঝোলাটার কথা মনে পড়লেই জীবনটা বেরিয়ে পড়তো। মনে হোত ঝোলাটা কম করে গোটাপাঁচেক ছেলে ওতে যেতে পারবে। লটবস্টুমের বয়স কম করে সত্তরের কোঠায় হবে। বাবাকে ভাবতুম বাবাটা কিরকমই বোকা, না হলে ঐরকম একটা ছেলেধরাকে নিয়ে কী গল্প করে। আবার —চাও খাওয়ায়। বাবা ও ছেলেধরাটাকে নিয়ে কি করে গল্প করে কিছুতেই বুঝতে পারতুম না। বাবাকে

বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও বাবা কোনদিন শুনতোনা। বাবাকে ভীষণ রাগও হোত। কিন্তু সেদিন আমরা সেই আঁধার কোঠার রুদ্ধশ্বাসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বিসর্জনের রাতে নেচেছি, একটু রাত করে ঘুমিয়েছিলুম। সেদিন ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মুড়ি খাবার সময়। বেলা ১০টার সময় বাড়ীর লোকের খেয়োল হয়। মা তখনও ভেবেছে কোথাও খেলা করতে গেছে। আধঘণ্টা বাদে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কোথাও পায় না আমাদের। সকলেই মিলে আমাদের বন্ধুই বল আর খেলার সাথী সকলেই জিজ্ঞেস করে আমাদের ব্যাপারে কেউ বলতে পারে না। এরপর জোর দিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কোথাও আমাদের দেখা মেলে না। মায়ের চোখে জল। কিছুক্ষণ পর মা আর জেঠি কাঁদতে বসেছে। পুকুর ঘাট খোঁজা হয়েছে। নদীতে বেশী জল নেই, তবুও নদীতেও একবার খোঁজা হয়। ততক্ষণে গোটা গ্রামে জেনে গেছে। দুটো ছেলে বেপাত্তা। বাবা ও জেঠা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। দাদারাও এখানে সেখানে খুঁজে এসে জানায় কোথাও কোন কিছুর খবর নেই। একসময় একজন মেয়ে মানুষ বলে ঘরটা খুঁজে দেখতে। শোবার ঘর দেখা হয়েছে। অবশেষে পিসি লণ্ঠনহাতে আঁধারকোঠায় উঠে আমাদের আবিষ্কার করে। আমরা তখনও ঘুমে অচেতন। আমাদিকে উঠিয়ে নীচে নিয়ে যায়। আমাদের দেখতে তখন ভীড় জমে গেছে। আমাদের গায়ে মাথায় ধুলো মাকড়সার জাল গায়ে চিটিয়ে রয়েছে, টিকটিকি ও ইঁদুরের গু। আঁচল দিয়ে মা আমাদের গা ঝাড়ে পরে চুমো খায়। তখনও দেখতে পাই মা ও জেঠিমার চোখে জল। মা তো একবার একচোট নেয়—ঐ বোস্টমটাকে নিয়ে এত গল্প করার কি আছে, দেখলে ছেলেগুলো ভয়ে মরে যায়।

বাবা সাড়া দেয় না। চুপচাপ থাকে। সেদিনের স্মৃতি ভিড় করে আসে। লট বস্টুমের কথা আজও চোখ বুজলেও দেখতে পাই । কি বিকট কি অদ্ভুত চেহারা ও সাজ সজ্জার মানুষ। পরে অবশ্য বছরখানেক পর ঐ লটবস্টুম মারা যায়। মৃত্যুতে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। কিন্তু স্বপ্নে এই মরা বাঁচার খেলা প্রায় পনেরো যোল বছর পর্য্যন্ত চলেছিল। আস্তে আস্তে স্মৃতিটা মুছে যেতে থাকে। তবুও আজও মানসপটে এখন জ্বল জ্বল করে ওঠে — সেই বিভীষিকার প্রতিমূর্তি। যেমন, এই কৃষ্ণা চর্তুদ্দশীর রাতেও দেখতে পাচ্ছি। তবুও এখন ভাল লাগে ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে। একবার মরা একবার বাঁচা। মরা এবং বাঁচার মাঝেই কিশোর জীবনের সন্ধান পেতুম। জীবনের সাথে যে জড়িত তাকে কি ভোলা যায়। না হলে এই মহাশ্মশানে নির্জন নদীতীরে কেনই বা মনে পড়ে।

আজ কালীপূজা সকলেই এসেগেছে মনাদের মেয়েরা। ওরা হাঁকডাক করে ন্যাতা দিতে শুরু করেছে, এখন সব আসেনি। আসতে দেরি হবে হয়তো। ওদিকে বলা হোল, আগের কালীমায়ের স্থানটা ভালকরে ন্যাতাটা দেওয়া হয় যেন। ওখানেই থাকবে জিনিষপত্র। ওরা প্রথমেই ঐ ঘরটা পরিশকার করে। রবি এদিকে নূতন মন্দির ধুয়ে মুছে শেষ করেছে, যারা দেখেনি, তারাও খুব খুশী মন্দির দেখে । ওদের বাস্তবের সাথে মিলছে না। ওরা বেশ যত্ন সহকারেই ন্যাতা দিচ্ছে, হাঁসি মস্করা করছে, তাদের মধ্যে কখনও রবিও যোগ দিচ্ছে। একে একে ভোলানাথেরা আসছে। গেট ও মন্দির টুনি বালব্ ও নানা রকম আলো দিয়ে

সাজানো হবে। গোটাচার মিস্ত্রি লোক লেগে পড়েছে। সন্ধ্যের আগেই আলোর খেলা দেখা যাবে। দুপুরের পর নিস্ত্রি হাজির ঠাকুর সাজানো হবে। অনেকগুলো ছোট ছেলে তাকে ঘিরে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য মহাশয়ও হাজির হয়েছেন। গ্রাম থেকে মাথায় কড়াই গামলা আসছে। সাঁওতালদের মেয়েরা পাতা দিয়ে গেল আর দু চোখ ভরে দেখে গেল মন্দির। পুরোনো ঠাকুর ঘরে গতকালের বাজার সরিয়ে রাখা হোল। রবি মন্দিরের ভেতর টা পরিস্কার করে জল দিয়ে ধুয়ে দেয়। বদী ভট্টাচার্য্য — ভোলানাথের দিকে তাকিয়ে বলে, একি তোমরা করেছ! ভাবতে পারছি না কেমন করে সম্ভব। বুঝলুম—একতাই বল—এতদিন পড়া ছিল আজ কাজে দেখলুম। সকলেরই বুকের ছাতিগুলো আধহাত উঁচু হয়ে ওঠে। উনি চাকদিক ভালোকরে ঘুরে দেখলেন এবং বার বার তারিফ করলেন। শুকনো কাঠ একেবারে বন থেকেই আসছে। বনে কাঁচায় কাঁচায় ফেড়ে ঠিক করে রাখা ছিল, শুকনো হয়েছে ভালই, প্রচুর কাঠলাগবে। কাঠগুলো রাখা হচ্ছে উনুনের সামান্য দূরে। মাইক সকাল থেকেই চলছে। কালুর নির্দেশে হিন্দি গানের পরিবর্তে বাংলা আধুনিক পল্লীগিতি শ্যামাসঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানো হচ্ছে। সুরের মূর্ছনায় ভেসে যাচ্ছে শারাটা প্রান্তর। চারখানা ঢাকও হাজির। গম্ গম্ করে ওঠে সমস্ত পূজা প্রাঙ্গণ। মন্দিরের ভেতরটা ঢুকে ভটচার্য মশায়। সঙ্গে ভিতরটা গম্‌গম্ করে ওঠে। বদী ভট্টাচার্য্যি খুব খুশী। মন্ত্র পাঠ করে আনন্দ পাওয়া যাবে। এক কথায় বেশ প্রতিধ্বনি দর্শন হচ্ছে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, চারজন মিষ্টি তৈরী করার লোকও হাজির হয়েছে—রাইপুর থেকে। যারা নিজেরাই স্বতস্ফূর্ত হয়ে আসতে চেয়েছিল। একটু পর আরও জনচার হালুইকর হাজির—যারা গাঁয়ের পাশাপাশি থাকে। আশ্চর্যের কথা কেউ একটা পয়সা নেবে না। রাতভোর খিচুড়ী চাপবে। রাতেই তরকারী কেটে রাখতে হবে। মেয়েদের বলা হয়েছে পূজোর সময় বঁটি আনতে। পাচকেরা বলে— শুনছিনু দারুণ মন্দির হয়েছে বটে এতটা ভাল আশা করিনি গোপাল ডাক দেয় কালুকে, জানায় ওরা আসছে। বুঝতে পারে শিবুদারা। দিদি লেডিস সাইকেলে, ভাগনে এসেছে লেডিস সাইকেলে। ওরাও মন্দির দেখে পুলকিত ওরা কালুর আশ্রমের দিকে যায়। কালু বসতে দেয়। মিষ্টি জল দিতে চায়। ওরা জল খেতে চায় না। দিদি আর ভাইঝি ছায়ার জায়গাটা ভীষণ ভাল লেগে যায়। ওরা বসে সেই বেঞ্চটায়। ওরা ক্লান্ত। দখিনা বাতাসে একটু জিরিয়ে নেয়। গোপাল তাগাদা দেয় বাড়ী ফিরতে, তানাহলে সাইকেলে যেতে অসুবিধে হবে। ওরা জানিয়ে যায় পূজোর আগেই আসবে। পৌঁছে যায় ওরা গোপালদের বাড়ীতে। ওরাও আহ্লাদে আটখানা। শরবত দেয়। মিষ্টি জল দেয়। কেজি খানেক মিষ্টিও এনেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিচিত হয় গোপালদের সকলের সাথে, গোপালদের বাড়ীর পরিবেশ যেন সকলকে আপন করে নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। গোপালদের বাড়ীতে কুটুম এসেছে অনেকেই। গোপালের শালী এসেছে। ছোটকার শ্বশুর শ্বাশুড়ী এসেছে, আর এসেছে দুই বোন, আর জামাই, ভাগনে ভাগনিরা পিসিমা আসতে পারেনি। কথায় কথায় কালুও মন্দিরের কথা এসে যাচ্ছে।

এদিকে মন্দিরের লাইট ফিট হয়ে গেছে। ডায়নামো চলছে একটা মারকারী লাইট দেওয়া হয়েছে—আলোয় আলোকময়। এরপর গেটে ঘুরছে আলোর চাকা মাঝে একবার আলোর কালীমূর্ত্তি হচ্ছে আর নিভে যাচ্ছে। আর গোটা মন্দির আটচালা উপরে চূড়ায় কার্নিশের

বোর্ডারে টুনি বাল্‌ব আর মন্দিরের ভিতরে কুল লাইটে নানান রং এর গেট করা হয়েছে। কালীমন্দির গেটে টুনিবালবের মালা জ্বলছে আর নিভছে। ছেলে বুড়ো যে দেখে, সেই হাঁ হয়ে দেখে। ঘোর অন্ধকার পথে আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে উদ্ভাসিত করে চলেছে কালের অনন্ত প্রবাহে। ঠাকুরকে বেদীতে আনা হলো। শূন্য মন্দির যেন ভরে গেল মুহুর্তে। নাপিত পূজার জিনিষপত্র গোছাচ্ছে। রাত আটটায় অমাবস্যা পড়বে। আটটার পর পূজোয় বসা হবে। তার আগে প্রস্তুতিপর্ব। ভোলানাথ মুরালি, গোপাল, বংশীরা আর জন কয়েক যুবক বন্দের কাজের তদারকি করছে। একদিকে গোপালের বাবা, কাকারা, আর রামচরণ খুড়োরা তো আছেই আছে শশারা অনেকেই। এসে পড়েছে টাকা ও কালোপাঁঠা সহ রাম চাঁদেরাও। মেয়েরা পূজো আনছে পরে। বন্দের রস দুটো কড়াতেই চেপেছে। বলির খুঁটো প্যোঁতা হয়েছে আটচালার পরে একটু দুরে। যাতে মা সোজাসুজি দেখতে পায়। কলাগাছ ও পঞ্চবজিরে সাজাতেও ভোলেনি এত সজ্জার পরও । প্রায় পূজোর সামগ্রী যোগাড় হয়ে গেছে। ব্যান্ডপার্টি হাজির ওরা বাঁশীতে গান ধরেছে রামপ্রসাধী আমার সাধনা মিটিল আশা না পূরিল..... আশ্চর্য এরাও কিছু পয়সা নেবে না। বন্দের রস ফুটছে। ফাঁটা হচ্ছে বেসন। এরপর ডালডা চাপবে। ঘন্টা খানেক পর ডালডা চাপে উনুনে, ঠাকুর আনতে যায় কংসাবতীতে। গোপালের বউ ছোট কাকা, ভোলানাথের ছোট ভাই আর বংশী ঘট আনতে যায় সাথে কালু; ভট্টাচার্য মশায় সাথে অগনিত মহিলা পুরুষ। চারটে ঢাকের সাথে ব্যাণ্ডপার্টি আর কাঁসর ঘন্টা, শঙ্খধ্বনি, আর পটকার সঙ্গে জেগে উঠেছে নাদী, প্রান্তর,—বনানী, মহাশ্মশান। এই মহাধ্বনি কংসাবতীর তীর বার বার অনুরনিত হয়। গোটা গাঁয়ের বাড়ীতে কে পাহারায় আছে ভগবান জানে, গা উজাড় করে এসেছে। শব্দের ঐক্যতানে, আলোর ঝলকানিতে, মানুষের জনারন্যে যারা এসেছে যারা অগে আসেনি সকলেই তাজ্জ্ব বনে যায়। সকলেই খুশী, মায়ের মন্দিরে আগমনে। পুজো শুরু হবে আর একটু পরে, এদিকে, ডালডার গন্ধে ভর্ত্তি সমস্ত প্রাঙ্গন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্দে ছাঁকা দেখছে অনেক দর্শক। চোখে মুখে খুশীর আমেজ। বড় বড় মাটির টাঁটিতে প্রায় কেজি খানেক চাল, মণ্ডা আর একটা টাকা প্রত্যেক টাঁটিতে এই ষাটটা হচ্ছে সাঁওতালদের। বাকি সব গাঁয়ের, হারিয়ে বা গোলমালের ভয়ে অচল খড়ি দিয়ে নাম লিখে দিচ্ছে। গোটা মন্দির ভর্ত্তি পূজোর উপাচারে। শেষে একটা ছোট গামলায় এক গামলা বন্দে এলো। ঢাকীরাও এসেছে। পূজো বসতে দেরী নেই। শেষে একবার ছাগলের খোঁজ হয়। চারটে কাল পাঁঠা ছাগল দিব্বি পাতা খাচ্ছে।

পূজো আরম্ভ। মহিলারা গলবস্ত্র হয়ে বসেছে বাকি সব দাঁড়িয়ে আটচালা ও মন্দিরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। সমস্ত দর্শক এক হয়ে গেছে। দুটো গাঁয়ের মানুষের যেমন সীমারেখা নেই তেমনি সীমারেখা নেই বামুন কায়স্থ কুমর গোয়ালা, মুচি, বাগ্দি, বাউরী সাঁওতালদের। উৎসবের মাঝে সব এক। এখানেই উৎসবের সার্থকতা, এবং সকলেই একমন একপ্রাণ। ধূপের ও ধুনোর গন্ধে — ভরে উঠেছে। পূজা শুরু। বদী ভট্টাচার্য মহাশয় মন্ত্র পাঠ করছেন, কালু মন্ত্র বলে পূজা করছে। পূজোর মন্ত্রের প্রতিধ্বনিতে এক আশ্চর্য নীরাবতা বিরাজ করছে, সূঁচ ফেললেও শোনা যায়। মন্ত্রের অনুরননে সকলেই শিহারিত। মাইকে মন্ত্রপাঠ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত মন্ত্র শুনছে। হোম হবে এবার পাঁচপোয়া

ঘিয়ের। হোম শুরু হয় মন্দিরের বাইরে আটচালায়। বালির পুরো আস্তরণের উপর। ঘিয়ের সুবাসে আমোদিত হয় চারিদিক। হোম ও শেষ। এবার বলি হবে। আরও তিনটে পাঁটা এসেছে। নদীর ওপারের নিকটবর্তী গাঁ থেকে। ওদিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁঠা ফেরৎ হবে না। ওরা কিছু আপত্তি করে না। ওদিকে আগামীকালের সারাদিন ও রাতের নিমন্ত্রণ, গোটা বাড়ীর। ওরাও জানায় পাঁঠা ফেরৎ হবে না জেনেই এসেছে। ওদের বাড়ীর কেউ না কেউ স্বপ্ন দেখে কালীপুজোর দিন বলিদিচ্ছে। বরং ওরা নিমন্ত্রেনে খুশী। একটু দূরে আরএকটা ছাগলের শব্দ শোনাগেল। দেখা গেল বুদো কুণডু একটা পাঁটা নিয়ে আর একটা বড় সিমেন্টের মাড়োয়ারির দোকানীর ওরাও একই স্বপ্ন দেখেছে। ওরা আগেই জেনেছে নিয়ম। নয় নয় করে নটা হাজির। নটাই কালো। কি আশ্চর্য। বলি শুরু হয় ও শেষ হয় অসীম ভক্তিতে। হোমের তিলক চলছে চার-পাঁচটি মেয়ে ও চার-পাঁচটি ছেলে তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েরা মেয়েদের, পুরুষরা পুরুষদের। উচ্চবর্ণ মহিলারা অক্লেশে নিম্নবর্ন মহিলাদের যজ্ঞটিপ পরিয়ে দিচ্ছে, সাঁওতাল রমনীরাও বাদ যায় না। বর্ণের সীমারেখাও যেন হারিয়ে গেছে। খয়রাশোলের প্রতিটি লোক উদ্দীপ্ত হয় ভক্তিতে, আনন্দে আবেগে। পূজা শেষ। অনেক রাত হোল প্রায় এগারোটা হয়ে যাবে। কয়েকটি ছেলেকে নির্দেশ দেওয়া হোল থালার মিষ্টির প্রয়োজন নেই একটা করে গঞ্জের ভোগের জন্য নাও। আর প্রত্যেক থালা, রেকাব আর টাটিতে এক ডাবু করে বন্দে দিয়ে দাও। চালের একটা রাশ হয়ে গেল। টাকাতে একটা বড় থালা ভর্ত্তি হয়ে গেল। নির্দেশমতো কাজ হয় আর গঞ্জের ভোগ দেওয়ার— শেষে, বলা হোল প্রসাদ নেবে আর বাড়ী যাবে। প্রসাদ নেয় আর বাড়ী ফেরে। ফিরতে ফিরতে দেখে আলোর কারসাজি। অপূর্ব লাগে আলোক সজ্জা। মনের মাঝেও এক অপূর্ব প্রশান্তি। একটা হ্যাজাক দেওয়া হোল সাঁওতালদের। অনেক পুরুষ থেকে গেল। থেকে গেল যারা বহিরাগত। বুদোকুণ্ডুরা ও মাড়োয়ারীর লোকেরা প্রশংশা করে সবজিনিষের। বুদোকুণ্ডু জানায় কাল পূজো শেষ করে পরের দিন ফিরে যাবে। এতবড় সুযোগকে ছাড়ে কেউ। যারা এখানে থাকবে তাদের জন্য ভাত চেপেছে—এক কড়াই, আর —তরকারী আলু পোস্ত। মুরালি বলেছিল বুদোকুণ্ডুদের বাড়ী যেতে। বুদোকুণ্ডু রাজী হয়নি বললে মন্দিরেই থাকবে। পাশের গাঁয়ের ওরাও থেকে যাবে। পটুরা, শশাঙ্ক মনারাও আছে— অনেকে। ফাইফরমাস খাটার জন্যে। বুদোকুণ্ডুকে দেখভাল করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ও এইসব কাজের দেখভালে পটু। ও খুশী হয়ে রাজী হয়। বুদোকুণ্ডু নির্দেশ দেন, ভাত খাবার আগেই তরকারী কেটে ফেলতে হবে। রাতভোর খিচুড়ি চাপবে, সাড়ে তিনচার হাজার লোক খাবে। তা না হলে বারোটার আগে খেতে বসাতে পারা যাবে না। বাইরের গাঁয়ের যারা এসেছে তারাও কাজে লেগে পড়েছে। ওদের ভাল লাগছে। এদের আপ্যায়নে ও অনুরোধে। কাজের মধ্যে এরাও একাত্ম হয়ে গেছে। ভাত হতে কয়েকজন হালুই করও লোককে খেয়ে শুয়ে পড়তে বলে। ওরা কাল ভোর ভোর কাজে লাগবে। এদের কাজ হতে রাত আড়াই তিনটে হবে। এরা শোবে আর ওরা উঠবে। এখনও সাঁওতাল নাচ শেষ হয়নি। কখন শেষ হবে কে জানে।

সকাল হয়েছে কাজ দ্রুত গতিতে আগোচ্ছে। ছাগলের ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। বুদোকুণ্ডু হুকুম দেয় মাংস প্রসাদ ভাল করে কষে রান্নাকরে কুমড়োর বনালে মিশিয়ে দেওয়া হবে।

আগে খিচুড়ি ও তরকারী দিয়ে পূজোহলে তবে ভোজন আরম্ভ। কিছু খিচুড়ি ও নিরামিষ তরকারী রাখতেই হবে। তিনটে বড় বড় গামলা ঠাসা বন্দে হয়েছে। রং হয়েছে খাসা রং দেওয়া হয়নি, কাঁচা সোনার রং ধরেছে। পূজোতে বসা হয়েছে। সকালের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়েছে সাঁওতাল মেয়েরা তারপর মনের মতো করে ন্যাতা দিয়েছে। শুকিয়ে গেছে, অপূর্ব লাগে পূজা প্রাঙ্গন শুচিতায় একাট প্রতিমুর্ত্তি মনে হয়। মাইকে আবেদন চলছে দুপুর বারোটায়। বুদো কুণ্ডু বাড়ীর লোকজনদের আনতেএকজন লোক গেছে। সম্ববত মাড়োয়ারীরাও আসবে। ওরা আসবে মোটর গাড়ীতে। যে গাঁয়ের লোকেরা পাঁঠা নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে দু-একজন বাড়ী গেছে। পূজোকমিটির লোকেরা জানিয়েছে রাতে খাওয়ার পর বাড়ীফেরার দরকার নেই। ওরাও স্বাগত জানিয়েছে। ভিন্ন গাঁয়ের লোকেরা রীতিমত এই কর্ম্মযজ্ঞেও জড়িয়ে দিযেছে নিজেদের। এক ঝাঁক মহিলা বালতি ঢাবু হাতে হাজির, আগে কালীপিসি। পূজোয় বসেছে কালু। খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়েছে। দিদির সাথে চোখে চোখে কথা হয়।" কোন অসুবিধে হয়নিতো"— জানিয়েছে "না"। প্রাঙ্গন ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। সকলেই সেজে গুজে আসছে। সাদা কাপড়ে সাঁওতাল রমনীরা। মহিলারা পরিবেশন করবে। পূজো শেষ হয়। পূজোর প্রসাদ মিশিয়ে দেওয়া হয়। এবার বসানো হচ্ছে। মাইকে বসতে বলা হোল। মুরালী বংশীরা....বসিয়ে দেয় কয়েকটা লাইনে। মেয়ে পুরুষ ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ি। ছোট জাত বড় জাত সকলেই পাশাপাশি। কোন ছুঁই ফিতের বালাই নেই। লাইন ভাগ করে খেতে দেবে। কেউ কার লাইনে যাবেনা। আটচালায় কয়েকজন প্রবীন ....খুড়োরা ও ভোলানাথেরা। ভোলানাথের হাতে মাইক। আটচালা হতে বেশ সুন্দর আটটা উনুনেই জল গরম আছে অবস্থা দেখে ব্যবস্থা নেওযা হবে। গোপালের মা, কাকীমারা ভোলানাথের বউ ও ভাই বৌএরা আর মুরালির বংশী আর খুড়োদের বৌ ঝিরা সর্বাগ্রে তার সাথে আরও অনেক মহিলা লেগে পড়েছে। কালুর দিদি ও দিদির সাথে মেয়েটিরও কম উৎসাহ দেখছি না। মেয়েটি কলেজে পড়ে। কালু বসে আছে কালীর মায়ের কাছে আসনে। সেখান থেকেই যা দেখার দেখছে। সেখান থেকেই মোটামুটি দেখা যায়। মাইকে ঘোষণা হোল পাতা দেওয়া হলে, খিচুড়ী ও তরকারী পড়লে সকলে মায়ের সাথে জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু হবে ভোজ। প্রায় গোটা চল্লিশ প্রাণচাঞ্চলে ভরপুর মহিলা শুরু করে পরিবেশন। মহিলাদের মাধে যদি কিছু আড়ষ্টতা ছিল, সেটা কাটিয়ে ওরা পূর্ণপ্রাণ চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঝর্ণার মতো ঝরঝর কলকল্ বেগবতী। ঐ বেগে পরিবেশনের কোন সমস্যা তো হচ্ছেই না বরং আরও সুন্দর ঝর্ণা ধারার মতো। দেখা গেল শেষ হয়েছে তরকারী দেওয়া। রামখুড়োকে ডাকা হোল। খুড়ো আসতে চায় না। খুড়ো প্রবীণ বদীভট্ট্রাচার্য মহাশয় কে ডাকে। ভট্রাচার্য মহাশয়। কালীর স্ত্রোত্র পুলকিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে......।

শেষে—কালীমায়িজী কি জিন্দাবাদ" তিনবার ধ্বনি দেয়। ভোজনার্থীরা জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলে। কালীমাতার জয় ধ্বনি শিহরণ তোলে পূজাপ্রাঙ্গন ছাড়িয়ে, বনানী, নদীতীর ছাড়িয়ে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিতে অনুরণন্ তোলে। তারপর হাপুস হুপুস। হাপুস হুপুস আর হাপুস হুপুস। ভোলানাথ জিজ্ঞেস করে কেমন হয়েছে। সকলেই একসাথে দারুণ। আরও জানায় দারুণ হয়েছে তরকারি। মহিলারা ছন্দ তোলে চুড়ির তালে, কথায়, ঢাবুতে, আর

গল্পে। মনে হয় স্বয়ং একঝাঁক মা অন্নপূর্ণা হাজির হয়েছে। এই বেশে মহিলাদের বেশ মানায়। অমল আর গুনছে কতজন বসেছে। প্রথম ব্যাচে এক হাজার পয়ত্রিশ। মাইকে বলা হোল প্রত্যেকে নিজেদের পাতা তুলে নিতে। আর বলা হোল পরিস্কার করে খেতে। অযথা যেন নষ্ট না হয়। আরও বলা হোল ঝাঁট দেওয়া হলে পরবর্ত্তী ব্যাচ বসবে। জয়ধ্বনি শেষে ওরা খাওয়া শেষ করে। ঝাঁট দেওযা লোক ঠিক ছিল না দেখে গোপালের মা ও ভোলানাথের স্ত্রী নির্দেশ দিল নিজের নিজের লাইন পরিস্কার করে নিতে। ওরা নিজেরাও কাজে লাগে অপরেরা ও তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে পড়ে। আর ততক্ষণাৎ পরিস্কার হয়ে যায়। সকলেই সাবাস জানায়। আবারহাত পা ধুয়ে পরিবেশনে রেডি। দুটো ট্রেকার থামলো, ওরা রাইপুর থেকে এসেছে, মুরালি গিয়ে আপ্যায়ন করে নিয়ে এলো, বসায় আটচালায়। ওরাও সবকিছু দেখে তাজ্জব। ভোলানাথের মা ও গোপালের ঠাকুমা মেয়েদের সাথে কথা বলে। কালীপিসি যেন প্রধান সেনাপতি। তিনটে ব্যাচ শেষ হোল। পরের ব্যাচে শেষ হোল। বহিরাগত নিরামিশারাহীদেরও যথাযথ পরিবেশন করা হোল, সকলেই তৃপ্ত। এদিকে কয়েকজন যুবককে নিয়ে লুচির ময়দায় জল দেওয়া হয়েছে। প্রায় ব্যাচের খাওয়ার পর কয়েকজন উৎসাহী মহিলা ও চাকতীবেলনা সহযোগে কাজের অপেক্ষায় ছিল। লুচির কড়াই চেপেছে। বেলা চারটা বাজছে আর দেরী নয়। দেরী হলে অসুবিধে হবে। প্রায় চার হাজার লোক খেল। এখনও এক কড়াইয়ের মতো বেড়ে আছে। আর রাঁধতে হয়নি। শেষে খেতে বসেছে পরিবেশন কারিণীরা। ওরা যেন আনন্দে নেশা গ্রস্থ। কত কথায়, কত হাসিতে শেষ ওদের খাওয়া। সকলেই ভয় খেয়েছিল, আবার বুঝি খিচুড়ি চাপাতে হবে। তা হয়নি। সকলেই মায়ের অশেষ করুণার কথা বলে। রাধুনিজির হাতযশ নিয়েও প্রশংসা হয়। সকলে বলেছে কুমড়োগুলোও যেন মাংসের মতো হয়েছে। ওদের সাথেই বসে, ভোলানাথেরা, খুড়োরা ও বুদোকুণ্ডু ও রাইপুরের থেকে আগত অথিতিবৃন্দ। সকলেই রান্নার তারিফ করে। রাইপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সকলকেই বলা হয়েছে—রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে এখানে থেকে কাল বাড়ী যেতে। সকলেই রাত পর্যন্ত থাকবে বলেছে। শিবুদা লুচির কাজে লেগে পড়ে। বুদু কুণ্ডুর মতে যা দেখা গেল, রাতটা কিভাবে পার হবে মাই জানে। তবে কোথাও এতুটু বিশৃঙ্খলা নেই।

ভোলানাথ—মাইভরসা।

রামচরণ খুঁড়ো—মহিলাদের প্রতি ভীষণ খুশী—ঝাঁটা ধরে পরিস্কার করে তাৎক্ষনিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য। নীচু জাতের মহিলা পুরুষ দেখল পরিবেশনকারীরা কত উন্নত মনের। মাড়োয়ারী পাহাড়ীর মা—একটু সহজ হয়েছে। তিনি ও এখানের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে ভীষণ খুশী। বুদোকুণ্ডুর মা ও মাড়োয়ারী বৃদ্ধার ইচ্ছা যতদিন বাঁচবে ততদিন পূজাতে এখানে আসবে। বিশেষ করে বুদো কুণ্ডুর স্ত্রীর ইচ্ছা কেউ না এলেও তারা স্বামী স্ত্রীতে আসবে। গল্পে ওরা এদের সাথে মিশে গেছে। খাওয়া শেষ হয়। একটু বিশ্রাম করে। প্রায় চারটে বাজে। ওখানে লুচির কাজ চলছে। গিয়ে বুদো কুণ্ডু জানায় প্রয়োজন হলে জনা দশেক বাড়ী গিয়ে ফিরে এসো, চাকতি বেলনা নিয়ে। অনেকেই আসবে জানায়। খাওয়া শেষে বাইরের গ্রামের মহিলারা, ও রাইপুরের মহিলারা, ভোলানাথের মা ও গোপালের ঠাকুমার সাথে যায়। মা ও ঠাকুমারা ওদের সাথে জীপেতেই যায়। অনেক বার মাইকে

জানানো হয়েছে বিকাল থেকে গতকালের মতো খয়রাশোলের লোকেদের নৃত্য শুরু হবে। এরই মধ্যে ওরা আসতে শুরু করেছে। মাইক ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। শশারা ভাষণ খুশী— শশা পেয়েছে তিনটে, রতন দুচো, মনা দুটো, আর রূপচাঁদেরা দুটো ছাগলের চামড়া। আরও খুশী আজকের ভোজ ব্যবস্থায়। দেখা গেল বাড়তি এক হাজার খেয়েছে হিসাবের বাইরে। কম কথা একটুও ঘাটতি পড়েনি। রাতে মুগের ডাল, কুমড়োর তরকারী হবে। কাজ চলছে পুরোদমে। এবার তরকারী সম্পূর্ণ নিরামিশ। যদিও এখন বেশ কিছু তরকারী আছে। বুদোকুণ্ডু কয়েকজনকে রেখে দিল, তরকারী কাটার জন্য। দুটো কড়াইতে ছাঁকা হচ্ছে। লুচির কোয়ালিটিও দারুন হচ্ছে। হাফ্ হাফ্ আঁটা আর রুল। সাতটার মধ্যে সব কমপ্লিট করা চাই। মুরুব্বিদের সাথে আলোচনা হয় কত লুচি ভাজা যাবে। বুদোকুণ্ডুর মতে চারবস্তাই যথেষ্ট। সংশয় প্রকাশ করে অনেকে। বুদোকুণ্ডু ও গোপালের বাবার মতে রাতে বেশী কিছু খেতে পারবে না। তাছাড়া বন্দেও যথেষ্ট আছে। মালতো রেডি্ আছে। দরকার হলে আরও কেজি কুড়ি বাড়িয়ে দাও। এটাও আলোচনা হয়। কাজ ছাড়লে আবার লোকজন পাওযা মুস্কিল হবে।

বুদোকুণ্ডু — ভোলানাথ দা তোমরা একটা কাজের কাজ করেছো। মন্দিরটাও হয়েছে খুব সুন্দর। এতল্লাটে এরকম মন্দির নাই।

ভোলানাথ —সবাই তো বলেছে সুন্দর হয়েছে। তোমরা পাঁচজনে ভালো বললেই ভাল।

কিংকর খুড়ো—সবই মায়ের ইচ্ছে। বুদোকুণ্ডু—ঐ ধাপ গুলোতেই মন্দিরটাকে অনেক সুন্দর করেছে। গোটা মন্দিরটাই তিনটে ধাপ, তাতে রথের মতো লাগছে।

ভোলানাথ—প্ল্যানট্যান কিছুই না, মিস্ত্রীরা আর আমরা। তবে কালুভাই এই ধাপের ব্যাপারে বলেছিল। সত্যি ছেলেটার দূরদৃষ্টি আছে।

রামচরণ খুড়ো দূর দৃষ্টি না থাকলে হয়।

বুদোকুণ্ডু—কালুটি কে?

ভোলানাথ ও বাব্বা! তুমি জান না। ওই তো আসল। দেখলে কেমন পূজোও করলে। ওর গুণের শেষ নেই। পূজোর চাল পয়সা কিছুই নেয় না। বলে ঐ টাকায় গায়ের লোকদের বন্দে মিষ্টি খাওয়াবে পূজোতে। আর নিজে ভিক্ষে করে চালায়। শুধু নিজের নয় রবিকেও খাওয়ায়।

কিংকরখুড়ো— সাংঘাতিক ছেলে।

বুদোকুণ্ডু — মুরালিভাই, বংশীভাই—কাজের চেয়ে গল্প বেশী হচ্ছে। হাত চালাও

রামচরণ খুড়ো—তুমি এসো বসো, না হলে সব গল্প করবে। বৌদি-ই গল্প করছে বেশী।

বুদোকুণ্ডু —বাড়ীতে জাদিকে খুব ধমকাও। এখানে চুপ কেন। সকলেই হেসে ফেলে।

সীমা —আপনি ওখানে বসুন। কিছু ভাবতে হবে না। হাতে কাজ করছি। মুখে কথা বললে কিছু অসুবিধে হবে না। আবার কার সাথে কখন দেখা হবে। একটু কথা বললে দোষ কি?

বুদোকুণ্ডু — না, না, আমি তা বলিনি। তোমার বৌদিকে একটু রাগিয়ে দিলুম। তোমরা হাসছ, স্ফূর্তিতে কাজ ভাল হয়।

সকলেই হাসে। কালুর দিদি— দিদি কি বাড়ীতে সত্যিই সকলকে ধমকায়।

বুদোকুণ্ডু —আর বলছেন কেন? আমাকেও বাদ দেয় না। সকলেই আবার হাসতে থাকে।

কালুর দিদি— দিদি কি বলছে দেখুন। ঘর আর বাইরে সবসময় এরকমই। মুখ খুব আলগা।

বুদোকুণ্ডু —পাঁচটা ভাইকে নিয়ে সংসার চালাতে হয়। ভয় না থাকলে সংসার চলবে।

রামচরণ খুড়ো —তুমি বাবা খুব কাজের। তোমার উপর দায়িত্ব দিয়ে আমরা বেঁচে গেছি। তুমি না থাকলে কি যে হোত ভাবতেই পারছি না। যদিও জয়দেব খুব হুসিয়ার রাঁধুনি। তবু তোমার যা দেখভাল বা হিসেব তার তুলনা হয়না।

ভোলানাথ — মা দেখছে এদের কিছু অভিজ্ঞতা নেই। তাই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।সত্যি কথা বলতে কি তুমি না থাকলে আমাদের যে কি হাল হোত ভাবতে পারছি না। লুচি রাখার জন্য পাত্র দরকার। সেটাও হুশ নেই। তুমি না বললে কুমোরদের ঝাঁকা গুলো আনতে ছুটতে হোত। অথচ তুমি আগে ভাগেই কেমন গুছিয়ে কাজ করাও।

কিংকর খুড়ো—ওটারই তো দাম। আবার ছেলে ছোকরাদের দিকে কেমন করে কাজ করাতে হয় তাও জানে। দেখছ গোটা চল্লিশ পুরুষ মহিলা বৌ ঝিকে কেমন করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আমরা এভাবে পারতুম না। খাওয়াদাওযার পর মেয়েদের আমরা ছেড়ে দিতুম। আর ওদিকে দিব্বি কাজে লাগিয়ে দিল।

বুদোকুণ্ডু — মেয়ে পুরুষ একসাথে কাজ ভাল হয়। অনেকেই কাজ করতে চায়, কিন্তু ডাক না পেলে। এই যে ওরা পরিবেশন করলো। তাতে ওদের লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। আমাদেরও কাজ হয়ে গেল। মেয়েদের আর একটা গুন জানেন। কাজে লাগলে শেষ না করে ছাড়ে না। আর একটা সবচেয়ে বড় কথা। আজ যা ওরা আনন্দ পেয়েছে জীবনে খুব কম দিনই সেরকম আনন্দ পেয়েছে।

কথাগুলো, উভয় দলের কানে যায়। লুচি তৈরী যারা করছে তাদেরই কাছাকাছি বেঞ্চে বসে আছে অনেকেই। সারাদিনের পর ওরা একটু রিলাক্স করছে।

কালুর দিদি— আপনাদের কথা আমাদের কানে আসছে। সত্যিই আজ যা পরিবেশনে আনন্দ পেয়েছি তা কল্পনাতীত।

গোপালের ছোট কাকী—আমার মনের কথাটা বলেছ।

গোপালের বৌ-ও ভোলানাথের ভাই বৌ প্রায় সমস্বরে বলে—এটা সকলের কথা।

কালুর দিদি—আপনারা নিমন্ত্রণ না করলে, পূজোর দিনে আমরা হাজির হব।

বুদোকুণ্ডু বৌ — আমি এখানকার কেউ নই। আমিও যেচে হাজির হব।

রামচরণ খুড়ো— সেটাই ভালো যদি ভুলে যাই। যদিও ভুলে যাওয়ার কথা নয় তবুও সেটাই ভালো। নিজের ইচ্ছায় এসে নিজের মতো কাজে লেগে পড়লেই আমরা বেশী আনন্দিত হব।

ভোলানাথ—খুড়োর মতেইমত। এখানে যতদিন পূজো চলবে ততদিনের জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ রইলো।

কিংকর খুড়ো — খাঁটি কথা। একেবারে—গুনিয়াদার, ভাইপো দিকেও বলছি—তোমাদের সকলের ফ্যামিলিসুদ্ধ নিমন্ত্রণ।

ভোলানাথ— দেখ দেখি ভাইয়েরা কেমন কাজ করছে। আমাদের গাঁয়ের ছেলেদেরও হার মানায়। প্রায় কাল সারারাতটাই জেগেছে।

ঐ গ্রামের একজন সীতানাথ — আমরা প্রত্যেক বছর আসবো, পাঁঠা নিয়ে একরকম মায়ের আদেশই বলতে পারেন। কিযে ভাল লাগছে। আমাদের মেয়েরা বলছে, এখানের লোক এত আদর যত্ন করছে মনে হচ্ছে যেন কটুম বাড়ী এসেছে।

রামচরণ খুড়ো —খুব ভালো কথা। জগতে কে কার। মানুষকে আপন ভাবলেই আপন আর পর ভাবলেই পর।

রামচাঁদ —আমাদের সকলে হাজির। কখন থেকে নাচবো আমরা । বিকেল থেকে হবে তো। এই অমল মাকে জানায়। আমাদের নাচ আরম্ভ হচ্ছে। মাইক ও লাইট ঠিক করেছে। তা রামচাঁদ কেমন পূজো জমেছে। লোকে কি বলছে। কটুমবাটুম সব এসেছিল তো।

রামচাঁদ লোকে কি বলবে। দেখতে পাচ্ছে না। কি রকম হোল, কত লোকখেলেক। লোক আসছে তো আসছেই। মেয়েরা বলছে এমন খিচুড়ী আর তরকারী জীবনে কোনদিন খাইনি। ওরা খুব খুশী।

ভোলানাথ — শুধু মেয়েরা ছেলেরা নয়।

রামচাঁদ—তুই বড্ড বললি। মেয়েরা সহজে ভাল বলে না। ওদের খুব ভালো লেগেছে। যেমন খাওন দাওন, যেমন লাইটের কারসাজি কেমন মন্দিরটা মানিয়েছে। ওরা বেশী অবাক। আলোর মাকালী দেখে। বলছে আগামী বছর সবকুটুমদের খবর দিতে হবেক । যদি চাঁদা লাগে আরও বেশী চাঁদা দিব।

রামচরণ খুড়ো— দুটো গাঁয়ের লোক চাইলেই সব হবেক।

রামচাঁদ—সব হবেক। আসছে বছর আরো জোরে। কি যে ভাল লাগছে। কত লোকজন, কত খাওনদাওন। মাংস ও কুমড়োর তরকারী এখনও মুখে লেগে আছে।

মহিলারা—একযোগে জানায়—সত্যিই খিচুড়ী আর তরকারী এখনও মুখে লেগে আছে।

রামচরণ খুড়ো — কালুকে দেখছি না।

কালুর দিদি — ওর জামাই বাবুর সাথে ঐ যে ওখানে গল্প করছে। গল্পকরার বেঞ্চগুলো বেশ ভালই হয়েছে।

ভোলানাথ — বুদো ভাই এটাও কিন্তু ঐ কালুরই প্ল্যান।

বুদোকুণ্ডু — সত্যি বেড়াবার মতো মনোরম জায়গা হয়েছে।

কালুদিদি — সত্যিই বেড়াবার মতো জায়গা হয়েছে।

রামচরণ খুড়ো—তাহলে সময় পেলেই বেড়াতে চলে আসবে। মেয়েদের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে।

ভোলানাথ —রাত সাতটার মধ্যে সন্ধ্যারতি সেরে ফেলতে হবে। আর সাতটা থেকেই

খাওয়া দাওয়ার কাজ শুরু হবে। না হলে ছোট ছেলে পুলেরা ঘুমিয়ে পড়বে। মাইকে একবার সন্ধ্যারতি ও খাওয়ার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে। অমল একবার মাইকে বলেছে।

বদরীনাথ ভট্টাচার্য এখনও ঘুমুচ্ছে একটা বেঞ্চিতে। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ মেয়েরা সেজেছে। প্রায় জনা পঞ্চাশ মেয়ে নাচবে। ওদের খোপায় কুরচি ফুল, আর ছেলেদের মাথায় কানের পাশে দু গোছ ময়ুর পেখম। ধামসা মাদালে দ্রিম দ্রিম শব্দ উঠছে, বাঁশী ও খরতাল বাজছে ছন্দের তালে তালে। দুদল মহিলাদের, গোটা পঁচিশ ত্রিশ করে হবে। নাচ শুরু হয় প্রায় ছটা বাজে। ছেলেরা বাজাচ্ছে মেয়েরা নাচছে কোমর দুলিয়ে গানও চলছে। সন্ধ্যা নামে, বন্যপ্রকৃতি জেগে উঠেছে—আদিম বন্যতায়। সুরে শব্দে, নাচের তালে যেন সকলেই নাচতে থাকে ময়ুরের মতো। মেযেদের সর্দার এখানে ঠাগুামণি। কালুরভীষণ ইচ্ছা নাচ দেখার। কালুও হাজির। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখে তাকে শীতলও সন্ধারতির যোগাড় করতে যেতে হয়। সাতটায় সন্ধ্যারতি শুরু হয়। এক গামলা লুচি ও বন্দে দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাইপুরের ওরা হাজির—। ওদিকে জায়গা করে দেওয়া হোল মন্দিরের সামনে। বুদোকুণ্ডুর স্ত্রীও উঠে যায়। পূজা শুরু হবার আগে মাড়োয়াড়ী বৃদ্ধা পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে প্রণাম করে, বুদোকুণ্ডুর স্ত্রী একখানা একশ টাকার নোট দিয়ে প্রণাম করে। সকলেই অবাক হয়। মুখে মুখে প্রচারিত হয় খবরটা। তন্ময় হয়ে আরতি দিচ্ছে কালু। খোলকরতাল, ঢাক্ ও ব্যাণ্ডপার্টির শব্দে মন্দিরটা গম্ গম্ করে। সন্ধ্যারতি দেখতে প্রচুর লোক হাজির হয়েছে। কালু সন্ধ্যারতি ও দেখবার মতো, বাজনার তালে তার হাত পা স্পন্দিত হয়। সকলেই সন্ধারতিতে ভক্তি রসে আপ্লুত হয়। সন্ধারতি শেষ হয়। কেউ খেতে চায় না। এখন সাঁওতাল নাচের দিকে মনোনিবেশ করেছে। মহিলা পরিবেশন কারিণীরা হাজির এবারে যেন সংখ্যায় আরও বেশী। ঝাঁট পাট পরিবেশনকারীনিরা দিয়ে নেয়। লুচি ও রান্নার কাজ আর বেশী দেরি নেই। এখন কেউ বসতে চাইছে না। এখন কিদে পাকেনি। সাঁওতাল নাচে ভীড়। যারা নাচে তারাও বেশ উৎসাহিত হয়। শশা, রূপচাঁদ, পুটু, মনা ও রতনরা—? বংশী এখানটা দেখাশোনা করছে। সার্কেলটা আর একটু বড় করা হোল বেশী লোক দেখার সুযোগ হচ্ছিল না। বৌ, ঝি, মেয়ে পুরুষ কটুম্ব নাচে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মনে হয় দুটো গ্রাম গোটাটাই হাজির নাচের আসরে। নাচও খুব ভালো হচ্ছে। মারকারী টিউবের আলোয় মানে হয় জোৎস্নালোকে আদিম বনানীর মাঝে আদিম আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। যারা লুচির কাজ করছে তারাও উস্‌খুস করছে দেখতে যাবে বলে ওরা ছন্দের তালে ময়দা মাখে। আটটার সময় বসানো হোল প্রথম ব্যাচ। ব্যাচ বসানো হচ্ছে আর গোনা হচ্ছে। এবার আরও পরিবেশনকারী। বৃদ্ধাদের মধ্যে কালীপিসি সর্বা ধিনায়কের ভার নিযেছে। তবে কুণ্ডু বৌ বেশ পারদর্শী বোঝা গেল। গতবারের মতই সারি ভাগকরে সেই মত লোক দেওয়া হোল। যে লুচি দিচ্ছে সেই লুচি দিচ্ছে, যে ডাল নিয়েছে শুধু ডালই। প্রথমবারের মতো জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়। সুন্দরভাবে পরিবেশন হচ্ছে। এবার দুটো মাড়োয়াড়ী বৌ এবং বুদো কুণ্ডুর একভাই বৌও লেগেছে। সকলেই ভাবছে যেন নিজেদের কাজ। বলা হয়েছে খাবারের অপচয় করা চলবে না। একবারের চেয়ে দশবার দেওযা ভাল। খুশীতে সকলে খেয়ে চলেছে। অনেকদিন পেটভর্তি বন্দে খাওয়া হয়নি। জিনিষ পত্র অতি সুন্দর হয়েছে। পুরুষরা শুধু দেখভাল করছে । শুধু বলছে—নষ্ট করা চলবে না। চারটে ব্যাচ শেষ হোল।

প্রায় শেষ। এখনও খায়নি যারা নাচছে আর পরিবেশন কারীরা। ওদের বলাহোল নাচ শেষ করতে। ওরা নাচ শেষ করে কোন মতে। সবসময় দর্শক আছে। খাওয়া দাওয়ার পর কেউ বাড়ী যাওয়ার নাম করেনি। সকলেই একটু রেষ্ট নেয়। মুখে হাতে জল দেয়। গাঁয়ের বাকি মহিলারা যারা খেয়েছে তারাই খেতে দেবে। যারা নাচ গানে ছিল। তারাও বাকি সকলে—মায়— ভোলানাথ ও মুরব্বিরাও এক সাথে খেতে বসেছে। রাইপুরের মহিলারাও শশা আর শশার বেয়াই ও খেতে বসেছে। শশার বেয়াইকে একটু যত্ন করে খেতে দেবার কথা বলে। শশা বার বার বেয়াইকে জানায় কিছু লাগবে নাতো, তার সাথে পরিবেশন কারিণীরারা তো আছেই আর মুরালী ও বংশীরা । সাঁওতাল রমনী ও পুরুষেরাও বেশ ভালই টানছে। এবার ভোলানাথ জিজ্ঞেস করে ঠাণ্ডা মনি ঠিক আছে। দেখবি তোদের সকলে ঠিক খাচ্ছে কিনা। পটুকেও বলে পটু ঠিক আছে তো। ঠাণ্ডা মনি বলে দারুন চলেছে, পটু বলে একটু পরে হলে ভাল হোত। মুরালি—বলে বসে খা না। আর তো কিছু নাই। না আর নাচ গান করবি। ওদের নিজেদের ভাষায় বলে— তোরা যদি থাকিস্ তাহলে নাচ গান হবে। রামচরণ খুড়োর মতে ডালডা খাওয়ার পর রাতজাগা ঠিক হবে না। যদি চায় নাচবে। কথায় কথায় খাওয়া আগায়। এ বেলায়—সাঁওতাল মেয়েরা কলকল করে কথা বলে। দারুন খাচ্ছি, পেট ভর্তি বন্দে, এরকম লুচি কোথাও খাইনি, তরকারীও সুন্দর, দিনের তরকারীটা দারুন হয়েছিল, লোকও অনেক কেযেছে, এমন নাচ কোনদিন নাচিনি, ভীষণ আনন্দ হচ্ছে বলে, এমনি হাজার প্রশ্নের উত্তর। ঠাণ্ডামণি বলে একজন পাঁচশ টাকার নোট পুণামি দিয়েছে। কালীপিসি দেখিয়ে দেয়। ওরা বলে, ঠাকুর দিদির বহুৎ বড় মন। এক জন বলে বহুৎ বড়লোক। আগের মেয়েটি বলে বহুৎ টাকা থাকলেই হবে না বহুৎ বড় মন থাকা চাই। মাড়োয়ারী বৃদ্ধার আনন্দে চোখ ছল্ ছল্ করে..../ মুরালি জানায়.....বুদোদাও অনেকটাকার মাল ফ্রি দিয়েছে। ঐ ঠাকুমারাও অনেক টাকার মাল ফ্রি দিযেছে। তানা হলে এরকম মন্দির, ভোজন হয়। মেয়েরা বলে খুব ভাল করেছিস্। তোরা সকলেই ছিলিস· বলেই—মন্দির হোল ভোজন হোল।— আমরা, নাচলুম, গাইলুম, মাদলবাজালুম। দুটো গাঁয়ের ছেলেমেয় কত স্ফূর্তি করলো। আর যারা এই পরিবেশন করলো তারাও কি কম আনন্দ করলো......। দারুণ পূজো হলো.... ঠাকুমা, কুণ্ডুবাবু তোরা সব আসছে বছর আবার আসবি কিন্তু....। সকলেই অবাক হয় ওদের প্রাণের স্পর্শে। মুরালি.... বেয়াইকে লুচি তরকারী মিষ্টি দেখাও।

শশা— বেয়াই চারটি লাও।

বেয়াই —না, ভাই শরীর খারাপ করবে।

শশা—কাছেই নদী আছে।

সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ে।

মুরালি ও বেলার তরকারী আছে।

কালুর দিদি —সামান্য আছে বালতি খানেক।

মরালি—তবে দিয়ে দাও।

সকলেই চায় হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই দাও—দারুন হয়েছে।

সকলকেই ভাগ করে দেয়—সকলেই বলে মুখে লেগে থাকবে অনেকদিন—

মুরালি— জয়দেব, তোমরা রাঁধুনিরা শুনছো। তোমাদের সুখ্যাতি।

ঠাণ্ডামনি—তোরাও সকলেই আসছে বছর চলে আসবি। আঃ কি সুন্দর লাগছে দুপুর বেলার তরকারী। দে দে আর একটু দে। বুঝতে পারছি না । সব কিছুই ভালো হয়ে যাচ্ছে। বুদোকুণ্ডু তোরাও আমাকে নিমন্ত্রন করছিস্। শুধু কর্মকর্তারা নয় তোরাও— তোদের ডাক না শুনে পারি।

বৃদ্ধ মাড়য়ারী— কথাটা সত্য বলেছে। এদের ভক্তি শ্রদ্ধাও আলাদা রকমের।

রেখা নামে কিংকর খুড়োর নাতবৌ— জোর করে সকলেই কিছু না কিছু দিচ্ছে। ভালোবাসার অনুরোধে সকলেই খায়।

পরমপরিতৃপ্তিতে খাওয়া শেষ। খাওয়া শেষে। সকলে রান্নার ওখানে যায়। এখন প্রায় এক ঝাঁকা ও আধ গামলা বন্দে আছে। ওর মতে কাল সকালে খাইয়ে দেবে লোক ডেকে। মরালি বলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রসাদের মতো দিয়ে এলে ভাল হয়। লোকের সংখ্যা দেখে।

সেটাই ভাল। সকলে স্বীকার করে; প্রস্তাবটা।

বুদোকুণ্ডু — দরকার হলে আর এক গামলা ভেজে দিয়ে বাড়ী যাবি এখনও অনেক আটা, ঘি আছে। আমরা বাড়ী যাচ্ছি।

ভোলানাথ—মুরালিকে ডাকে, কানে কানে কিছু কথা বলে। মরালি চলে যায়। ট্যাক্সি কাছে আসে। মহিলারা, কুণ্ডু বৌ দুজনকে থাকতে বলে ওদেরও ইচ্ছে কিন্তু আবার যাওযার ঝামেলায় থাকতে চায় না।

এখনও সকলেই আছে শেষ ব্যাচের। বৃদ্ধাকে একাটা মোড়ক দিয়ে মুরালি বলে ঠাকুমা বাড়ীর জন্যে সামান্য প্রসাদ নিয়ে যান।

মহিলা— বেশ করেছো—মায়ের প্রসাদ সামান্য হলেও অনেক, আর তুমি তো অনেক দিয়েছো।

মুরালি—আবার আসবেন বলে মুরালি প্রণাম করে। মুরালি দেখাদেখি ভোলানাথ সহ প্রায় কমবয়সী সকলেই প্রণাম করে। মহিলারা কি আর বাদ থাকতে পারে। সকলেই ঠাকুমা আবার আসবেন, বলে অনুরোধ জানায়। ঠাণ্ডামণি—তোরাই প্রণাম করবি আমরাও প্রণাম করবো তুই বাইরে দাঁড়া ওখানে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। মহিলা কাছে আসতে বলে। মাথায় হাত রেখে বলে তোরা আমাকে পর ভাবছিস্। এবার সব সাঁওতাল রমণীরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। পুরুষরাও বাদ দেয় না। এক অপূর্ব অদ্ভুত দৃশ্য। সকলকে ওদের বাড়ীতে যেতে বলে। বুদোকুণ্ডুর স্ত্রীকে বৌকেও অনেকেই প্রণাম করে, মুরালি একটা বড় ঠোঙা দিল হাতে। ওরা গাড়ীতে চাপে। বুদোকুণ্ডুর বৌ, ভাদর বৌ, মাড়োয়ারী দু বৌ বয়োজ্যেষ্ঠদের সকলকে প্রণাম করে। সকলের চোখে জল আসে। ওরা চলে গেল।

সাঁওতালরা বললো ওরা আরও নাচবে একেবারে ভোর পর্য্যন্ত। ওরা নাচতে চলে যায়। এখনও অনেক দর্শক। শেষ ব্যাচের মহিলারা আছে। ঠিক হয় পরের দিন যে লুচি বন্দে গুলো আছে, সেগুলো বাড়ীতে বাড়ীতে পাড়ার মুখ্যেরা বিলিয়ে দিয়ে আসবে। সকালে

একটু পর মুখ্যেরা এসে দিয়ে যায় বন্দে ও লুচি সাথে দু একজন হেল্পপার। বলে দেওয়া হোল বাড়ী অনুপারী হিসাব করে দিতে। প্রায় মানুষ প্রতি একটা করে লুচি হবে। আজ মন্দির প্রাঙ্গনে শূণ্যতায় ছেয়ে আছে। মাইক চলছে। ঢাকী ও ব্যাণ্ড পার্টি বাড়ী গেছে। ? পাশের গাঁয়ের লোকেদের ছাঁদা দেওয়া হয়েছে। ওরা ভীষণ খুশীতে বাড়ী যায়। আগামী বছর আবার আসবে বলে কালুর দিদি ও শিবু দারা, ভাগনে, সীমা বাড়ী গেল। ছাঁদা নিয়ে ওরা চোখে জল নিয়ে গেল। ওরা জানিয়ে গেল, কালুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোটা গ্রাম। মন্দির প্রাঙ্গন ঝাঁট পাট দিচ্ছে রবিই। আজ যখন আলোর ব্যাপার আছে তখন সাঁওতালেরা জানায় ওরা আজও নাচবে। বিকেলে থেকে নাচ শুরু হয়। দর্শক ও গোটা গাঁটা এসেছে। ওদের নাচও জমে উঠেছে। পটু ও ঠাণ্ডা মণির দল আজকে যেন আরও বেশী সেজেছে। নাচে এদের নাম আছে। বান্দোয়ানে একবার নাচে ফার্স্ট হয়েছিল। পূজো শেষ নাচে, গানে, ভোজনে। সকলেই পূজোর কথা বলে। গাঁয়ের লোক এ নিয়ে গর্ব করে অন্য গাঁয়ের লোকেদের সাথে। মন্দিরটা অন্য গাঁয়ের গর্বের বস্তু হয়ে গেছে। কালুর আশ্রম পূজো শেষে আবার নীরবতায় ছেয়ে যায়। পূজোর পর বিকেলে বৃদ্ধা ও বৃদ্ধদের বেড়াতে আসা যাওয়া শুরু হয়েছে। ওদের সাথে মাঝে মাঝে গল্প হয়। এখানে এলে সকলেই বাড়ীর সব ব্যাপার ভুলে যায়। মনে শান্তি বিরাজ করে। আজ পূজোর পর প্রথম ভিক্ষায় বের হয়েছে। সেই গাঁয়ে যায়। নাম হচ্ছে, ভগড়া। সেদিন মায়ের বয়সী যে মহিলা মিষ্টি জল করিয়েছিলেন সেই বাড়ীতে, মা বলে — তুমি ইন্দ্রগোলের গাঁয়ের বাবাজী। লোকে পূজো ও মন্দিরের কথা বলছে।" কালুও দুচারটে কথা বলে উত্তর দেয়। বাড়ীর বৌরা দেখতে আসে কালুকে। কালু আগামী বছরের জন্য নিমন্ত্রণ করে। কালু বাড়ী বাড়ী ভিখ্ করে যায়। ভিখ্ করতে করতে যায় সেই মহিলাদের বাড়ীতে, বড় বৌ ছোট বৌকে বলেছিল — "একটু লজ্জা শরম করবি।" আজও সেই ভঙ্গিমায় মুড়ির চাল নেড়ে চলেছে ছন্দে, উপরাঙ্গে বস্ত্রের বালাই নেই। "রাধামাধব" নাম দেয়। ছোট বৌ বাড়ী থেকে বলে, যাচ্ছি দাঁড়াবে। বড় বৌ প্রায় আগের মতোই। কালুকে ভ্রুক্ষেপ করে না, বা বুঝতেই দেয় না তাকে সে দেখেছে। ছোট বৌ ভিখ দেবার আগে রান্নাঘরের দিদিকে দেখ নেয়, মুচকি হেসে ভিখ দেয়। কালু ফিরতে ফিরতে, দিদিকে বলতে শোনে. দিদি একটু হুঁশ করবে। তারপর কি কথা হয়েছে জানা নেই। কালু ভাবতে থাকে কি কি কথা হোল। কালু স্পষ্ট দেখেছে চোখে চোখ পড়েছে। তারপরেও ? না দেখার ভান করছে কিছু একটা হবে হয়তো। পাড়া গাঁয়ের মেয়েরা এটা কোন কিন্তুর মধ্যেই ভাবে না। কিন্তু ছোট বৌএরও বড় জায়ের প্রতি চোখের চাহনি সহ মুচকি হাসি ভাল মনে হয় না। সিদ্ধান্ত নেয় ওদের বাড়ী যাবে না। দুয়ারে দুয়ারে ভিখ করতে থাকে। কত দৃশ্য, কত লোকজনের সাক্ষাৎ, কত কথা। একটা বাড়ীতে ঢুকে দেখে, ভাইয়ে ভাইয়ে খারাপ খারাপ কথায় কথা কাটাকাটি হচ্ছে। বাড়ীতে পৌছে খারাপ লাগে। ফিরতেও পারে না। পাছে গৃহস্থের লোরো অমঙ্গল ভাবে। হঠাৎ কালু বলে — ভাই একজন চুপ দিন। সম্ভবত যে ছোট একবার কট্মট্ করে তাকায়। কালু তাকে বলে একটু ঘুরে আসুন বাইরে থেকে। ঠাণ্ডা হলে সমস্যার কথা বলবেন। সমস্যা তার কোথায় নেই। কথা শুনে বড়দা চুপ থেকে যায়। শান্ত হয় পরিবেশ। বাড়ীর গিন্নিরা বেরিয়ে আসে, ভিখ্ দেয়। গিন্নীমার চোখে মুখে, কৃতজ্ঞতা। জিজ্ঞেস করে, কোথায় থাকে, ইত্যাদি

সমাচার। পরিচয় দেয়, সামান্য নিয়ে ঝগড়া, তুমি না এলে কি হোত কে জানে। একয়দিন দু তিন ভায়ে ঝগড়া চলছে। সংসারটা বোধ হয় তার টেকে না। মেজো নেই বাইরে। থাকলে ঝগড়া আরও বেড়ে যেতো।

কালু বলে — বড়দা! একটু শান্ত হোন। আপনি তো বড় ছোট ভুল করতেই পারে।

বড়দা — ঐ করেই যে আস্কারা পাচ্ছে। বড় হওয়ায় ভীষণ দায়। আগালেও দোষ — আর পিছলেও দোষ। কিযে করি।

কালু — বড়দা সবই মানছি। তবুও সহ্য করতে হবে বৈকি। আপনাকে আর কি বলবো, এ সংসারে অর্থাৎ যৌথ ফ্যামিলিতে যে আনন্দ আছে সেটা কি আর একক সংসারে আছে। এখানে সকলে সকলের জন্য। আর একা না বকা। আমার মনে হয় আধ পেটা থাকলেও এতে আনন্দ আছে।

বড়দা — আপনি একবার সেই দুটো বাঁদরদিকে বলুন। বৌদের কথায় নাচে। যখন ছোট ছিলি তখন কে বুঁকে আঁকড়ে রেখেছিল।

কালু — তাইতো বলছি। আর মেয়েদের দোষ দেবেন না। আপনার ভাইয়েরাই ভাল নয়। তারাতো আপনার অবদান সংসারে দেখেনি, তারাতো বলতেই পারে।

বড়দা — সব অকৃতজ্ঞ।

কালু — জগৎটাই অকৃতজ্ঞ। তবুও এদেরও নিয়েই থাকতে হবে। আবার চলতেও হবে। মা আছেন যত দিন পারেন থাকুন। তারপর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছেই। যৌথ ফ্যামিলিতে শাক ভাতও অমৃত। একথাটা কেউ বুঝতে চায় না। আরে বাবা হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান। মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে।

বড়দা — ঐটাইতো বুঝতে পারছে না কেউ।

কালু — বয়স কত হোল?

বড়দা — পঞ্চান্ন।

কালু — এ বয়সে যত বেশী কথা কাটাকাটি করবেন, তত, হার্টের পক্ষে শরীরের পক্ষে তত খারাপ।

বিড়ি ধরিয়ে বড়দা — বসুন! এলেন যখন একটু বসুন একটু চা কর তো দেখি। অগত্যা বসে। কালুর গল্প হয়। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

বড়দা বলে — বাঁদর দু'টোকে একটু বোঝাবেন তো। বলবেন তখন কোথায় ছিলি, চার বছর, ছয় বছর বয়সে যখন বাপ মারা গিয়েছিল। তখন আমার বছর ষোল, তারপর সাত ও এগারো বছরের দু বোনের মানুষ করা ও বিয়ে, সারাটা জীবন খেটেই চললুম। শেষে বদনাম পাচ্ছি।

কালু — দেখুন কাঁদবেন না। আমি ওদের বলবো। বৌমাদের বলবেন, এক সংসারে একটু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় বটে কিন্তু তার পরিবর্তে আনন্দও কম নয়। সুখী তারাই যারা আনন্দ ও বেদনা অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে জানে। সুখী একটু মাছ মাংস, ভালমন্দ বেশী খেলুম, পরলুম একটু দামী কাপড় চোপড়, এতেই কি সুখী জীবন। পরের জন্য দু

ফোঁটা চোখের জল ফেলা সেটা কি কম কথা। বরং সেটাই জীবনের সার্থকতা। সেইযে একটা কবিতার লাইন, 'সুখ সুখ করি কাঁদিও না আর যতই কাঁদিবে ততই বাড়িবে হৃদয় ভার......আমরা প্রত্যেকে পরের তরে।' এত বড় কথা খুব কম কবিতায় পাওয়া যায়। কি সুন্দর কথা।

বড়দা — অনেক যে কাদলুম, কিন্তু চোখের জলের দাম যে পেলুম না। বরং যেটা পাচ্ছি সেটা আর বলা যাবে না......।

কালু — মা, আপনার বৌমারা কি, বড়দার কান্না শুনতে পাচ্ছে? আর একটা কথা — "কাঁদালে কাঁদিতে হয়"। সেটা কি ভাল? আপনারা সকলে মিলে মিশে থাকুন। সুখ দুঃখে থাকুন, সকলেই আপনারা আপনাদের পরম আত্মীয়। বড়দার শরীরে যে রক্ত বইছে সেই রক্ত বইছে ছোটদা ও মেজদার শরীরেও। সুতরাং ভাইকে ভাইয়ের অন্তরে স্থান দিতে হবে, তাতেই সুখ। আপনারা অর্দ্ধাঙ্গীনী — আপনারাই তো স্বামীদের বোঝাবেন। বিয়ের আগে স্বামী স্ত্রী পরস্পর অচেনা থাকে। পরে কত আপন হয়। পর আপন হয়, আর আপনকে পর করে কি লাভ। একটুকু সুখের আশায়। যেটুকু আজ সুখ ভাবছি পরে সেটাই হয়তো দুঃখ হয়ে নেমে আসতে পারে। কাজকি সে পথে। সুখী হওয়ায় যতটা সুখ পাওয়া যায় তার চেয়ে অপরকে সুখী করতেই আরও সুখ।

মা — বড় কথা বলেছ বাবা। অপরকে সুখী করতে হবে না, করবে তো তোমার বাড়ীর সকলকে। বাড়ীর সে সকল সদস্যই তো তোমার আপনার। ওদের সুখেই তোমাদের সুখ। দেখ মা তোমরা কথাটা বুঝ। আমরা সকলেই সকলের পরমাত্মীয়।

কালু — বৌমারা ছেলেরা আপনার কথা তো শোনেই। আর একটু ধৈর্য্য ধরে বোঝান যেটুকু নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আছে সেটুকু মিটিয়ে নিন। দেখবেন নিজেদের মধ্যে ফারাকটুকু মিটিয়ে নিলে কত শান্তি। প্রথমে একটু ছোট হলে, পরে আপনিই বড় হবেন অপরের কাছে অর্থাৎ যার কাছে ছোট হয়ে ছিলেন ক্ষমা চেয়ে কিংবা ক্ষমা করে। ক্ষমার চেয়ে বড় ধর্ম নেই।

মেজো বৌমা — মা, আপনি আমাদের সোজাসুজি বকুন ভুল হলে। ভিতরে রেখে জ্বালাতে জ্বলতে থাকবেন না।

কালু — উনি ভীষণ বড় কথা বলেছেন। আর একটা কথা রাগ অভিমান অন্তরে পুষে রাখবেন না। সকলেই রক্ত মাংসের মানুষ ভুল হতেই পারে। ভুল স্বীকারের মধ্যে শান্তিও কম নেই। সেখানেই হৃদয়ের মহত্ব। অপরের ভুল না দেখে, নিজের ভুল দেখুন, অপরের ভাল দেখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে যেমন সকল হিসাব মেলে না তেমনি সংসারে সব হিসাব মেলে না। দেনা পাওনার একটু ফারাক থেকেই যায়। তাতে কিছু মনে করার নেই।

ছোট বৌমা — আপনি বলে যান, মা ও বড়দা কিছু যেন মনে না করেন।

কালু — কেন আপনারা সোজাসুজি ওদের কাছে এলেই যে ওরা কত খুশী হবে ওরাই জানে না, আর তো আপনারা কত আনন্দ পাবেন। দেখুন পরীক্ষা করে।

বড়দা ও মায়ের কছে ওরা এসে দাঁড়াতেই বড়দা কেঁদে ফেলে, জল দেখে মাও কেঁদে ফেলে।

বৌমারা পায়ে হাত দিতে চায়। হাত আর দিতে হয় না। বড়দা ওদের ক্ষমা করে দেন চোখের জলে। ওরাও খুশী। সেদিন থেকে সংসারটা বেশ শান্তি, সুখে আছে।

বাড়ী ফেরে কালু মনের আনন্দে। আর ভিখ করে না, আনন্দে তার থলি উপচে যাচ্ছে। বার বার এই বাড়ীর সকলে অনুরোধ করছিল — চারটি খেয়ে যেতে। খাওয়া দাওয়া না করার কারণ জানাতে ওরা আরও বিস্মিত। শুধু নিজে খেলেই হবে, রবির জন্য যে তাকে রাঁধতে হবে। আবার আসবে জানিয়ে বাড়ী ফেরে। বাড়ীতে এসে রবির কাছে শোনে রামানন্দ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ওদের দুজনের নিমন্ত্রণ, ছেলের অন্নপ্রাশন। আর রান্নার ঝামেলা নেই, বেশ দেরীও হয়ে গেছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। যায়, যাব না যাব না করেও। কারণ ছেলেটা থাকলে এখনই মনে হয় অন্নপ্রাশন হোত। অবশেষে যায় ছেলেটার কথা ভেবেই। ছেলেটাকে কোলে নেয়, এক টাকা দেয়। ষোল আনা, মন প্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করে প্রাণ ভরে। যেন ছেলেটা নিজের। চোখে জল আসে। লক্ষ্য করে ছেলের মা, কালুর চোখের জল। আঁচ করে কোথাও কিছু ঘটেছে। সেদিন কিছু বলে না। আর দেখাও হয় না। কারণ গাঁয়ে ভিখ্ করে না। ছেলেটার মুখ বার বার মনে আসছে। সাথে সাথে স্ত্রী জবার মুখটা। থাকলে ঠিক এই ছেলেটার মতোই হোত। কোলে যখন নেয় তখন সেই রকমই যেন পরশ পেয়েছিল। সন্তানের পরশ। একদিন রামানন্দ আসে তার কাছে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে সেদিনের চোখের জলের কারণ। সত্যিটা অস্বীকার না করে সত্যিটাই বলে। দুঃখ পায় রামানন্দ। কালুও জানায় আমার ছেলেটাকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন উপায় নেই, ইচ্ছে থাকলেও। আপনি যখন খুশী যাবেন। খুব দরকার না হলে যাব না। আপনি যদি দয়া করে মাঝে মধ্যে আনেন তাহলে ভীষণ ভাল হয়। বাড়ীতে গিয়ে কারণ বলে, ব্যথা পায় মনে তার স্ত্রী, আহারে, সেই জন্যই গৃহত্যাগী, বৈরাগী। অন্তরটা ব্যাথায় ভরে যায়। রামনন্দর মা ও দাদা বৌদিও ব্যাথা পায়। সারা গাঁ জেনে গেছে। কালুর পূর্ব ইতিহাস। সেও ছিল বিবাহিত এবং সন্তানের জনক। আজও বেরিয়েছে নদীর ওপারে একটা আগুরী গাঁয়ে। এদরে গাঁয়ের বৈশিষ্ট্য হোল বাড়ী সব মাটির বাড়ী হলেও ভাল ও পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। মন দুদণ্ড বসতে চায়। মহিলারাও পরিষ্কার ছিমছাম থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ভিক্ষা করে। কথা বার্তা চাল চলন্ একটু আলাদা ঠেকে৭ মেয়েরা একটু আলাদা ধরনের পরিশ্রমীও কম নয় গেঁয়ো লোকের মতই কিন্তু এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাষ বাসই জীবিকা। প্রত্যেক বাড়ীই স্বচ্ছল। ঘুরতে একটা বিরাট যৌথ বাড়ীতে হাজির হয়। সদর দরজার ভিতরে দাঁড়ায়। একটি বৌ ছেলে কোলে নিয়ে ভিখ্ দিতে আসে। ছেলেটি বছর তিনেক হবে। জিজ্ঞেস করে সাধু তোমার ঘর কোথায়?

কালুও বলে — ঐ নদীর ওপারে।

ছেলেটি — আমাকে নিয়ে যাবি?

কালু — না বাবা! তোমাকে রাখবার ঘর নেই। খুব সুন্দর কথা বলে ছেলে, তাই না!

বৌ — কথার বুড়ো। কোথা থেকে ওর মাথায় এসব যোগায় বলা মুস্কিল।

দিন পাঁচ সাত পরে আবার এই গাঁয়ে এই বাড়ীতে আসে। সেদিন আর এক মেজো

জেঠিমার সাথে আসে। নড়বড়ে হাতে কোনরকমে জেঠিমা ঢেলে দিতে সাহায্য করে। ছেলেটি সেদিন আবার বলে আমাকে নিয়ে যাবে।

কালু আজও বলে — না বাবা ওকথা বলতে নেই, আমি কোথায় তোমাকে নিয়ে গিয়ে রাখবো?

মেজো জেঠিমা — দারুণ পাকা পাকা কথা। আর তেমনি চঞ্চল। নামেও চঞ্চল কাজেও চঞ্চল। সমস্ত দিন দেখ দেখ করে রাখতে হয়। জান ছেলেটি সেদিন কি করেছে কাঁধে একটা পলিথিনের থলি নিয়ে বলে, রাধামাধব, ভিক্ষা দাও। সকলেই হেঁসে পাগল। সেজন্যই ভিখিরী এলে ভিখ্ দিতে ছুটে। আবার কখনও বলে, মালিক পীর বাবাজী সুখে রাখুন।

চলে আসার সময় বলে — আবার আসবে।

কালু — এ গাঁয়ে এলে আসবো বাবা।

আসার সময় চঞ্চলের মেজো জেঠিমার চোখে চোখ পড়ে। দৃষ্টিতে কি বলতে চায় বোঝা যায় না। সেও বলে — আবার আসবে।

কালু ঘাড় নাড়িয়ে উত্তর দেয় — হ্যাঁ।

সেই থেকে এ বাড়ীতে মাঝে মধ্যেই আসে। ছয় ভাই এর মেজ ও সেজ কলিয়ারি তে কাজ করে। এক ভাই দুর্গাপুরে; বাকি সব চাষ বাস করে। শ্বাশুড়ী আছে। বাড়ীতে সব সময় লোকে ভর্ত্তি। ভিক্ষায় এলে মেজ বৌ আসে সাধারণতঃ ভিখ্ দিতে। সাথে চঞ্চল, ভিখ দেয়। চঞ্চল মাঝে মাঝে বলে — "আজকে নিয়ে যাবে।"

মেজ জেঠিমা জানায় — বৈষ্ণবরা কীর্তন করতে এলে, ওদের সাথে চঞ্চল যেতে চায় — ওদের বলে — আমাকে নিয়ে যাবে।

সেই থেকে, ভিখারী দেখলেই বলে — আমাকে নিয়ে যাবে।"

দশ পনেরো দিন এসেছে ভিখ্ করতে। মহিলার চোখে কি আছে ভগবানই জানেন। চোখের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। ভোলা যায় না। মাঝে মাঝে বলে — 'জল খাবে'।

অধিকাংশ দিনই বলি না — সেদিন বললুম — দিন রোদটা বেশ পেকেছে।" জল আনে সাথে একটা ছোট প্লেটে মণ্ডা। তৃপ্তি করে জল পান করে। তৃপ্তি দেয় চোখের চাহনি। চোখে চোখ পড়লেই কালু চোখ ফিরিয়ে নেয়। এটাও লক্ষ্য করেছে অন্য চোখ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টিতে আনমনা করে দেয়। শুধু তাই নয়, এই চোখ দুটো ঝামেলায় ফেলেছে। সময়ে অসময়ে চোখ দুটি সহ চোখের মালিক মানস পটে ভাসে। মহিলার গড়নও ভাল, মাঝারি উচ্চতার চেয়ে একটু বেশী, রংটাও ফর্সার দিকে। চোখ দুটো প্রায় পটল চেরা। ভাবে বৈচিত্রময় জগতের কথা। কখন কার কোন জিনিষ ভাল লাগে বোধ করি ঈশ্বরও জানে না। পর স্ত্রীর চোখ দুটিতে এতটা মন দেওয়া ঠিক নয়, তবু তাকে বেঠিক করে দেয়। চোখের সাথে চোখের মালিকেরও কথা ভাবে। সত্যিই বিচিত্র এই জগৎ। সেদিন যেমন ঠাণ্ডা মণি, বাসী আর বাতাসীর সাথে বনের পথে দেখা। বনের শোভা দেখতে কালু ধীরে পথ চলে। তিনটে মেয়ে রাইপুর থেকে ফেরার পথে কালুর সঙ্গ ধরে। ঠাণ্ডা মণি একটু দূর থেকেই দাঁড়াতে বলে — ওঠাকুর, দাঁড়া;

কালু পিছনে তাকিয়ে বলে — "এসো"।

ঠাণ্ডা মণি — তুই পথ চলতে চলতে কি এত দেখিস্ বনের মধ্যে। আর তুই একটুকুন ফিরে দেখিস নাস আমরা সামনে দাঁড়লেও।

ঠাণ্ডা মণির বাতাসী, বাসীর হাসি যেন তাকে চমকিত করে। লজ্জায় রাঙা হয়। চুপ করে থাকে। কিছু উত্তর দেয় না। উত্তর না পাওয়ায়, ওদের হাসি আরও বেড়ে যায়। ভয় পায়। জাতিতে সাঁওতাল তারা। কোন সাঁওতালের চোখে পড়লে, তীর বিঁধিয়ে তাকে এখুনি মেরে ফেলবে। বাতাসী বলে — তুই কি বোবা হয়ে গেলি। কিছু উত্তর দেয় ঠাণ্ডা মণি কথার।

বাসী বলে — আমাদের দিকে তাকালে কি দোষ হবে?

কালু অচল, অনড়, নীরব।

ঠাণ্ডা মণি — তুই বোবা হয়ে গেলি নাকি?

বাতাসী কাছে যায় — হাতটা চোখের সামনে নাড়ান্।

কালু — চল যাই।

ওদের হাসি বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা মণি বলে তুই তো আচ্ছা মরদ, তিনটে মানুষ তুর সাথে কথা বলতে চায়, আর তুই ভয়ে লাজে মরছিস্। তুই তো মরদ এ ভয় কেনে? আমরা কি তোকে খেয়ে ফেলবো। অন্য মরদ হলে এখনই জাপটে ধরতো, আর তুই কি এত ভাবছিস্, একটা কথাও বলছিস্ না।

বাসী — আগে তুই মরদ, পরে তুই বৈরাগী। জানিস্ আগের তোর আশ্রমের বাবাজী, বিয়ে করে ঘর করছে।

বাতাসী — খাতড়া, রাইপুর আর রাণীবাঁধ যেথায় আমরা যাই, লোকে আমাদের হাঁ করে দেখে। মেয়েরাই বলে আচ্ছা গড়ন তোদের। আর তুই আমাদের হেলা করছিস্। দেহ নিয়ে হেলা করলে বড় রাগ হয়। ঠাণ্ডা মণি তুই ঠাণ্ডা কর, ব্লাউস খুলে লোককে মেনা খাইয়ে। ছোট্ট খোঁকা গলা শুকিয়ে গেছে কথা বেরোচ্ছে না।

ঠাণ্ডা মণি — যা বলেছিস্ মাইরি।

কালু ভাবে একি বিপদে পড়া, ছুটে পালিয়ে আসতে চায়। ছুটেও ওদের সাথে পারা মুস্কিল, ওদের গতি হরিণীর গতি। একটা পথ পায় পালিয়ে যেতে। একটু ভেবে নেয়। কালু ওরা তিনজন এখন আদিম বন্য প্রকৃতিতে, শিকার আর শিকারীর আদিম বন্য ভূমিকায়। খাদ্য খাদক সম্পর্ক। কালু উঁ উঁ করে দুম করে মাটিতে পড়ে যায়। ওরা হতবাক্। মুখ চাওয়া চায়ী করে। ওরা বুঝতে পারেনা, কি করতে হবে। পরে ঠাণ্ডা মণি বলে, নে তুলে একে নিয়ে চল বড়ো গাছের ছায়ায়, বাতাস করবি। এক কাজ কর বাসী তুই জাম বাটি করে ঝর্ণা থেকে এক বাটি জল নিয়ে আয় আর আমি বাতাস করি। ঠাণ্ডা মণি আর বাতাসী থাকে। ঠাণ্ডা মণি কাপড়ের আঁচল খসিয়ে বাতাস করতে থাকে। বাতাসী বলে — দাঁড়া কোমরের বাঁধনটা আলগা করে দিই। কাপড়ের ফাঁসটা আলগা করে কৌপিনটা আলগা করতে চায়, তখুনি কালুর বাঁ হাতটা বাঁধা দেয়। তখন বাতাসী সব কিছু বোঝে বাতাসের মতো লেপ্টে যায় কালুর শরীরে। কালুও তো পুরুষ, বাতাসী এরপর ওরা চারজনে

কাছাকাছি গহীন জঙ্গলে আদিম অরণ্যে হারিয়ে যায়, সৃষ্টি আদিমতম খেলার মাঝে। ফেরার সময় হাসতে হাসতে ওরা কালুকে উদ্দেশ্য করে বলে তোর মতো এত বকা মানুষও আছে। কি ভাগবৎ অশুদ্ধ হোল, তুই তো ভিখারী, আমরা তোকে যা ভিখ্ দিই, তুই তো লিবি। ভিখারী আবার কাঁড়া আঁক্ড়া চাল। কালুও এখন সহজ হয়ে গেছে। ওদের কথায় তার লজ্জাটা এখন কিছু কমেছে। মাঝে মাঝে এসময় চলে আসবি। ভিখ দুবো চাল নয়, মন তো দিয়েছি। দিতে আর কিছু বাকী নেই। ফিরতে ফিরতে মনে হয় বুঝি, কেউ তাকে অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে আসছে, আর শাস্তি মানে কাঁড়ে কাঁড়ে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করা।

আজ রান্না করে না ফিরেই। কিছুটা বিশ্রাম নেয়। স্নান করে আবার। স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে সেই বেঞ্চটায় বসন্তের পড়ন্ত বেলায় কোকিলের কুহু কুহু রব তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। সে জগৎ তাকে যেমন ভাবায় তেমনি মনের মাঝে সুখের পরশ দিয়ে যায়। দিনে পনেরো কেটে গেছে কালী পূজোর। দুটো গাঁয়ের অনেকেই এসেছে। ভোলানাথেরা, রামচরণ খুড়োরা, মুরালিরা এসেছে, শশারা, রামচাঁদেরাও এসেছে। সকলের মুখে এক কথা এরকম, উৎসব জীবনে দেখিনি এবং অন্য কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ আছে। এখানের উৎসব বাইরের লোকের মুখে মুখে, পটুরা বলে, আমাদের কুটুমরা এরকম পরব দেখিনি কোনদিন। অমল হিসেব বলে বলে যায়। কোথাও যদি কোন কিছু কেউ দিয়ে থাকলে তাও জানতে চায়। জেনারেটর, লাইট, বাজার সব কিছু ধরে, সব কিছুর চুল চেরা হিসেব করেও দেখা গেল এখনও হাজার তিন টাকা বাড়ছে। সকলেই চায় কালুর ঘরটা পাকা করে দেয়। কালু জানায় খড়ের ঘরের মতো আরাম কোন বাড়ীতে নেই। দেওয়ালও বেশ মজবুত আছে। মাঝে মাঝে ছেয়ে দিলেই হবে এবং একটা কাজ করলে ভাল হয়। পুরোনো কালী ঘরটা বাগিয়ে ওটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। অনেকের মতে ওটা যেমন আছে থাক, রিপেয়ার করে নিলেই হলো। কালুকে পঞ্চায়েত ইন্দিরা আবাস পরিকল্পনাতে বাড়ী করিয়ে দিতে চায়। নতুন করেই হোক। ইচ্ছে হলে থাকবে নাহলে ওটাই ভাড়ার ঘর হিসেবে কাজ করবে। সকলেই মত দেয় বাড়ীটা করা হোক, তারপর কালুর যা ইচ্ছে তাই করবে। সেই কথাই ঠিক হোল। মুরালি আগামী বছরের জন্য ধান টান পৌষ মাসের মধ্যেই আদায় করে দিতে হবে। কালী পিসি জমিও ঠিকভাবে দুবার চাষ হয় তাও নজর দিতে হবে। শশা বলে — "যত লেবার লাগবে একটা সিজন আমাদের এক পাড়া রোয়া, কাটা ঝাড়া, নিড়ানী সব করে দেবে। কিরে পটু তোরাও একটা সিজন্ চাষ করে দিবি তো।'

পটু উত্তর দেয় — কি করে ভাবলি আমরা দুবো নাই। একবিঘে চাষ। কটা লোক লাগবে। একদিন রোয়ায় জন পাঁচ ছয়। একদিন নিড়ান তাও জন চার, কাটা ঝাড়া, বোওয়া গোটা দশ বারো। ঘর ঘর আধটা এলেই কাজ হয়ে যাবে।

শশা — তোরা রইছিসনা। তোদের মত দরকার।

রামচাঁদ — তা বটে। তুই না বললেও আমিই কথাটা পাড়তুম, তুই আগেই পেড়ে দিলি। আর যদি বলিস্ আমরাই প্রত্যেক বছর চাষ করে দুবো।

রতন — খুব ভাল কথা। তোদের একা করতে হবে না, এক এক সিজন এক পাড়া। শশারা, মনারা, তোরা, আমরা সকলেই ভাল হবে।

ভোলানাথ — খুব ভাল কথা, সকলেই চাষ করলেই ভাল। আর আগামী বছর এতো চাঁদাও লাগবে না। দু সিজনের ধান, আর পৌষের ধান আদায় ভালই হয়ে যাবে।

রূপচাঁদ — লাগলে দিতে হবেক। কিছু কিছু করে আমাদের গাঁয়ের দিতে হবেক। গাঁয়ের পূজো বলে কথা। আমরা সব খিচুড়ীর চালটাই দুবো।

রাম চাঁদ খুড়ো — রূপচাঁদ বড় ভাল কথা বলেছে। ওদের আরও কিছু দেওয়া দরকার তাতে ওদের মমতা বাড়বে পূজোর প্রতি।

রামচাঁদ — আর এক জোড়া কালো পাঁঠা প্রত্যেক বছর।

পটু — হুঁ, হুঁ ওটা ভুলে গেছুলুম।

মুরালি — দেখছি মাই সবই পূজোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে মায়ের পূজোর। এদিকে কালু আবার পূজোর চাল পয়সা কড়ি কিছুই নিচ্ছে না। তাহলে আবার ভাবনা কি। বরং দেখি প্রণামী বাক্সটাতে কত আছে। কালু কই ওটা খুলতো।

কালু — খুলছি।

ভোলানাথ — খোল দেখি।

কিছুক্ষণ পর — কালু — নিরানব্বুই টাকা।

মুরালি — কোমর থেকে এক টাকা দিয়ে বলে — পনেরো দিন একশ টাকা।

বংশী একটাকা দিয়ে বলে — শূন্য রাখতে নাই। আমার কাছে দু টাকার কয়েন রয়েছে। সেটাই দিচ্ছি।

মুরালি — পূজোর সময় ধরে — তিন হাজার টাকা হবে। চালও দেখছি এই কয়দিনে শলিখানেক হবে। তাহলে বছরে কম করে বস্তা তিনেক হবে। খিচুড়ির চাল এতেই হয়ে যাবে।

কালু — রূপচাঁদ খুড়োরা আগ্রহের সাথে যেটা দিচ্ছে দিক। আর এ চালে যাতে যাচাই বন্দে হয় তার ব্যবস্থাটা করবেন এটা আমার অনুরোধ।

মুরালি — দরকার হলে দুবেলাই বন্দে দেওয়া হবে। মা যখন ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বড় জোর এক কুইন্টাল খাবে। রাতে বেশী খেতে পারবে না।

শশা — তাই হোক। বন্দের বিয়ে ? হয়ে যাক। এতেই বেয়াইএর জন্য সদু ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছিল। শালা খেয়েও ছিল প্রায় কেজির উপরে। শালাকে বলতে হয়েছে আচ্ছা খাওন দাওন। সকলেই হাসে শশার কথায়।

ভোলানাথ — বল তাহলে দারুণ পরব হয়েছে।

শশা — আমরা বলবো কেনে, ওতো বাইরের লোক বলবে। কিরে পটু কিরে রতন, ওটা তো আমাদের দুটো গাঁয়ের বাইরের লোক বলবে।

পটু — ঠিক কথা, আমাদের ঢোল তো আমরা বাজাবই।

শশা — ইস্ তুই দারুণ কথা বলেছিস্ তো।

সকলেই হাসে।

রামচরণ খুড়ো সবই মায়ের ইচ্ছা। তবে আগামী বছর আমাদের আর কিছু পাত বাড়বে। কারণ কুটুমও বাড়বে আর রনাহুত ও অনাহুত বাড়বে।

ভোলানাথ — তা পড়বে কিন্তু রবাহুত আর অনাহুতর একটা কন্ট্রোল থাকবে না হলে, কুল পাওয়া যাবে না।

শশা — বনাহুত, না অনাহুত, কি ব্যাপারটা বলতো।

ভোলানাথ — অমুক জায়গায় ভোজ হচ্ছে শুনে যারা আসে তারা রবাহুত আর যারা বিনা নিমন্ত্রণে আসে তারা অনাহুত।

শশা — ও তাই বল, এ ব্যাপারে শুধু অতিথি, ফকির, কানাকুটেরা ছাড়া আর কেউ নয়। বাড়ালেই বেড়ে যাবে, শেষে পূজোটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

রামচরণ খুড়ো — শশা ভাল কথা বলেছে। কুটুম বাটুম, আর ভিখারী কানাকুটেরা তাছাড়া আর কেউ নয়। আর যারা এবছর এসেছিল। এছাড়া যারা পাঁঠা দেবে তাদের বাড়ীরও নিমন্ত্রণ থাকবে।

ভোলানাথ — সেটা ভালই। এবছর যেটা করা হয়েছে সেটাই বলবৎ থাকবে। যারা পাঁঠা নিয়ে আসবে, তাদের বাড়ীটুকু নিমন্ত্রণ।

রতন — এখনও কুমড়ো আর পাঁঠা এখনও মুখে লেগে আছে।

পটু বলে — যা বলেছিস্।

সকলেই হেসে ফেলে শশার কথায়। শশা — কুমড়ো পাঁঠা কিরে?

গোপালের বাবা বলে, কালু বাবাজী এই চাল যখন খুশী ব্যবহার করতে পারবে নিজের জন্য। কালু আবার রবিকেওতো খাওয়ায়।

কালু — ওসব ভাববেন না। রবির দায়িত্বও আমার। রবি শুধু মন্দিরের ধোওয়া পোঁছা দেখভাল করবে।

মুরালি — তুমি যা খুশী করো — মন্দিরের দায়িত্ব তোমার। তোমাদেরও তো একই মত।

সকলেই সমস্বরে উত্তর দেয় — মুরালির কথাই আমাদের কথা।

পটু — একদিন কি কম আনন্দ ফুর্ত্তি হোল। মেয়েরা বলছে ওরা দুদিন নাচ গান করবে।

বংশী — ঠিক আছে পূজোর দিন, নাচ গান করবি পূজোর পর।

রামচাঁদ — পূজোর পরেই হবেক।

মুরালি — আর একটা খবর আছে।

ভোলানাথ — কি খবর।

মুরালি — গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা বলছে, ওরা আসছে বছর একরাত্রি যাত্রা করবে।

ভোলানাথ — তা করুক না, দ্বিতীয়ার রাতে। অমাবস্যা আর প্রতিপদ ওরা নাচুক। তার পরের রাত যাত্রা, ভালই হবে। পূজোটা আরও জমবে।

পটু — সবাই আনন্দ করুক। সিটাই তো ভাল।

শশা — দারুণ দারুণ। পূজো, খিচুড়ী, কুমড়ো, পাঁঠা, সাঁওতাল নাচ, ভুলে গেছি যাচাই বন্দে, এরপর যাত্রা — তবে একা সদু ডাক্তারে হবে না। যা করবে বুঝে সুঝে।

শেষে শশা হেসে ফেলে, ওর কথা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে লুটোপুটি খায়।

রামচরণ খুড়ো — শশার কথাটা ঠিক কথা। তবে জমবে ভাল। গাঁয়ে যেমন পূজো

থাকেনি, তেমনি মায়ের ইচ্ছেয় পূজোর মতো পূজো শুরু হয়ে গেছে। মায়ের ইচ্ছেয় সব কিছু।

হাসতে হাসতে শশা — যাত্রা, এক রাতের বেশী নয়। তাহলে মেয়েদের নাক ঝামটানি খেতে হবে।

মুরালি — শশা তুই আর হাসাস্ না। তাহলে ঠিক হোল ইন্দিরা আবাস থেকে কালুর বাড়ী তৈরী হবে। এরপর কালু যা ভাল বুঝবে তাই করবে, সে মন্দিরের চাল টাল সম্বন্ধে যা ভাল বুঝেছে তাই করবে। কালু ভাইকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও যা যখন ভাল বুঝবে করবে। রবি তুই কিন্তু মন্দির আটচালা মুছবি। তোমাদেরও কি একমত।

সকলেই সমস্বরে একই উত্তর দেয় — তোমাদের কথাই আমাদের কথা। সকলেই বাড়ী ফেরে।

যত দিন যায়, এ জায়গাটা কালুর ততই ভাল লাগছে, গ্রীষ্মে শ্বেত পাথরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমোতে কি আরাম। জানি না এয়ার কণ্ডিশনে এতটা আরাম আছে কিনা। জ্যোৎস্নরাতে জ্যোৎস্নায় অপূর্ব মনে হয় বনানী, নদীতীর, শ্মশান আর পাখীর গান। আধার রাতে তারা ভরা আকাশে টিলা, বনানী, কংসাবতীকে মৌনমুখর মনে হয়। তখনও যেদিন কংসাবতীর কথায় ছলকিয়ে উঠতে চায় দুই তীর। এখানে দুই তীর ছাপানো মানে প্রলয় কাণ্ড। আধটা ভর্ত্তি হলে নিম্ন কংসাবতী বন্যায় ফুলে ফেঁপে ঢোল। শরতের নদী তীর কাশ ফুলে মায়ের আগমনী বার্ত্তা বয়ে আনে। এই বৈচিত্রময় পরিবেশে বিচিত্র বিচিত্র চিন্তার উদয় হয়। এক জ্যোৎস্না রাতে মাদলের শব্দে ঠাণ্ডামণিরা সব ভীড় করে আসে। বিশেষ করে সেই দিনের ঘটনা। বাতাসী, বাসী আর ঠাণ্ডা মণির ঘটনা। তিনটি বন্য দুহিতার অকৃপণ দেহ মন দানে তার ভিখারীর ঝুলি ভরে যায় থরে থরে। সেইদিন রাতের অনুশোচনায় মন ভারাক্রান্ত। জবাকে দেওয়া কথা ভুলতে পারে না। জবার মুখখানা বার বার ভেসে আসে, ওর যে আকুতি, আর বিয়ে না করার। আজ সে কি করলো। জবার প্রতিশ্রুতি জলে ভেসে গেল খনিকের জোয়ারে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। ভীষণ অনুশোচনা জাগে। বিবেকের দংশনে। ঘটনার খুটি নাটি মনে আসে আর অনুশোচনা আঘাত খায়। এছাড়া আরকিই বা আছে। উপায় যখন নেই। তখন সাক্ষী রেখেছে আকাশের সূর্য্য দেবতাকে, আর অর্ন্তযামী মা কালীকে ঈশ্বরকে, মা আমার শেষ কোথায়, এরূপ পরিস্থিতি ডাকে সাড়া না দিলে তার পাপই হবে। পুরাণের পাতায় অনেক ঘটনা মনে আসে। এসব ভাবতে ভাবতে তন্দ্রায় মনে হয়, জবা আসছে আর বলছে, তুমি তো ভিখারী তোমার কি জবা আছে, আর এদের মাঝেই আমাকে খুঁজে নিও। তোমার মতো ভিখারীকে দেখলে যে মায়া হয়। তুমি যে আমার কালা চাঁদ, কালা চাঁদ কি কখনও একার কি রাধার। তোমার অনুশোচনার মাঝেই আমি জবা বেঁচে আছি এবং থাকবো। কায়মন বাক্যে ভিক্ষার দান নিয়ে কিছু দোষ করনি। অনুশোচনায় ভরা মন, ক্ষণিকের জন্য আনন্দে ভরে যায়। কালাচাঁদ ডাক এতোদিন শুনলে, শোনা শোনা মনে হোত। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, জবাই কোন একদিন কোন সময়ে আদর করে বলেছিল কালাচাঁদ। ভীষণ ভাল লাগে, কানের কাছে আজও বাজে কালাচাঁদ। মনে হয় জবা যেন আবার নতুন করে এসেছে তার জীবনে। সত্যিই তো কালাচাঁদ কি

কারও কি একার। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল নিজেকে কালাচাঁদের সাথে তুলনা করা মহাপাপ। তবে লোক যদি কালাচাঁদ বলে তা সেকি করবে। গোপালের ঠাকুমার কালাচাঁদ, আর জবার কালাচাঁদ কি এক। আবার ঠাকুমার স্নেহ, আর জবার ভালবাসার মাঝে যশোদা আর রাধার কালাচাঁদকে খুঁজে পায়। মানুষকে স্নেহ ও ভালবাসার অধিকার সকলের আছে মনে হয়। কায়ময় মনবাক্যে ভালবাসা ও স্নেহের ডাকে সাড়া দেওয়া হয়তো উচিত। এসব ভাল মন্দর নিক্তি বিচার তার মাথায় কুলোয় না। তবে জবার কথা ঠিক। যে ভালবাসবে কায়মনবাক্যে তারই কালাচাঁদ। স্নেহ, ভালবাসার ভিখ্ কি অবহেলার। মনটা একটু ভাল হয়। অনুশোচনা বোধটা তার কেটে যায় কিছুক্ষণের জন্য। সে হিসেব করে এই দিন সে কতটুকু ভালবাসা পেয়েছিল, ভালবাসার পথ অনেক। ভাবতে থাকে নিঃস্বার্থ দেহদান কি ভালবাসার নমুনা। ভেসে ওঠে মানসপটে ওকি, পাগল করা বন্য দুহিতাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। ভিখারীর কি আছে মন ছাড়া। সে আজ ভিখারীর ভিখারী। মনে পড়ে যায় ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে তোমারে করেছে রাণী। সত্যিই বন্য দুহিতারা রাণীর চেয়ে বেশী কিছু। বুঝতে অসুবিধে হয় ভালবাসা আর কামনার পার্থক্য। বৈশাখে, জ্যৈষ্ঠে বন্য দুহিতারা মিষ্টি মিষ্টি আম খাইয়েছে, খাইয়েছে বৈঞ্চি, শাক, পিয়াল আর ভীষণ প্রিয় জাম......আরো কতকি! আমি কিছু খেলে, কিছু নিলে, ওরা খুব আনন্দ পায়। আনন্দে তৃপ্তিতে তাদের হাসিটুকু আমাকেও অনাবিল তৃপ্তি দেয়। হৃদয় ছাপিয়ে যায় এক অজানা আনন্দে। সে আনন্দ কি মধুর, বলা মুস্কিল। সে আনন্দ এক সীমাহীন সুখের সাগরে গাহন। আজ পথ ধরেছে মণিপুরের দিকে। পরে দেখা হয় বাতাসীর সাথে। হেঁসে বাতাসী শুধায় আজ কোন দিকে।

কালু উত্তর দেয় — মণিপুর ভাবছি।

বাতাসী — দাঁড়া, আমিও যাব ওদিকে।

কালু — তুমি এসো। আমি একটু আসছি।

হেঁসে বাতাসী — আমাকে ভয় লাগছে।

কালু — আর ভয় কি? সেদিন ভয় কেটে গেছে।

বাতাসী — বলিস কি? দাঁড়া, ওদেরকে বলবো। তবে দাঁড়া ঘর থেকে আসি। তুর সাথে কথা বলতে ভাল লাগে। তুর সাথে কথা বলতে বলতে একটু বনে যাবো। কাঠ ফুরিয়ে গেছে।

কালু — এসো তবে।

কাটারি আর গামছা নিয়ে কালুকে অনুসরণ করে। বনপথে হাঁটছে ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা হয়।

বাতাসী — তুই আসবি জানলে ওরা রায়পুর যেতো না। তোমরা আমাকে কাঁড় বিঁধিয়ে মায়া করাবে।

বাতাসী — কোন ভয় নেই। আমাদের ভালবাসাবাসি কেউ টের পাবে না। তোকে আমাদের সকলে দেবতা মনে করে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে মরদ। তোর সাথে একসাথে ঘুমুলেও কেউ কিছু মনে করবে না।

কালু — মিছে কথা বলছিস্। তবে এতটা নয়।

বাতাসী — একদিন প্রমাণ দিব। আমাপ মরদের মুখেই কথাটা শোনাবো। তোকে কেউ অবিশ্বাস করে না। আর তুই কি জোর করেছিস আমাদের। আমাদের ভাললাগলো তোকে, তাই সব কিছু দিয়ে দিলুম। তুই আমাদের তোদের কৃষ্ট ঠাকুর আছিস, আমরা তো তোর রাধিকারা।

কালু — এসব তোমরা জান দেখছি, কৃষ্ণ সকলের।

বাতাসী — রাণীবাঁধে একটা ঘরে প্রথমে, বস্ত্র হরণের একটা পঠ দেখে হেঁসে মরেছিলুম, আমি আর ঠাণ্ডামণি। সেদিন আমাদের হাসি দেখে একটা মাঝ বয়সী বৌ জিজ্ঞেস করে আমরা হাসছি কেনে।

তারপরে — রসে বসে হাসিতে যা বলেছিল তাতে অবাক হয়েছিলুম। তোদেরর ঠাকুর বস্ত্র হরণ করতে পারে। বাবু গাছের ডালে কাপড় রেখে আবার বাঁশী বাজাচ্ছে। আর তুই কিনা সেদিন লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলি। তারপর দেখলুম ভয়েতে ছলাকলা। তাই তোর লজ্জা ভাঙ্গাতেই আমাদের জিদ্ চেপে গেল, তোকে নিয়ে গেলুম কুঞ্জে। বল্ আমাদের বডি তোদেরর মেয়েদের চেয়ে অনেক ভাল, রংটা একটু কালো। তোর রংটা কালো, কিন্তু গড়নটা কি সুন্দর। তোকে দেখে মেয়েদের মন ভুলে যায়। আর তোর ঐ কৃষ্ট ঠাকুরতোও কালো। তুই আমাদের কৃষ্ট ঠাকুর। বাঁশী বাজাতে জানিস, বাঁশী বাজালেই হাজির হব তুর কাছে।

খিল্ খিল্ করে হাসছে বাতাসী। আর কল্ কল্ করে কথা বলছে। মুর্খরমণীর ধ্যান ধারণা তাকে অবাক করে দিচ্ছে। কৃষ্ণ প্রেম আর রাধা প্রেম কি আজও সে জানে না। কৃষ্ণ প্রেমে রাধিকারা পাগল কেন কে জানে না। তার মনে হয় কি জগতের শ্রেষ্ঠ সার কি ভালবাসা। তাই কি পরনারী ঘর ছাড়ে সেই আশায়। মানুষ সামান্য ধন ছাড়ে বৃহৎ ধনের আশায়। স্বামী পরিত্যাগ করে কৃষ্ণগামী হয় কারণ কি? স্বামীর কাছে যা কাম্য ভাল ভালবাসা পায় না বোধ হয় কিন্তু কৃষ্ণের কাছে সব পায় বলেই, কৃষ্ণগামী। নানা ধরনের এইসব আজেবাজে কথা ভাবছে আর বাতাসীর কথার উত্তর দেয় হুঁ হাঁ করে। হঠাৎ চলতে চলতে সেই জায়গায় হাজির হয়। বাতাসী মুচকি হেসে বলে — যদি না কুঞ্জে গেলে ভয় নাই। তবে বাসী ও ঠাণ্ডামণিকে জানাতে হবে। তোকে একা ভোগ করে বেইমানী করবোনা। একদিন ওদের সাথেও সেই কুঞ্জে যেতে হবে। শরীরটা অবশ হয়ে আসছিল কালুর, হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যায় সেই কুঞ্জে। এখনও সেদিনে শালভালও পাতার শয্যা শুকিয়ে গেছে, যেন শ্যাম বিংহনে। কালুও হাজির হয় — সে চলেছে মরতে। নেশায় শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। মানুষ তো নেশা ও ড্রাগেই মজেছে। মৃত্যু তার অনিবার্য্য। প্রকৃতির মাঝে আদিম বন্যতার সারল্যের মাধুর্য্য আছে। আর মাধুর্য্যের মধুরিমায় মুরলি ধ্বনির ধ্বনিতে হারিয়ে যায় অন্য এক মধুময় জগতে। সেদিন আর ভিক্ষা হয় না। মনের ভিক্ষাতেই ভরপুর। এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে রবি জানায়। শরীর খারাপ নাকি। কালু মাথা নাড়িয়ে উত্তর — হ্যাঁ।

আজ চলেছে ভোগড়া, ভোগড়ার পথে খয়রা শোল পথে পড়ে না। কিন্তু মন চলে ক্ষণে ক্ষণে ঐ খয়রাশোলের পথ হয়ে মনিপুরে। মনিপুর যাওয়া হয় না খয়রাশোলকে এড়াতেই। তাই আজ ভোগড়ায় যায়। ভিখ্ ভিখ্ করতে সেই বাড়ীতে পৌছায়। গিন্নীমা ছিল, বড়দা ছোটভাই, মেজভাই সবাই ছিল। গিন্নীমা — এসো বাবা এসো। তোমার কথা

মাঝে মধ্যেই হয়। একটু বোস। আজকে চারটি সেবা করে গেলে কেমন হয়।

কালু — জানেন তো মা, আমার জন্য আর একজন পথ চেয়ে থাকবে। আমি না গেলে তার খাওয়া হবে না।

গিন্নীমা — তার জন্য ভাবতে হবে না। তুমি যা খাবে, তার জন্য তুমি তাই নিয়ে যেও। তুমি এ বাড়ীতে একটু সেবা করলে আমরা ধন্য হব। এটুকু সুযোগ দাও।

ছোটভাই — এই বৈরাগী দাদা, মা যখন বলছেন, একটু সেবা করেই যান। সেদিন থেকে বাড়ীটা যে কি সুখে আছে বলবো। ভাবছিলুম একদিন গিয়ে ডেকে আনবো। আমরা সব শুনেছি। ইন্দ্রসোলের মন্দির, আর পূজোয় জাঁকজমক, এঅঞ্চলে এখন মুখে মুখে। ভেবেছেন, আপনাকে চিনি না।

কালু — এমন কিছু না। "মা-ই" সব ব্যবস্থা করে দিলেন তাই হয়ে গেল। তাঁরই ইচ্ছায় সবকিছু হয়, মানুষের ইচ্ছার কি দাম আছে।

বড়ভাই — কথাটা ঠিক। তবুও মানুষ নিমিত্ত মাত্র। আপনার মাধ্যমেই সবকিছু মা করিয়ে নিলেন। আসুন আসুন, আজকে একটু সেবা করে যাবেন। আপনি যে আমাদের কি উপকার করেছেন সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

মেজভাই — আপনার সাথে আমার আলাপ পরিচয় নেই। তবু জেনে গেছি, আপনিই আমাদের বাড়ীর দেবদুত। সংসারটা ভেসে যাচ্ছিলো, আপনি আমাদের বাঁচালেন। আমরা কেমন আছি একটু দেখে যাবেন না।

কালু — সকলেই, সুখে আছেন দেখতে তো সব সময়ই চাই, কিন্তু দেখতে পাই না তাই কষ্ট পাই। জানেন তো ভিখারী হলেও এ জিনিষটা বুঝি। আপানারা সুখে থাকলে, আমরাও সুখী হব। এই যে আপনারা আমাকে এতটা সম্মান দিচ্ছেন এতেই সুখ। আচ্ছা সেবা করেই যাবো। রবির জন্যও নিয়ে যাবো।

মেজভাই — রবি কে?

কালু — রবি আমরাই সাথে থাকে, একজন খোঁড়া মানুষ, আমরা দু'জনে মিলেই থাকি।

বড়দা — কালুভাই এর দয়ার শরীর, ইন্দ্রসোলের একজন লোক বলছিল পূজোয় পয়সা চাল কড়ি কিছুই নেয় না। ডিমেতেই চলে। কালুভাই মাছ খাওতো।

কালু — গাঁয়ের লোকে ছাড়তে দিলে কৈ?

গিন্নীমা — বেশ করেছো, এই বয়স থেকে এত সব নিয়ম মানার কি দরকার? এখনইতো খাবার সময়। রবি শ্যামল তোরা যাতো বাবা মাছ ধরে নিয়ে খিড়কি থেকে।

বৌরা ততক্ষণে কাগজী দেওয়া এক গ্লাসে সরবত্ নিয়ে হাজির। ছোট বৌ হাতে সরবত্ ধরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে কালুকে, কালু প্রণাম না করতে দেওয়ার সুযোগই পায় না। সেজবৌও প্রণাম করে। বড়বৌকে বৌদি বলে বলে — বৌদি আপনিত কি আমাকে প্রণাম করে আমাকে পাপী করতে চান। তাহলে করুন। বরং আপনি আমার নমস্কার নেন।

সকলবৌরা, বড়দা ও মাকে সকল বৌরা প্রণাম করে। আর ছোটবৌ বাদ দেয় না মেজজা ও মেজ ভাসুরকে। ওরা সকলেই খুশী। ছেলেরা সকলেই অবাক হয়ে দেখে। ওরা

ভাবছে আজ কি বিজয়া। ক্লাস ফোরে পড়া মেজর ছেলে বলে — ঠাকুমা আজকি বিজয়া।

গিন্নীমা — আজ বিজয়া। তোরাও প্রণাম কর।

পাঁচ ছয় ভাই বোন ঝপাঝপ্ কালুকে প্রণাম করে। কালু গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কালুর নির্দেশে, ওরা বাড়ীর সকলকেই প্রণাম করে। বেলা দশটা বাজে। কালুর সাথে বড়দা মা সকলেই নানান কথা বলে। মাঝে চাও বার দুই দিয়ে যায়। গল্প চলছে। ওদের মাছ ধরা হয়ে গিয়েছে। মাছ একটা বড়ই পেয়েছে - কেজি দেড়ের উপর প্রায় দু কেজি হবে। খিড়কীর পুকুর। মাছ ভালই আছে ওরা বললো। রুই মাছটা লাফাচ্ছে লালচে রং ধরেছে। গিন্নীমা, মাছের ঝোল কর আর ভাজাও রাখবে। ছোটবৌ আনন্দের সাথে মাছ কাটছে কলতলায়। বড় আর মেজবৌতে রান্না ঘরে। পিঁড়েতে বসে রান্না ঘরের কাজও দেখা যায়। ছোট ও মেজ ভাই স্নান সেরে বসেছে, বড়দা ও কালুর কাছে। ঘুরে ফিরে তিন ভাই ও মা আর মাঝে মাঝে বড় বৌদি কালুর গুণ কীর্তন করে। সেদিন কালু না এলেই সংসারটা ভেসে যেতো। তিনভাই আর তিন বৌতে কি মধুর সম্পর্ক তা মুখে বলা যাবে না। কথায় কথায় পূজোর খবরও আসে। বড়বৌদি বলে — আমরা কিন্তু এবছরে পূজোতে যাবো। কালু বলে — অবশ্যই যাবেন, বরং না গেলে দুঃখ পাবো। একেবারে রাতে খেয়েদেয়ে আসবেন, থাকলেও ক্ষতি নেই। রান্না শেষ। বড়দা স্নান সারে। কালু দেখল শুধু তারই জায়গা হচ্ছে।

কালু বলে — তা হচ্ছে না। আমরা আজ সকলেই খাবো একসাথে তিনভাই তিনবৌ, ছেলেরা ও মা। মা সকলকে খেতে দিয়ে শেষে আমাদের সাথে এক সাথেই বসবেন।

বড়দা — কালু যেটা বলেছে সেটাই ঠিক। আমরা সকলেই একসাথে। সমস্ত পিড়ে জুড়ে জায়গা করা হয়েছে। থালায় থালায় ভাত সাজা হচ্ছে। সকলেই খেতে বসে। তিনভাই, ছেলেরা ও কালু আর তিন বৌ ভাত ইত্যাদি বয়ে বয়ে এনে শেষে নিজেরাও বসে। শেষে মা বসবেন ভাত তরকারী দিয়ে। তিনবৌ বসলে থাকলে খেতে বসে। কালুকে সবকিছু তরীকারী বেশী দিয়েছে। কালুর দুইপিস্ ভাজা আর একটা বড় বাটি ভর্ত্তি মাছ আর ঝোল। কালুর আপত্তি শোনে না। শুধু গিন্নীমা নয়, তিন ভাই, তিন বোনী ছেলেরাও একসাথে অনুরোধ করে। ভালবাসার ধনকে উপেক্ষা করা যায় না। সকলেই পরমতৃপ্ত, যারা স্বার্থপর, নিজের জন্য সুখ সুখ করে কেঁদেই পাগল তারা যদি দেখতো যৌথ পরিবারে, ভাল ভাল তরিতরকারী নয়, মিষ্টান্ন, ফলমূল নয়, সেখানে প্রতিদিন অমৃত সেবন হয় এবং সেখানে হাজারো বিনোদন না থাকলেও, মা, দাদা, দিদি, বৌ, কাকা, জেঠা, ঠাকুমা সম্বোধন ধ্বনি যেটা টিভি, স্টিরিও, সিডিতেও এ দৃশ্য ও গান শোনা যায় না। এগান অন্তর থেকে তৈরী, এছবি স্বতস্ফূর্ত এখানে অভিনয় নেই। খাওয়ার দৃশ্যও কথোপকথনের যদি ভিডিও টেপ হোত, তাহলে নি ন্যাচারালই না হোত। কথায় কথায় খাওয়া এগিয়ে চলে। যে যার ক্ষোভ ব্যক্ত করে কালুর নির্দেশে। কালু বলে যদি কারও কিছু ক্ষোভ থাকে তাহলে ব্যক্ত করতে। কেউ কিছু বলে না, সকলেই বলে কোন অভিযোগ নেই কারোর প্রতি। পরন্তু কথাটা বার বার ঘুরে ফিরে আসে, কালু দেবদূত। তাদের সংসারে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে। কালুও বলে আমিও দেখতে চাই পৃথিবীর সমস্ত পরিবার যেন এমনই হয়। এখানে যেটা পাওয়া

যায় যা জগতের অমূল্য সম্পদ। সকলেই পরিতৃপ্ত, খাওয়া শেষ। একটা ব্যাগে খাবার বেঁধে দেওয়া হোল রবির জন্য। কালু বলে এটা রবির হাতে দিয়ে পাঠাবে বিকেলে। কালু ফিরে আসে। রবি তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত। এতক্ষণ রান্না সারা হয়ে যায় বেলা তিনটে বেজে গেছে এখনও দেখা নেই। অবাক করে দিয়ে কালু হাজির হয়। শুধু বলে নাও খেয়ে নাও। আর খেয়ে থালাবাটিগুলো বেড়াতে বেড়াতে একবার ভোগড়ায়, সমীর, রবি, শ্যামল ঘোষের বাড়ীতে দিয়ে আসবো। ততক্ষণে রবি ভাত খেতে বসে গেছে। খেতে খেতে বলে, এতো মাছ। রান্নাও কেমন সুন্দর। তৃপ্তিতে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু জিরিয়ে নিয়ে সে হাঁটা দেবে।

রবি যাব যাব করছে, ঠিক সেই সময় তিনটি মহিলা হাজির একমোট ছাতু নিয়ে। ভালই হোল। কালু অর্ধেক পরিমান দিয়ে দেয় বাসনকোসনের মধ্যে। বাকিটা থেকে যায়।

বাতাসী — রবিদা কেমন আছিস?

রবি — আবার কেমন। কোথায় পেলি এগুলো?

ঠাণ্ডামনি — ভালুকা বাঁধের দক্ষিণে।

রবি — অনেক ফুটেছিল?

বাতাসী — ঢেরই বটে।

কালু — সেটা আবার কোথায়?

ঠাণ্ডামনি — জায়গাটা বড় সুন্দর। সেই জায়গাটার কিছু দক্ষিণে যাবি। চারদিকটা পাহাড়ে ঘেরা, জলটা গাছে ঘেরা, কাজল কালো জল, পদ্ম নাই, শালুক সাপলাতে ভর্ত্তি। ওখানে দেবতা থাকে কেউ যায় না, জিন্ নামে, অপদেবতা থাকে।

কালু — কতটা জায়টায় জল থাকে, একটা পুকুরের মতো। মাঝে মাঝে বাঘ, নেকড়ে, নানারকম জন্তু দেখতে পাওয়া যায়। আমাকে একদিন নিয়ে যাবে।

যদিও একদিন মনের খেয়ালে ঘুরতে ঘুরতে ওখানে গিয়েছিল। অপূর্ব জায়গা হেসে হেসে বাতাসী — হু তো ভাল কথা।

কালুও হেসে হেসে — গাছ পালা, পাহাড় ঘেরা নদী, বাঁধ, পুকুর ভীষণ ভাল লাগে।

ঠাণ্ডামনি — আমরা চার জনেই যাবো, বিকেলের দিকে। কথাটা বলা হয় নাই। পরশু দিন জন্মাষ্টমি। তোর নিমন্ত্রণ।

কালু রবিদা তুমি চলে যাও, সকাল সকাল আসবে।

রবি চলে যায়, ব্যাগে বাসন পত্র নিয়ে।

কালু — কবে নিমন্ত্রণ।

বাতাসী — পরশু। উদিন আমাদের ঘরে তুই রাধবি খাবি আর আমাদের খাওয়াবি।

কালু — কি, খাওয়াবি, উঃ দিন ভাত খেতে নাই।

ঠাণ্ডামনি — লুচি করবি। তুই খাবি, আর আমরাও খাব।

কালু — কাদের বাড়ীতে?

ঠাণ্ডামনি — একটা কথা বলা হয় নাই। সেদিন তুই আর বাতাসী মজা করলি। কালুদেরও রসিকতায় পেয়েছে আজ। আজ মনটা বাতাসের মতো ফুরফুরে, ভোগড়ার

ঐ পরিবারের শান্তির নীড়ে মনটা ভীষণ শান্তিতে আছে, খাওয়া দাওয়াও কত যত্নে কত সুন্দর।

তাই কালু বলে — যে খায় ননি, যোগায় চিন্তামনি।

ঠাণ্ডামনি হাসতে হাসতে — বড্ড কথা বললি, তুই আমাদের চিন্তামনি। তুই তো যোগাবি। তুই-তুই-তুই করছিস্।

বাতাসী — ঠাণ্ডামনি, ঠিক বলেছে। তোরা দুজনে মজা করলি আমাদের বাদ দিয়ে।

বাতাসী শুধু হাসতে থাকে।

কালু — বাতাসী বড্ড বোকা আছে।

ঠাণ্ডামনি — বাতাসী তো বেমান লয়। আমাদের মধ্যে সই কিত্তি করা আছে। মিছে কথা বলবি না, এ ব্যাপারে, এ ব্যাপারে আমরা তিনটিতে এক।

কালু বুঝে এটা কত সহজ সরল, এব্যাপারে নিজেদের মধ্যে স্বার্থপরতা নেই, যেখানে কোন নিয়ম চলে না। প্রেমের ক্ষেত্রে কখন কি যে নিয়মে চলে একমাত্র ভগবাইন জানে।

কালু বলে — আবার একদিন মজা করা যাবে।

ঠাণ্ডামনি — কবে।

বাতাসী — পরশু। দুপুরে খেয়ে দেয়ে জায়গাটাতে বেড়াতে যাবি সিখানে।

বাসী — ঠিক, কিন্তু, আমরা সেদিন জন্মাষ্টমী করবো।

কালু — কেন জন্মাষ্টমী করবি।

ঠাণ্ডামনি — তুই আমাদের কৃষ্ট, তোকে পেতে। সত্যিকথা কি তুই দেখতে পটের কৃষ্টর মতো, চুলটা উপরে ঝুঁটি বেঁধে চুড়ো করে বাঁধবি। একে বারে কৃষ্ট হয়ে যাবি।

বাতাসী — তুই বাঁশী বাজাতে পারিস?

কালু — অনেকদিন আগে বাজাতুম, এখন নয়।

বাসী — বাজা দেখি।

কালু নিয়ে আসে বাঁশী, বাজাতে থাকে। মোটামুটি বাজায় এখন। কালু বাজিয়ে যায়, তিনজন তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে। গান ধরেছে। "ভরা ভরা যাক স্মৃতি সুধায়।"

ঠাণ্ডামনি — কি গান বাজাচ্ছিস্?

কালু — রবীন্দ্র সঙ্গীত।

ঠাণ্ডামনি — গানটা বল, ভরা ভরা যাক স্মৃতি সুধায় . . .। মানেটা বল দেখি বুঝিয়ে।

কালু বুঝিয়ে বলে — ওদের তিনজনকে কালু জীবনে এরূপ নির্বাক শ্রোতা, কখনও দেখেনি। আবার শ্রোতারা যেখানে মনের মানবী, পরিবেশ বড় সুন্দর ভরা ভাদরের নদী তীরে, সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে হেলছে, নদীর উৎস পথে যেন আকাশে মেঘে জলে সোনা রং ধরেছে, বনানী, নীল টিলাতে, ছোট পাহাড়েও। কালুর মনও কানায় কানায় ভরা এই স্মৃতিকে যে মানস পটে, বাঁশীর সুরে সুরে এঁকে নিতে চায় সুখের স্মৃতি দিয়ে।

গানের সুরে বক্তা নদী কূল, ছাপিয়ে যেন এক অন্তর্লোকে যাত্রা করতে চাইছে। প্লাবিত হচ্ছে তিনটি আদিম মানবী, যারা এই সভ্যতার বেশী মারপ্যাঁচে বোঝে না। বুঝেছে গানের

অন্তর্নিহিত মানে, ক্ষণিকের জীবন বেলায় ওরাও তাই রাঙিয়ে নিতে চাইছে জীবনে স্মৃতি সুধায়, ভরিয়ে নিতে চায় জীবনকে ঘটনা প্রবাহে। গান শেষ হয় ওরা চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ, সন্ধ্যা নামতে বেশী দেরী নেই। ওরা বাড়ী ফেরে না। কালু বসে বসে ভাবে জীবনের কথা - জীবনের শুরু, যৌবন শেষে বার্দ্ধক্য শেষে, শেষের বেলার কথা। এরই মাঝে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি। নদী যেমন চলার পথে শেষে তার সাগরে পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ণতা ঘটায়। ফুলের পূর্ণতা ফলে, তেমনি নারী জীবনের, মানব জীবনের প্রতিটি ধাপের প্রতি পর্যায়ের পূর্ণতা পাবে সামগ্রিক জীবনের পূর্ণতা খোঁজে, এই অলস স্মৃতিসুধা ভরা নদী কিনারে অলস বিকাল বেলায়। তিনটি ফুল সৃষ্টির নিয়মে বাঁধা, যেন যৌবনের পরিপূর্ণতাকে সার্থক করতে চাইছে। রবি বলে — আরো কত কি? রবি ফিরে আসে। ভীষণ খুশি ছাতু পেয়ে। আমাকে সব শুনিয়েছে। আর বার বার শুনিয়েছে তুমি দেবতা। গোটা সংসারটা জলে ভেসে যেতে বসেছিলো। তুমিই বাঁচালে। আজ ওদের সংসারে সুখের শেষ নেই। গিন্নীমা বার বার জানিয়েছে এমন মানুষ হয় না, বড়দা সহ সকলেই কি না খুশী! ছাতুর ব্যাপার জানতে চায়, বৌয়েরা। আর কতকি জিজ্ঞেস করে ওরা, ঠিক রাঁধতে পারে কিনা, দিনে বা রাতে কি কি রান্না হয় কেমন রাঁধে। আমি ডিম বেগুনের রান্নাটা ও জানিয়ে দিয়ে এসেছি। মুখে যেন লেগে আছে। ওরা রেধে দেখবে লোকগুলো সব কি ভাল! আমাকে চা করে খাওয়াল, এক পলিথিনের মুড়ি দিয়েছে, সের পাঁচ হবে। দেরী হলে খেতে বলেছে। আমাকে যেতে বলেছে। সত্যিই কালুদা তুমি দেবতা। ওরা লোক চিনতে এতটুকু ভুল করেনি। সাঁওতাল পাড়ার সকলেও তো তোমাকে দেবতা বলে। সত্যিই তুমি যাদু জানো। দুটো গাঁয়ের লোকও কি কম মানে। আজকি মনে করে রবিকে বাঁশী বাজাতে বলে। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। রান্না হবে ছাতু আর ভাত। রান্না চাপায় কালু। রবি বাঁশী বাজায়। সুরের মূর্ছনায় নির্জন নীরব নদীপ্রান্তর আরও আর নির্জনও নীরব।

বাঁশীর সুরে 'ঝড় উঠেছে, বাউল বাতাস . . .।'

ঠাণ্ডামনিরা সব কিছু শুনে বাড়ী ফেরে। বলে তুই দেবতা আছিস্।

বাউল বাতাসে এই কয়দিনে কালু পথ হারা পথিক মনে করে নিজেকে। জীবন পথে সঠিক চলা হচ্ছে কিন্তা সে ভেবে ভেবে কুল পায় না। দৈব যেন তাকে নির্ঝামেলায় জীবন কাটাতে দেবে না। দৈব কি যেন চায় খুঁজে পায় না। আউলবাউল বাতাসে নিজেকে দোষী মনে হয়। আবার পরে মনে হয় যা ঘটেছে তাও খণ্ডানো তার পক্ষে ক্ষমতার বাইবে। আবার ভয়ে প্রাণটা সিঁটিয়ে থাকে এই বুঝি খয়রাশোলের সাঁওতালেরা মেরে ফেলে। বিশ্বাস ঘাতকের বিচার মৃত্যু দণ্ড। মনে হয় দৈব যেন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চরম শাস্তির দিকে। অনাগত ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। জীবনের বিচিত্র গতির কথা ভাবে, একদিকে সে বিশ্বাস ঘাতক আবার অপরদিকে দেবতা। বিশ্বাস ঘাতক কোনদিনই দেবতা থাকতে পারে না। তাকে সংযমী হতে হবে কড়া নির্দেশ। কিন্তু জীবনের ধমকে অস্বীকার করা যায় না, কতকি ভাবে আর রাঁধে।

.

চার ভাইয়ে ঝগড়া বেধেছে। কেউ কারও চেয়ে কম চায় না। বৌরা সোতা দিয়েছে,

বুড়ো বুড়ি কপালে হাত চাপড়ায়। ঝগড়া এমনই বড় ভাইকে তিন ভাই মারছে, একটি যুবক আড়াল করতে চায় পারে না। আর সকলে মেয়ে পুরুষ দর্শক। কেউ ছাড়াতে যায় না, মজা দেখছে, মা বাবা কেঁদে আকুল। আর বড় বৌ অসহায়, কিন্তু মুখে বারুদের মতো গালে গালে অগ্নি বর্ষণ করছে। এদিকে একটা ভিখারী ধমকে জনতাকে বলে, কি দেখছেন আপনারা, ছাড়িয়ে দেন, লোকটাকে মেরে ফেলবে যে, কেউ যায় না, মজা দেখতে থাকে। ভিখারী মজা দেখতে খুব মজা না। এরপর ভিখারী বড়ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে মেরে তবে একে মারবে। রাগে ফুঁসতে থাকে, মাথা কেটে গেছে রক্ত বের হচ্ছে। রাগে তিন ভাই ফুঁসতে থাকে। ভিখারী বলে, আপনারা সব দাদা ভাই শুনছি, আপনাদের দেহে একই রক্ত বইছে। রক্ত দেখে ব্যথা লাগছে না। এখনও দেশে ভাল লোক আছে, তাদের নিয়ে নিজেদের দোষ একটি বিচার নয়, সংশোধন করে যদি নিতে না পারেন নিজেদের তবে আপনারা মানুষ নামের অযোগ্য আপনাদের কোন হুঁশ নেই। বয়সে সবচেয়ে কম, সে উত্তর দেয় আর জ্ঞান দিতে হবে না, যা করেছে শুনলে ওকে তুমিও জুতো পেটা করবে।

ভিখারী — যাক ভাই জুতো পেটার দরকার নেই। মানুষের গায়ে হাত দিলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো তাহলে আর সমস্যা থাকতো না। আমি জ্ঞান দিচ্ছি না। আপনারা একটু চুপ করে বসুন না হয়, বাইরে যান। যে মার খাচ্ছিল তাকে টেনে ওদের বাবা মায়ের কাছে নিয়ে যায়। গামছা দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দেয়। মাতো কেঁদে আকুল, আমার গোপীকে মেরে ফেলেছে রে। এই দেখে বড়বৌ কাঁদতে কাঁদতে বলে ওগো কে কোথায় আছো হাঁদার বাবাকে মেরে ফেললো গো, ঘরের বাইরে কোথায় গেল কে জানে। আধ ঘন্টার মধ্যে বাড়ীটা নীরব। অনেক দর্শক, মজলো না দেখে হতাশ হয়ে বাড়ী ফেরে। আবার কেউ কেউ নূতন করে খবর নিতে এলো, তারাও হতাশ হয়ে বাড়ী ফেরে, কেউ কেউ বড় বৌএর একবার খবর নেয়। বড়বৌকে না পেয়েও, তারাও একই পথের পথিক। রক্ত ধরে গেছে, গাঁদা পাতা দলে মাথাটা ছেড়া কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়। হাত টাত ধুয়ে, যাবার জন্য তৈরী। যাবার আগে বলে, ওদের তিনজনের কাছে যায়, বলে — ভাই দাদাকে কি মারতে আছে, গাঁয়েতে অনেকে আছেন কোন রকমে মিটিয়ে ফেললেই পারতেন। দেখবেন দাদাকে একটা টেড্‌ব্যাক ইনজেকসন্ দেওয়া করাবেন। ছোটভাই — তুমিই দিয়ে দাও, এতো যদি দরদ। শালা আমাদের সব ঠকিয়ে এক বিঘা জমি ছেলের নামে করেছে। আমরা ফেলনা। শালাকে একদিন মেরেই ফেলবো। তুমি যাও বেশী বাহাদূরী করলে তুমিও মার খাবে। একটা ভিখারী আবার জ্ঞান দিচ্ছে।

ভিখারী — আমার জ্ঞান দেবার কি আছে, ? তবে মুর্খরা দাদার গায়ে হাত দেয় না, যারা শিক্ষিত, বিদ্বান হিসেবী তারাই বোধ হয় এটা করে। আমি পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দেখে বলছি। যাক আমাকে যা ইচ্ছা বলুন ক্ষতি নেই, আর ঝগড়া ঝাটি করবেন না।

হঠাৎ বড়বৌকে কাঁদতে শোনাগেল, হাঁদার বাবাকে মেরে ফেলেছে গো। আমি কি

করবো গো।

একটা লোক প্রবেশ করে। লোকটি বড়দাকে, ডেকে বলে, ভীষণ রক্তপাত হয়েছে দেখছি। রাইপুর হাসপাতালে না গেলে নয়।

ভিখারী — ভদ্রলোকের কাছে যায়। এইদিকে, বৌদি একটা জামা নিয়ে বলে — নাও এটা পরে নাও। ঠাকুরপো তুমিই সাইকেলে নিয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কেউ বা আছে। আমার সবাই শত্রু, না হলে এরকম মার কেউ মারতে পারে। কি হবে ভগবান জানেন। ভিখিরীটা না এলে মেরে-ই দিত, দস্যুগুলো।

ভদ্রলোক — বাধ্য হয়ে যেতে হবে। আমিতো গাঁয়ের মেম্বার আমারও একটা দায়িত্ব আছে। তুমি নিয়ে এসো আমাদের বাড়ীতে। আমি সাইকেলটা বের করি। টাকা কড়ি নিয়ে তুমি কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসো, যদি বাঁকুড়া যেতে হয়।

ভিখারী — হাসপাতালে, না গেলেই নয়।

ভদ্রলোক — অনেকটা কেটে গেছে, মাথার আঘাত স্ক্যান করতে যদি হয়।

ভিখারী — ডাক্তার তো স্ক্যান করতেই বলবে। তবে তেমন কিছু না, এখানে হাতুড়ে নেই, টেড়্‌ব্যাক দিয়ে ব্যান্ডেজ করলেই চলবে।

ভদ্রলোক — তুমি দেখছি, ভিখিরই নও, ডাক্তারও।

বড়বৌ — ভিখিরীর কথা ছাড়, তুমি চলতো।

ভিখারী — আমি ভিখারী, কিন্তু যা দেখেছি কপালটাকে কেটে গেছে, তাতেই যা রক্ত পাত হয়েছে। সে রকম কিছু হয়নি।

ভদ্রলোক — গোপীদা এসো, মাথার চোট খারাপ জিনিষ।

ভিখিরী — চোট্ বেশী নয়, যাবেন না বড়দা।

মা — না হাসপাতালেই নিয়ে যাও। কি হতে কি হয়।

ভিখিরী — না মা দেখলেন্ তো রক্ত প্রায় ধরে গেছে। তাছাড়া গাঁদা পাতার রসে না ধরলেও ধরে যাবে।

ভদ্রলোক — ভিখিরীগুলো বুজরুকি করতেও ছাড়ে না।

ভিখিরী — আমি ভিখিরী, কিন্তু আপনার চেয়ে আমি বেশী জানিনা, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি থানা পুলিশ করাতে চানতো। ডাক্তার পুলিশকে না জানালে দেখবেই না। তাহলে এখনই তিনভাইকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। তাতে সমাজে আপনার প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। সংসারটাকে জলে ভাসিয়ে দেবেন না। বরং পারেন তো কোন প্রাইভেট চেম্বারে দেখিয়ে নিন।

ভদ্রলোক — কি বললে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

বড়বৌ — চলগো। দাঁড়িয়ে রইলে যে।

মা — ও হারু, যা যা অলক ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।

এদিকে ভিখারীর কথায় ওদের টনক নড়েছে।

মেজভাই — মা আমিই যাচ্ছি। দাদাকে হাসপাতালে যেতে হবে না।

বড়বৌ — খুব দরদ দেখছি। ঠাটের মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে।

বড়ভাই — তাহলে, বামুনদের মোটর সাইকেলে আনাচ্ছি।

ওঠাকুর পো তুমি বললে, বামুনরা মোটর সাইকেলে দেবে, তোমরা তিন জনেই চলে যেও। হাতে দুশো টাকা নিয়ে যাও, যদি লাগে তো দিয়ে দিও তুমি পরে দিয়ে দুবো।

বড়ভাই — না, আমার তেমন কিছু হয়নি।

বড়বৌ — না হোক তবু ও একবার দেখিয়ে এসো, কি হতে কি হয়।

বড়দা — না, আমার তেমন কিছু না, অলক ডাক্তারকে ডাকলেই হবে।

ভদ্রলোক — গেলেই পারতে. কোথেকে কি হয়?

বাবা — আমরা অযত্ন কত দেখেছি, কত মাথা ফেটেছে, অত ডাক্তার বদ্যির হিড়িক ছিল না।

বড়বৌ — যুগ পাণ্টে গেছে।

বাবা — মা তাতে, দেখছিই।

এমন সময় অলক ডাক্তার এসে গেল। অলক ডাক্তার দেখলো। বললো, তেমন কিছু না, একটা টেড়ব্যাক ইনজেক্‌শন্‌ দিচ্ছি। আর এই ট্যাবলেটগুলো খাইয়ে দেবেন। ব্যাণ্ডেজও করে দিল।

বাবা — কত লাগবে।

অলক ডাক্তার বাবু — পঞ্চাশ!

একবার চুপ সবাই, সবাই ভাবে, ঐ দুশোটাকার থেকেই পঞ্চাশ দেবে। বড়বৌ ইশারায় ভদ্রলোককে চলে যেতে বলে। ভদ্রলোক চলে যায়। বৌদির ইচ্ছে বুঝে, ছোটভাই একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এনে ডাক্তারকে দেয়।

ভিখারী — এবার ভাইদের কাছে ডেকে বলে — আপানারা চারভাই নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেন। আগে দাদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। এতে আপনারা ছোট হবেন না। এই যে দেখুন আপনারা ডাক্তার ডাকলেন, পয়সা দিলেন, এটাতো আপনার রক্তের টান। আর একটা কথা, বাবা, আপনার নামে জমি আছে বিঘে তিন।

বাবা — হ্যাঁ আমার নামে বিঘে কুড়ি আছে।

ভিখারী — আমার অনুরোধ, আপনি দয়া করে মেজ, সেজ, ছোট ছেলেকে একবিঘে করে লিখে দেন, তাহলেই মীমাংসা হয়ে যাবে। বড়দা একটু ভুল করে ফেলেছে যখন কি আর করা যাবে। একসাথে থাকুন দেখবেন, অনেক আনন্দ আছে সুখ আছে, জীবন আছে আর অন্য দিকে একা না বোকা, এতে ভোগ আছে শান্তি নেই। আপনারা কি আলাদা হয়েছেন। না এখনও হাঁড়ি ভাগ হয়নি।

মা — মাত্র এই তিন দিনে ভাগ হয়েছে হাঁড়ি।

ভিখারী — আমি অনুরোধ করছি, আবার একত্রে থাকুন অন্ততঃ মা বাবা যত দিন আছেন। এখনও মনের ফাটল বাড়ে নি দেখবেন জোড়ালেগে যাবে আরও জোরে। কই বাবা, বললেন নাতো, এদের একবিঘে করে লেখে দিবেন।

বাবা — আমি কালই খাতড়া গিয়ে লিখে নিয়ে আসবো। দেখ তোরা বাবা, বাবাজী যা বলছে তাই কর, এতে সুখ আছে শান্তি আছে। যদি টাকা থাকতো তাহলে তোদের সব জমি ভাগ করে দিতুম। আর বোনটোন নাই যখন তোরাইতো পাবি তবে এই এক বিঘে করে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। যা রেজিষ্ট্রি খরচ। আমি কালই যাবো। তোর মায়ের চুড়িগুলো

বন্ধক দিয়ে রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে আসবো। তোরা বাবা, এই বাবাজীর কথা শোন, দেখলি তো গাঁয়ের পঞ্চায়েত সভ্যের ইচ্ছাটা। তোদিকে লোকে ধ্বংস করতে পারলেই বাঁচে। এখননি যদি হাসপাতালে যেতেন, তাহলে থানা পুলিশ হোত। কত অশান্তি, ঝড় বইতো যেতো তোদের উপর পয়সায় তোদের শ্রাদ্ধ হোত। আমি জোড় হাত করছি। তোরা বাবাজীর কথা শোন।

মা — দেখ, তোরা বাবা! বাবাজীর কথা শোন। তোর বাবা ঠিক বলতো।

ভিখারী — আপনাদের তিনভাইকেই বলছি। দেখুন বড় কত সহজে ক্ষমা করে দিলেন, যখনি বুঝলেন, থানা পুলিশ হবে। কষ্টতো আপনারা পেতেন। গাঁয়ের লোকের মতি গতি দেখলেন, একটা লোক ছাড়া সকলেই মজা দেখছিল। ওঃ আপনি আবার এসেছেন দেখছি। গাঁয়ের মধ্যে একটাই লোকের মতো লোক আছেন। উনিও বোধ হয় দুচার ঠোঙ খেয়েছেন। এতেও আপনাদের চৈতন্য হবে নিশ্চয়, প্রতিবেশীর কেউ ভাল চায় না, অথচ প্রতিবেশী ভাল না হলে বাস করেও সুখ নেই। নিঃসঙ্গ একাই যদি থাকবো তাহলে বনেই বাস করলেই হয়, আর একটা কথা জানাতে চাওয়া ও পাওয়া কিংবা দেনা পাওনার হিসেব মেলে না। ওটাকে যত মেলাতে যাবেন ততই দুঃখ পাবেন। ত্যাগে শান্তি, ত্যাগের মতো ঐশ্বর্য ও নাই। অনুরোধ করছি, দাদা বৌদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।

ছোটভাই বেশী সরব ছিল, ছোট ভাই বেশী শিক্ষিত, ছোট ভাই আগে দাদার পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, দাদা ভাই দুজনেই কেঁদে আকুল। বৌদির কাছে কাছে যায়, বোদি কথা না বলে ক্ষমা করে দেন। তিন ভাই ক্ষমা চেয়ে নেয় চোখের জলে।

মা — তোরা বাবাজীকে একটা প্রণাম কর। উনি আমাদের কাছে দেবতার চেয়ে বড়।

ভিখারী — দাদা, ভাই আপনারা যাই হোন না কেন, প্রণাম করে আর ছোট করে দেবেন না। মানুষ সুখে শান্তিতে থাকুক এটাই চাই। যদি আমার কথা শোনেন আমি খুব খুশী হব শান্তি পাব যদি এক অন্নে আবার ফিরে যান। আমি স্বয়ং থাকছি, দেখে খেয়ে যাবো।

ছোটভাই — মমতা! তুমি যৌথর বড় হাঁড়িটা চাপাও তো, চালডাল ওখান থেকেই নাও। আর বাবাজী আপনি খেয়ে আমাদের খাইয়ে যাবেন।

বড়ভাই কাঁদতে কাঁদতে বলেন — বাবাজী আপনি মাছ খানতো।

ভিখারী — চেয়েছিলুম, ছাড়তে, ছাড়তে দিল কৈ, আপনাদের মতো দাদা, ভাইরা, মা, বোন, ঠাকুমারা।

মেজভাই — আমি যাচ্ছি, মদন মেটের পুকুরে মাছ ধরিয়ে আনছি।

সেজভাই — দাদা বেশী করে আনবি। আজ ভালকরেই খাবো। একটা মাস বড্ড অশান্তিতে কেটেছে।

ছোট বৌ কথামতো কলসীকাঁকে স্নানে থাবায় আগে বড়বৌকে, বড়দি বলে, বলে চল দিদি আমরা স্নানে যাই, দেরী হয়ে যাবে রাঁধতে।

বড়, মেজ, সেজ, ছোটবৌ স্নানে যায় কলসী কাঁকে। ওদের একমাসে দেখে, পাড়াপড়শীর

চোখে বিশ্বের বিস্ময়। জীবনে এমন আশ্চর্য ঘটনা দেখেনি। ছোটবৌ মেজ, বড়দিকে বলে — দিদিরা দেখছো, এমন আশ্চর্য্য জিনিষ জীবনে ওরা কোনদিন দেখছে বলে মনে হয় না।

মেজবৌ — সত্যি ওরা ভীষণ অবাক।

বড় বৌ — শুধু - হুঁ বলে, এখনও বড়বৌ সহজ হতে পারনি। পরে কথায় কথায় সহজ হয়ে যায়।

মেজবৌ — আমরা সুখে শান্তিতে থাকি গাঁয়ের লোক কেউ চায় না।

ছোটবৌ — কথাটা আগে বুঝিনি, এখন বুঝছি।

বড়বৌ — ভিখারীটা সত্যিই খুব বড় মনের। দেখ। আমি তখন ভাবছিলুম। থানা পুলিশ করে তোদের টাইট দুবো। টাইট দিতে গেলে নিজরাও টাইট হতুম। এটা ভালই হোল। কিছু মনে করিস না তোরা। মানুষ তো ভুলই করে। বাবা বললেন কাল গিয়ে রেজিষ্ট্রি করে দেবে।

ছোটবৌ — রেজিষ্ট্রির কথা মুখে আননিতো, ওরা পুরুষরা ভাববে।

আমরা আবার একসাথে রান্না করবো, খাবো, গল্প করবো।

মেজবৌ — আবার ঝগড়াও করবো।

তিনবৌই হেঁসে ফেলে। হাঁসিটা আবার ধনার মা দেখে তার চক্ষু চড়ক গাছ। জীবন ধনার মা কল্পনাও করতে পারে না কিকরে সম্ভব।

ছোটবৌ — বড় জেঠি স্নান করে ফিরলেন।

ধনার মা — হ্যাঁ, মা। দেরীতেই স্নান হোল, দেখি বামুন ঠাকুর আছে কিনা। ওদের হাঁসি, বিভৎস মনে হয়, সেজন্য ছুতোয় তাড়াতাড়ি পালায়। ওদের হাঁসি থামে না।

সেজ বৌ একটু সাদাসিদে সরল - সে আর থাকতে না পেরে বলে — আজকে অনেকেরই রাতে ঘুম হবে না।

বড়বৌ — তুই কথার মতো কথা বলেছিস্ এতক্ষণে।

স্নান সেরে চারবৌ বাড়ী ফেরে। চারবৌ এর উচ্ছল ভাব দেখে বাড়ীর বাকি সকলেই অবাক। এ ওকে হুকুম করছে, এ ওর কথা শুনছে, সম্পর্ক রেখে দিদি, বোন বলে সম্বোধন করছে। এটা এই যৌথ ফ্যামিলিতে কোন দিন দেখেনি। চারবৌ এর এত অনাবিল ব্যবহার। পাড়া পড়শী কিংবা ধনার মার চাহনি ওদিকে আরও উৎসাহিত করেছে।

বড়বৌ — তোমরা কেউ মুড়ি টুড়ি খাবে। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই দু'তিনটে উনুন ধরিয়ে রান্না করে দিচ্ছি। বেলা হয়ে গেল। তোমরা স্নানটান করতে করতেই, রান্না শেষ হয়ে যাবে। ভাতটা নামলেই আর মাছটা এলেই হোল।

ছোটবৌ একবাটি মুড়ি আর গুড় এনে বলে - ভিখারীকে — দাদা এটুকু খেয়ে নিন, একটু দেরী হবে।

ভিখারী — আমি একা খাব না, যদি বাড়ীর সকলে তোমরা খাও।

ছোটবৌ — ধরুন আপনি। সকলকেই দিচ্ছি। সকলেরই খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে, কখন সকালে চামুড়ি খেয়েছি। বড়দি তোমার টিনে মুড়ি আছে। আমার মুড়ি বাড়ন্ত কমলার

মা মুড়ি ভেয়ে দিয়ে যায় নি, কালকেও।

মেজবৌ — দেখ, আমার মুড়ি আছে, অনেক।

বড়বৌ — আমারও আছে যেখানে পারিস নিয়ে আয়।

সেজবৌ — তুই সাজা, আমার কাছে মণ্ডা আছে আনছি।

বড়বৌ — চানাচুরের প্যাকেট দিয়ে বলে — এর সাথে পিঁয়াজ লংকা দে।

মা — ছোটবৌ দেখ। সের খানেক দুধ রয়েছে জল দিয়ে মিশিয়ে সকলকে দাও আর তোমরাও নাও।

সেজভাই একটা নয় দুটো মাছ, কেজিখানেক করে হবে, একটা রুই একটা কাতলা।

মেজভাই — দুটো মাছ আনছি দেখেতো গাঁয়ের লোক যেন আকাশ থেকে পড়ছে। কেউ কিছু বলছে না, আর শুধু গুজ গুজ ফিস্ ফিস্ করছে। আর আমিও এখানে এসে আকাশ থেকে পড়ছি। বৌরা কল কল করে কথা বলছে। আর সকলে তোমরা একসাথে দুধ, গুড়, মুড়ির ভবক ছাড়িয়ে খাচ্ছো, ভুল দেখছি না তো।

সকলেই হোঁ হোঁ করে হাসে। বাবা কেঁদে ফেলে সকলের সাথে খায় বড়দা। কাঁদতে কাঁদতে বলে — সনাতন তুইও খেয়ে নে।

এদিকে ছোট বৌ সেজ ভাসুরের কাছে মাছ চেয়ে নিয়ে মাছ কাটতে বসে যায়।

কালু চাল দেবার সময় বলে, একটু বেশী করে চাল দেবেন, আমি একজনের জন্য ভাত নিয়ে যাব। না নিয়ে গেলে সে অভুক্ত থেকে যাবে।

বড়দা ঠিক আছে, একজনের ওতেই হয়ে যাবে, আপনি যখন বলছেন, তখন আর চারটি বেশী চাল নাও।

তবে সবচেয়ে ভীষণ অবাক বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা। ওরা ভেবে পায় না, দাদু, বাবা কাকারা সব একসাথে এমন করে খাচ্ছে কেন, এতই বা কি কথা বলছে।

বাবা — এরকম দুধ আর গুড়ের সুবাস অনেক দিন পাইনি। হাত ধুলেও দেখবে সুবাস থেকে যাবে।

ভিখারী — কথাটা ঠিক।

আজ বাড়ীতে যেন একটা উৎসব মনে হচ্ছে - মহিলাদের মাছ কাটা, বাটনা বাটা, তরকারী কাটা, রান্নার আর কথা ও ব্যস্ততা।

রান্না শেষ, বড় ঘরের বড় বারান্দার আসন হয়েছে শুধু পুরুষও ছেলেদের, আন্দাজ করে ভিখারী বলে — আজ মহিলারাও একসাথে খাবেন, বড়বৌদি না হয় একজন দিয়ে শেষে বসবেন, দেখবেন একসাথে খাওয়ার মজাই আলাদা।

ছোট ভাই একসাথেই জায়গা কর, বরং আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা থালায় বেড়ে দিয়ে আরম্ভটা করে দাও।

সেজভাই — হারুই দেনা। তোমরা সব বেড়ে দিয়ে বস।

জলসহ সব খাবার, তরকারী সবকিছু দিয়ে মহিলারাও বসে পড়ে। ছোট ভাই দ্বিতীয় বার ভাত, তরকারী দেখিয়ে খেতে বসে। খেতে বসেছে প্রায় ১টায় শেষ হয় প্রায় তিনটেতে। কত কথাই হোল। মেয়েরাই আজ বেশী কথা বলছে, বিশেষ করে চারবৌতে, আজ সকলেই

মনে গ্লানি ধুয়ে মুছে নির্মল হচ্ছে। দর্শকও শ্রোতা ভিখারী মাঝে মাঝে বক্তাও। আজ একসাথে মহামিলনের রান্নার পদগুলিও সুন্দর। মাছ বেশ ভাল ভাবেই পড়েছে। ভিখারী পাতে সব ডবল্ ডবল্। ভিখারীর অনুরোধ শোনেনি। হারুর খাওয়াও শেষ, তবুও কেউ উঠতে চায় না। সকলকেই গল্পে পেয়েছে। একসময় হারু বলে, বড়বৌদি তুমি একটু চিন্তায় আছ না।

বড়বৌদি — কেন?

হারু — পাছে, দুশো টাকা চোট্ হয়ে যায়, পঞ্চায়েতে সভ্যদের হাতে টাকা পড়লে ফেরতের সম্ভবনা কম্। ও টাকাটা বাবার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

বাবা — দুশো নয়, তোমাকে চারশ দেব। নাই ফেরৎ দিক।

সকলেই হো হো করে হেসে ফেলে।

ভিখারী উঠে পড়ে। ওরাও উঠে। বড়বৌ তোরা সব এগুলো বাগা, আমি, খাবার বেড়ে দিই। দেরী হয়ে গেল, ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।

থলিতে খাবার এনে দেয়। যাবার বেলায়, ছোট প্রণাম করে বলে — দাদা কিছু মনে করবেন না, আপনাকে এখন বুঝলুম, পরে আপনার সাথে কথা হবে। আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ আপনি আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন। ঈশ্বরের কাছে পার্থনা করুণ আজ আপনি যে পথ দেখালেন সেই পথেই যেন চলতে পারি।

বাধা দিলেও ছাড়ে না, প্রণাম করে সকলে, প্রণাম করতে দিলে হয় তো অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা মাও প্রণাম করতো। ওরা চোখের জলে এক আত্মীয় পরমাত্মীয় কে বিদায় দিল।

আনন্দে ভাসতে ভাসতে সে পৌঁছে যায় আশ্রমে। শবরীর প্রতীক্ষায় বসে থাকা রবি, দেখে হাঁফ ছাড়ে। হাতে থলি দেখে তার বুঝতে বাকি থাকে না, আজও খাবার আছে, সেদিনের মতো সে খেতে খেতে কালু দা, কত মাছ গো। রান্নাও কি সুন্দর মুখ ছেড়ে যায়। আজওকি ভগড়ায় সেই বাড়ীতে গিয়েছিলে কিনা জানতে চায়। মুচকি মুচকি হাসে। সত্যি তুমি দেবতা, দেবতাকে ছাড়া মানুষ অন্য কাউকে এত খাতির যত্ন করে।

অনেকদিন পর মনিপুর যায়। ঘুরতে ঘুরতে, রাধামাধব বলতে বলতে হাজির হয় সেই বাড়ীতে, যেখানে দু জা থাকে, সেই বাড়ীতে একটা উৎসব মনে হয়। কেন জানে সেও বাড়ীতে যাবে কিনা ভাবছে। সেই সময়, কে যেন ডাকে, এদিকে এসোগো। পিছন ফিরে দেখে, সেই মহিলা, যে মহিলাকে দুই দিন মুড়ি ভাজতে দেখেছে। বাড়ীরদিকে এলো বলেই বাড়ীর ভিতর ঢুকে যায়। পিছনে অনুসরণ করে বাড়ীতে ঢোকে রাধামাধব বলে। পিঁড়ের থেকে বলে — এইযে এদিকে, এখানে এসো।

কালু — আবার যাবো! না চলে যাই।

বড়গিন্নী — আজ আর যাওয়া হচ্ছে না। খেয়ে দেয়ে পর। আজ দেওয়ের ছেলের ভুজনো। আজকি ছেড়ে দেওয়া যায়।

কালু — তা ভাল, ঝামেলা যে আর একজন কে নিয়ে, আমার না গেলে তার যে, খাওয়া হয় না।

গিন্নী — তার জন্য না হয়, নিয়ে যাবে।

কালুকে অগত্যা থাকতে হয়। বাড়ীতে অনেক কুটুম এসেছে। ছোট গিন্নী একটু পরে

এলো পায়স ও মিষ্টি নিয়ে। হাত ধরিয়ে বলে, আমার ছেলের কপাল ভালো, তাই হাজির হয়েছেন। সেবা করেই যাবেন। বড়দি সবব্যবস্থা করে দেবে।

কালু — বাবা জীবনকে নিয়ে এসো দেখি।

ছোট গিন্নী ডাকতেই একটি মেয়ে মানুষ নিয়ে আসে, ছেলেকে কোলে নেয়, হাতে একটা টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে বলে — শতায়ু হও বাবা। চোখে জল আসে। মনে পড়ে ছেলেটা থাকলে তারওতো অন্নপ্রাশন করাতে হোত, এর চেয়ে একটু বড় হোত হয়তো। আনমনা হয়, তবুও যেন পরশ পায়। ইন্দ্রসোকের রামানন্দ চক্রবর্ত্তীর ছেলের বয়সীই হতো। প্রায় মাস খানেক আগে ওদের বাড়ীতে অন্নপ্রাশনের বাড়ীতে গিয়েছিল। ছেলেটিকে দেখে মন ভরে যায়, এখন চন্দনের ফোঁটা, নতুন, সোনার হার, রূপোর তক্তী, বিছের নূপুর ধ্বনিতে মনে হয় ছোট্ট নাড়ু গোপাল। ছেলেকে নিয়ে আদর করে। ওদিকে রান্না হচ্ছে বড় কড়াইতে, মনে হয় অনেকলোক জন খাবে। পায়েস মিষ্টি খায়। বসে বসে বাড়ীর কেউ কম লক্ষ্য করে, নানান লোকের সাথে নানান কথা হয়। দুইবৌ ভীষণ ব্যস্ত। দুইভাইয়ের সাথে এই প্রথম আলোচনা। কথাতে বোঝা যায়, ওরা লোক ভাল। আজ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে ছোট গিন্নীর মুখখানা অবিকল জবার মতো। জবার মুখটা আনতে চেষ্টা করে মনে করবার ছোট গিন্নীর চোখে চোখে পড়ে। ছোট গিন্নী কি ভাবছে কে জানে। খারাপ লোক তো আছে নিঃসন্দেহে। সংযত হওয়া সত্বেও চোখ পড়ে যায়। ঘর ভর্তি লোক কেউ কিছু লক্ষ্য করেনি, তাই রক্ষা। রান্না প্রায় শেষের পথে। খাওয়ার জায়গা হবে একটু পর। ঘরের ভিতরে জায়গা করে, একেবারে বড় গিন্নী কালুকে ডেকে নিয়ে যায়। কালু কিন্তু কিন্তু করে বলে — আমি আগে খাবো।

বড় গিন্নী — তুমি খেয়ে নাও। তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে, আর একজন বসে থাকবে। খাবার বেঁধে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

ঘরটায় জানালা নেই। গরম, কারেন্ট নেই। খেতে বসে ঘামছে। হাত পাখা নিয়ে বড় গিন্নী বাতাস করতে থাকে। যদিও কালু বাধা দেয়। মাঝে মাঝে মাছ ও মিষ্টি নিয়ে আসছে, কালুকে বেশ যত্ন করে খাওয়াচ্ছে। মাঝখানে, ছোট গিন্নী মুচকি হেসে আবার কাজে যায়।

বড় গিন্নী — হাঁসি দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। একটু লজ্জা করে বলেই কালু খেয়ে যায় কোন কথা বলে না। বড় গিন্নী হাত থেকে পাখা ছাড়িয়ে নেয়। হাতের স্পর্শ শিহরণ জাগায়।

খাওয়া শেষ হতে বড় গিন্নী বলে — মাঝে মাঝে এসো, তোমাকে দেখলে আমার ভীষণ ভাল লাগে। হাতধোয়া পাননেয় বসে। রবির খাবার এসে যায়। কালু খাবার নিয়ে আসে। ছোট গিন্নীর মুখে সেই হাঁসিটি লেগে আছে। ফেরার বেলায় সদরের কাছে এসে বড় গিন্নী বলে, আবার এসো। ছেলেটিকে দেখতে চায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

আশ্রমে ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকেল। আজ রবির হাতে খাবার দেখে হাসতে হাসতে বলে — আজকি ব্যাপার।

কালু — খেয়ে নাও, মনিপুরের লোক দিয়েছে।

রবির কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরে যায়। মুখে চোখে কৃতজ্ঞতায় প্রকাশ।

রবি — এ যে ভোজ ঘরের রান্না।
কালু — ভুজনো বাড়ি। ভালই রেঁধেছে মনে হচ্ছে, মাছ মিষ্টি ঠিক দিয়েছে তো।
রবি — তোমার গেষ্ট আমি। দেখতে হয়।
কালু — কে বললো, তুমি আমার গেষ্ট, তুমি আমার দাদা কে গেষ্ট বললে।
রবি — গলা বুজে আসে আনন্দে, কোন উত্তর যোগায় না।

অনন্ত অবকাশ। বৃষ্টি বাদল, আজ ষষ্ঠ দিনে পড়লো। একবারের জন্য এই স্থান ছাড়া কোথাও বের হয়নি। প্রবল হাওয়া বইছে। সূর্য্যের মুখ দেখা যায়নি এক মূহুর্তের মধ্যে। রবি আর কালু নিজে আর আছে সমান্য দূরে ঘাটে, নৌকার মাঝি। পিঁড়ের দাওয়ার থেকেই দেখা. যায় নদীটা। অঝোরে কখনও, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি রান্না হচ্ছে ভাতে ভাত। চালে ডালে খিঁচুরি খাবার ইচ্ছে ছিল, কোথায় ডাল, ডালতো করেই না, ভাতে ভাত। আর মাছ। রবি একটা জাল করেছে সেই সকালে মাছটা ধরে নিয়ে আসে চুনো মাছ, মাঝে মধ্যে দু একটা মাঝারি সাইজের যে পাওয়া যায় না তা নয়। জালটাসে ঘোড়াধরা হাট থেকে এনেছে। এছাড়া যাবেন যাবেন, রাতে আলো আর একটা কাস্তে নিয়ে বের হয় আধ ঘন্টার মধ্যে কম করে তিন পোয়াটাকে মাছ নিয়ে হাজির হয়। আটি আলোয় মাছ ধরা বেশ মজার। অন্ধকার রাতে, জ্যোৎস্না হলে চলবে না। জলের কিনারে আলোতে দেখা যায় মাছ স্থির ভাবে ভাসতে তখনই একটা কাস্তের উত্তর উল্টোপিঠের চোট সঙ্গে মাঝ দুখানি। পরে সংগ্রহ করা হয়। আবার কখনও কখনও একটা অংশ পাওয়াই যায় না। একদিন গিয়ে ছিল, রবির সাথে তারপর আর যায় নি। বড্ড নৃশংস লাগে। আলোতে মাছ গুলোকে জলে বস্তু সুন্দর লাগে। মায়া হয়। এই মাছে কোন দিন হাত লাগায় না। রবিই কেটে বেছে একেবারে নদী থেকে নিয়ে আসে। ভিক্ষার চালও শেষ হয়ে গেছে। দুই দিন মায়ের পূজোর চাল নিচ্ছে। আবার ফেরৎ দেবে। না দিলে অভ্যাস খারাপ হবে। যদিও প্রতিদিন কিছু না কিছু চাল বাড়ে তাতে চলে যায় - দিব্যি দুজনের। কালু এখানে আসার পর প্রতিদিন গাঁ থেকে পূজোয় আসে কেউ বা কেউ। নটার আগেই। পূজো সারা হলে পরে ভিক্ষায়। একয়দিন ভিক্ষার বালাই নেই। শুধু শুয়ে বসে ভাবা আর ঘুমুনো। প্রবল হাওয়া বয়, সাথে কখন প্রবল বৃষ্টি, কখনও ঝির ঝিরে, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি। মেঘটাও নীচে নেমেছে। বোধ হয় নিম্নচাপ। এখানে নদী আদানে অর্থাৎ অর্দ্ধেক। স্রোতের তীব্রতায় আবর্জনা, ফেনা বয়ে যাচ্ছে। বেশ দেখতে লাগে। যখন নৌকা এপার ওপার করে তখন আরও ভাল লাগে, কাশফুলে নদীরধার ছেয়ে আছে, হাওয়ায় যেন মাটির উপরে শুভ্র মেঘের ভেসে যাওয়া। নির্জন নদীতীর এ বাদলে। ঘরে মন বসে না। মন যেন ভিক্ষায় বের হয়। ভিখারীর মনতো ভিখারীই হবে। ভিখ নিতে নিতে যেন ভরে ওঠে যেমনি ভিক্ষের ঝুলি তেমনি ভিখ নিয়ে ফেরে মন, দরজায় দরজায় স্নেহ, ভালবাসা, ভাল লাগা, মায়া মমতায় ভরে ওঠে মন কানায় কানায়। ভিক্ষুক জীবনে আগের জীবনে যা কিছু হারিয়ে যায় সবই ফিরে পায় অনেক মা, বাবা, ভাই, বোন, সন্তান, দাদু, ঠাকুমা এমনকি মনের মানুষ সন্তান। এরূপ বৈচিত্রময় জীবন যেন জীবনে নেই। ভ্রমন পিপাসু মানুষ পৃথিবীর রূপ বৈচিত্রে পাগল। ভিক্ষুক পাগল মনের ধৈর্যকে তাই হয় তো আউল বাউলেরা, গানের ছন্দে প্রকাশ করে জীবনের সারবস্তুকে। বাউলমন বার বার ভিক্ষায় বের হয়। কিন্তু এতো বাদল আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়,

বিছানা থেকে ঘোর অন্ধকারে শোঁ শোঁ আওয়াজে মনটন বার নাড়িয়ে দিয়ে যায়। মন পথে বের হয়। জন্মাষ্টমীর কথা মনে পড়ে। পূজো সারা হতে রবিকে বলে — ফিরতে দেরী হতে পারে, সন্ধ্যের কাছাকাছি, যদি বল তাহলে রেঁধে রেখে যাবো। আজতো জন্মাষ্টমী, আজকে বরং ভাত খেতে হবে না। মুড়ি খেয়ে নিলে ভাল হয়। আমি তোমার জন্যে খাবার আনবো। রবি এককথায় রাজী হয়। অনেককিছু ভাল খাবারের প্রত্যাশায়। আর রবিও চায় না। যে কষ্ট করে তার জেন্য আবার রান্না করে। বের হয় — পৌছে যায়। বাতাসীদের ঘর, তিন সখী হাজির ছিল। স্নান সেরে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। বসতে জায়গা দেয়। কালু হাজির হতে অনেকেই হাজির, পটু, রামচাঁদ, মঙ্গল, ডাবু আরও অনেক মেয়েরা। বাতাসীর বর ডাবু, আর রূপচাঁদের মেয়ে বাতাসী। ঠাণ্ডামনি রামচাঁদের মেয়ে বিয়ে হয়েছিল, ঠাণ্ডামনি ঘর করে নাই। বাসী হলো পটুর বোন, শেও ঠাণ্ডামনির মতো ঘর করে নাই। তিনটিতে জুটি, সমবয়সী প্রায় কুড়ি পঁচিশ বয়স হবে। যেমন গড়ন তেমনি তেজী তেজী সতেজ ভাব আর তেমনি উচ্ছল, ভরা নদীর ঠেউয়ের মতো ঢেউ ওঠে ছল ছলাৎ। দুরন্ত বাতাসের ঢেউতে কাবু হয়েছে কালু। বাতাসীর টানা টানা চোখ চুম্বকের মতো টানে, বাসীর ওষ্ঠ বলে ভালবাসতে আর ঠাণ্ডামনির দেহ আহবান করে মরতে অতল জলে। মিষ্টি দিয়ে জল দিয়েছে। জল টল খেয়ে প্রথমে রান্না চড়ায়। প্রথমে কুমড়ো চড়ে তার পর বুটের ডাল. শেষে লুচি ভাজা হবে। কম করে কেজি পাঁচ রুল ময়দা এনেছে। এতো ময়দায় কি হবে জানাতে বলে, গোটা গাঁয়ে ঘর ঘর বিলোবে আর তুই খাবি, আর রবির জন্যে নিয়ে যাবি।

কালু — তোমরা লুচির ময়দায় জল দাও, সব ঠিক করে লুচি বেলে দাও, আমি না হয় ভেজে দেব। ওরা প্রথমে রাজী হয় না। পরে ওরা কথা মতো লুচি করে দেয়। খাটিয়ায় বসে তিনটি রমণীয় নানা ভঙ্গিমায় কাজ করা দেখে। সত্যি তিনটি মহিলা যেন আলতা পেড়ে সাদা কাপড়ে ফুটন্ত পদ্মের মতো মনে হয়। দেখে আশা মেটে না। অবশেষে ভাজতে থাকে লুচি। লুচির গন্ধে পাড়াটা ভরে গেছে। লুচি ভাজা শেষ। কালু বলে কোন ঠাকুরের ছবি নাই। ঠাণ্ডামনি বলে, এই বাসী তুদের ঘরে একটা কোন ঠাকুরের ক্যালেন্ডার আছে, সিটাই নিয়ে আয়। ক্যালেন্ডার নিয়ে আসে। একটা বস্ত্রালয়ের, তাতে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। সেটা খুব নীচে পেরেক পুঁতে টাঙিয়ে দেয়। ফুলটুল এনেছে। আসন পেতেছে, সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে সব লুচি, রুল ময়দার লুচি — চাঁদ ঝলসানো রুটির মতো নয় - এগুলো ঠিক ছোট ছোট চাঁদের মতো, যাতে আছে ছোট শিশুর হাঁসির ঝলক। অনেকেই এসেছে পূজো দেখতে। এই প্রথম এক ব্রাহ্মন সাঁওতাল বাড়ীতে পূজো করছে। ওদের সকলের ভাল লাগছে। কেউ কোন আপত্তিও জানায়নি। সত্যপীর যেমন হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই দেবতা। কৃষ্ণ যেন সকল মানুষ ও ধর্মের। ভালবাসা মানেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভালবাসার প্রতীক। কালুর মনে হয় যে ভালবাসে সেই তো কৃষ্ণের পূজারী। ভালবাসাই সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভালবাসা তখনই আসে যখন দেনা-পাওনা, লাভ-ক্ষতির হিসেব নিকেশের উর্দ্ধে মন অবস্থান করে। ভালবাসাই সর্ব ধর্মের সার। পূজো শেষ। ওরা ওকে খেতে বলে। কালু জানায় প্রসাদ বিলিয়ে দাও, আর রবির জন্য কিছু বেঁধে দাও। পরে সে খাবে। কথা মত কাজ হয়। একটা ছেলেকে দিয়ে রবির খাবার পাঠানো হয়। ছেলেটিকে আগেভাগে বেশী

প্রসাদ দিয়ে। যাটটা শালপাতার ঠোঙা তৈরী হয় বড় ও ছোট। ছোট পরিবারের ছোট, বড় পরিবারের বড় ঠোঙা। লুচি একটা মণ্ডা, সুজি, ডাল, ঝাল। তিনসখী মিলেই প্রসাদ বিতরণ করে আসে। শেষে কালু খায়। অপূর্ব স্বাদ, খিদেও পেয়েছে। কালু খেয়ে নেয়। কালুকে, খাটিয়া পেতে দেয় একটা ঘরের ভিতরে। শেষ ভাদ্রে রোদের জোর বেশ আছে। ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ওরা তিনসখী খেতে বসেছে। বাতাসীর মা ও জামাই ডাবু ওদের খাওয়া দেখছে আর থালায় ওরা দাওয়াতে বসে প্রসাদ খাচ্ছে। খেতে খেতে ওদের হাজার কথা হয়। মা ও ডাবুও খুব খুশী। খাওয়া শেষ হয়। ওর দুজন বাড়ী যায়। বাতাসী বলে, গা গুলাচ্ছে লুচি খেয়ে। একটু শুলে ভাল জানাত, পিড়েতে ডাবু রোদ এসেছে। ডাবু জানতে চায় একটু শুলেই ঠিক হবেক। চাটাই নিয়ে শুয়ে পড়তে চলে সেই ঘরেতেই। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, গরু ঘুরিয়ে আনতে। মা কোথায় গেল কে জানে। বাড়ীতে, ঘরে ওরা দুজন। বাতাসী মুচকি মুচকি হেসে বলে, দেখলি তো আমার মরদ কত ভাল, কত বিশ্বাস করে।

কালু — দেখলুম। আমার ঘুম পাচ্ছে।

বাতাসী — ঘুমো ঘুমো, খাটেই থাকবি না আমার কাছে আসবি?

কালু — তুমি আমাকে মারবে দেখছি।

নদীর তীরে নীল পাহাড়গুলো যেমন বার বার দেখতে বলে ওদেরকে। আরও ভাবে নীল পাহাড়গুলো ঢেউয়ের মতো ছন্দের তালে সনন্দন হতো, তাহলে কেমন হতো ভাবতে চেষ্টা করে। ভাবতে ভাবতে স্পন্দিত টিলা অপূর্ব লাগে মানসপটে। কিন্তু টিলা যখন ছন্দের তালে তালে স্পন্দিত হয় তখন ভয়েরও ব্যাপার। শিব ও রুদ্রের যেন পাশাপাশি অবস্থান। খাট থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা গাছের ছায়ায় বসে। আর বাতাসীর খিলখিল হাসি কানে বাজে। গাঁয়ের সংলগ্ন, ছায়াঘেরা শাল গাছের ছায়ায় বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। ভাল লাগে বিশাল মোটা আর তেমনি বিশাল উঁচু উঁচু শাল কুঞ্জে, মারাংবুরুর থান। বেলাটা পড়ছে। তিন বান্ধবী হাজির হয়। হেঁসে গড়িয়ে পড়ে যায় আর কি! ওরা বলে — কালু কথায় ভাজা চিংড়ীর মতো লাল হয়ে যাচ্ছে। চল্ চল্ আবার বসে আছিস কেনে। আমরা বলে এসেছি বাড়ীতে। আমরা কালু ঠাকুর নিয়ে একবার ভালকা বাঁধে যাবো। কালু গাছপালা নদীপাহাড় খুব ভালবাসে। আমরা কালুকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। একজন বলে তুই বাঁশী এনেছিস্। কালুর কাছে নেই দেখে বাসী পটুর বাঁশীটা আনতে ছোটে। ওরা পথ হাঁটে। অনেকদিন বৃষ্টির পর বেশ রোদটা চড়া হয়েছে ভাদরের রোদ। পথ শুকনো। সরু পথ লতা পাতা, গুল্ম, ফলফুল। গাছের ছায়ায় মাবেন রোদ পড়া জায়গায় সোনালী পথে হাঁটতে থাকে, ফলফুল বাতাসের সুবাসে। সাথে আছে তিন বনদেবীদের মুক্তো ঝরা হাসির সুর। কি ভালই না লাগছে কালুর। পৃথিবীতে এত সুন্দরও জায়গা আছে। কঙ্করময় পথ, চড়াই কখনও উতরাই একটা টিলা পার হতেই চোখে পড়ে, কাক চক্ষু কাজল কালো জলে ভরা একটা গোলাকার জলাধার। জলের চারপাশ শাল, মহুয়া, পিয়াল, কুরচি, কটুস আর নানা ফুলের সমারোহ। টিলার উপরটা শক্ত গ্রানাইট পাথরের আর চারপাশ কাঁকুরে মাটি, সেই মাটি মনে হয় অতিরিক্ত জোরালো, গাছগুলো সবুজ হয়ে আছে। ফলফুল, লতাপাতার শোভা মুখে বলার নয়। গাছগুলো যেন পরিষ্কার জলে ওদের ফলেফুলে ওরা সুন্দর সৃষ্টিকে দেখতে

চায় আয়নায়, ষোড়শী যুবতীর মতো। মাঝে মাঝে ঘুঘুর ডাকে জায়গাটা আরও নির্জন মনে হয়। আরও কতপাখীর ডাক্ মাঝে মাঝে সেই নির্জনাতে ভেঙে টুকরো করে দেয়। কাজল কালো জলের তীরের দুপাশের দুই টিলার ছবি পড়েছে জলে, শালুক আর সাপলার ছড়াছড়ি। এক অপূর্ব রোমাঞ্চ বয়ে আনে হৃদয়ে। চোখ ফেরাতে মন চাইছে না। টিলা থেকেই পরিবেশটা আরও সুন্দর মনে হয়। নামতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় দুই পাহাড়ের বা টিলা মধ্যবর্ত্তী খাদেতেই জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। আর দুইপাশে টিলার ধ্বসে বাঁধের পাড় সৃষ্টি হয়েছে কখন কোন অতীতে। পূব আর পশ্চিম দিক তাই বাঁধের মতো, আর দুই বাঁধের বড় বড় গাছের সমাহার রয়েছে। উত্তর টিলায় রয়েছে শাল ছায়ায় সাঁওতালদের দেবতা। এই দেবতা থাকার সুবাদে কেউ এখানের জঙ্গলের পাশাপাশি গাছ টাছ কাটে না। ওরা জানায় একবার একজন গাছ কাটায় রক্ত ওঠে লোকটা মারা যায়। তাই এতো গভীর এতো নিরিবিলি। কালু বোঝে এখানে ভালুকের দেখা পাওয়া যেত তাই এটা ভালুকবাঁধ। কালু শুধু অবাক হয়ে দেখে, কাজল কালো জলে, গাছের টিলার কাশ ফুলের ছবি, পশ্চিম তীরে সূর্য্যের বিদায় বেলায় কিছু আলোর রক্তিম আভায় জলের আয়না ভরিয়ে দেয় এক অপূর্ব অবর্ননীয় মাধুর্য্যে। সাপলা আর লাল, শালুকের সাদা পাপড়িতে, রূপসী ষোড়শীর লাজ রাঙা মুখখানি, সে মুখে রয়েছে, সূর্য্যের বিদায় বেলায় বিষাদের ছবি। লজ্জা আর বিষাদে মেশামেশি অপূর্ব শিহরণ। একজন বলে, তুই কথা বলছিস না কেনে? এত রূপ দেখে মানুষের বোবা হওয়ারই কথা। বাতাসী বলে — তুই বাঁশী বাজা আমরা বসে শুনি।

ঠাণ্ডামনি — কদম গাছ থাকলে ভালো হতো!

বাসী — কদম না আছে তো ঐ গাছ লেদা পিয়াল গাছটার গুঁড়িটাতে বস। ওখানে বসে বাঁশী বাজা, আমরা শুনবো।

পৃথিবী, এমন নির্জন নীরব সুন্দর জায়গা আছে, ভাবনায় আসে না। চক্ষু সার্থক। গাছটাতে বসে বাঁশী বাজায়, মনটাও যেন সার্থক, অকল্পনীয় এই অপরাহ্নে। জলে সোনালী রং ধরেছে। সরাল, পানকৌড়ি, ডাহুক স্যাঁতার কাটে জলে, ঢেউয়ে সোনালী আর রূপালী আভায়, শালুকে আর শাপলার নতুন নতুন রং ধরে। বাঁশীর সুরে শান্ত সমাহিত নির্জন প্রান্তর। এক কথায় অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব . . . মাটির পৃথিবীতে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে।

ঠাণ্ডামনি — দেখ দেখ কৃষ্ট ঠাকুরই মনে হচ্ছে।

বাতাসী — সত্যি, ঠিক কথা একদম।

বাসী — বাঁশীটা মনটা ভরাই দিচ্ছে।

ঠাণ্ডামনি — খুব ভাল লাগছে। মনটা যেন কেমন কেমন করছে।

বাসী — কিরকম করছে?

ঠাণ্ডামনি — কি করে বুঝাবো বল তোকে।

বাতাসী — গাটা কিচ্ কিচ্ করছে, কোন সকালে চান্ করেছি।

বাসী — বটে বটে, চান করলে ভাল হোত।

ঠাণ্ডামনি — ভিজে কাপড়ে এতটা রাস্তা যাবি?

বাতাসীর কানে কানে কি বললো, বলেই হেঁসে উঠে। বাঁশীর সুর - আদিম বন্য দুহিতাদের হাসির ঝঙ্কার অরন্য প্রান্তর আরও যেন মৌনমুখর আরও সুন্দর। অরন্য যেন ষোড়শী রমনীর মতো সেজেছে মনের মতো করে। ওরা কৃষ্ণর দিকে তাকায় মুচকি হাসে। আর অবলীলায় তিনটি মহিলা নিজেদের ফুলের মতো ধীরে ধীরে পাপড়ি উন্মোচিত করে। বস্ত্রহীন তিনটে বন্য দুহিতা জলে নেমে নীল মৎস কন্যায় পরিণত হয়। জলে ঢেউ ওঠে। কালুর বাঁশীতে সুরের লহরী বয়ে যায় না। স্তব্ধ। চক্ষুতে বিশ্বাস করতেই পারছে না, এওকি সম্ভব। এই আদিম অরন্যে নিখাদ আদিম অরন্য শোভার বোধ হয় এইটুকুই অভাব বাকী ছিল। আদিম বন্য শোভায় হৃদয় কানায় কানায় ভরা, মন যা চায় তাই পেয়ে যায়। মনে হয় আদিমতার মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত সোন্দর্য্য ও প্রানের স্পর্শ আবার মনে হয় কৃত্রিমতার অসুন্দর ও মৃত্যুর সংকেত। পাখীরা বাসায় ফিরছে। কিন্তু ওদের কারো বাসায় ফিরতে মন চায় না। মানুষের বাসা মনে হয় কারাগার! স্বতস্ফূর্ত জীবন প্রবাহ কি আছে সেখানে? স্বতঃস্ফূর্ততাই জীবনের লক্ষণ। তিনটি আদিম মানবীর হৃদয়ে আদিম বন্য স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে। আদিম অরন্যে ভাবতে ভাবতে হৃদয় হয় চমকিত ও চমৎকৃত। সন্ধ্যা নামতে আর বেশী বেশী নেই। সোনালী আকাশের আভায় সোনা রং ধরেছে। অনেক আগেই যদিও সোনা রং ধরেছে মনে। মনে ও দেহে ওরা সোনার বরণী মেয়ে। ওরা জল থেকে উঠে। সোনা রং ধরা দেওলোর গঠন বৈচিত্র তাকে আবার চমকিত ও চমকৃত করে। নয়ন ভোলানো দৃশ্যে নয়ন মুগ্ধ, মুগ্ধ মানব মন। স্বর্নালী সন্ধ্যায় কাজল কালো জল আদিম অরন্য, টিলা ও আদিম বন্য প্রকৃতি মন থেকে বিদায় নিতে মন চায় না। আসতেই হয়। আসতে আসতে ওদের অনুরোধে, সাদর কুরচি ফুল খোপায় গেঁথে দেয়। ওরাই চুম্বন করে ওদের কৃষ্ণকালো কালাচাঁদকে। পরশে ও হরসে দেহ ও মন পুলকিত। মাতালের মতো ওরা বাড়ী ফেরে।

এই ভরা ভাদরের বাদলে, ভোলা কি যায় মধুর স্মৃতি। জীবনে যদি আর কিছু নাও জুটে ক্ষতি নেই। ভিখ্ দেওয়াতে আনন্দ আছে কি না লোকে কি ভাবে কে জানে! কিন্তু কালুর মনে হয় এতে কম আনন্দ নেই। ভিখারী কালু কৃষ্ণকে সেদিন তিনটি রমনী হৃদয় ভরে যা দিয়েছিল, তাতেই হৃদয় পূর্ণ কিন্তু কালু কৃষ্ণ হৃদয় ভেবে হৃদয় উদাড় করে দিয়েছিল ওদের তাতে মন শান্তিতে ভরপুর। কালু ভিখারী হৃদয় ভরে ভিখ দিতে দিতে সত্যিকারের ভিখারীতে পরিণত হচ্ছে। বাউল মন, মানুষের দেহ মন্দিরের মাঝেই বেদ বেদান্ত, কোরান, বাইবেল খুঁজে পায়। ভরা থাক আকল্পনীয় সৌন্দর্য্য স্মৃতি সুধা। সুধা পানে কখন ঘুমের অতলে। সময়ে সময়ে স্মৃতিসুধা পান করে পিয়াসি মৌমাছি মন। পিপাসা নিবারিত হয়। হৃদয় কানায় কানায় ভয়ে যায়। এত শান্তি এত সুখ কোথায় আছে?

গাঁয়ের এখানে সেখানে দু'দশ জন লোকের জটলা চলছে। কিছু কথা কানে আসে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় চঞ্চল নামক ছোট ছেলেদের বাড়ীতে। বাড়ীর গিন্নীর সাথে কথা হয়। মনের দুঃখ প্রকাশ করার জন্য কালুর সাথে কথা বলে। এই গিন্নীর নয়. প্রতিটি গিন্নীর একই দশা। সকলের মনে একই কথা। পুজো, মেয়ে জামাই, নাতি নাতনিরা, অন্য সকল বছরের মতো আসবে না। পুজো যদি নাই হয় তাহলে আনতে গিয়েই কি হবে, আর তারা আসবেই না। কুটুম বাটুমে গিজ্ গিজ্ করতো। এমন কোন ঘর থাকতো না যে একটাও

কুটুম না এসেছে। গাঁয়ের প্রত্যেক গিন্নী, বৌ, ঝি, ছেলে, পুলেদের মনস্তাপের শেষ নেই। কথায় কথায় জেনে নেয়, কাদিকে বললে কাজ হবে। গিন্নী মা গোটা গাঁয়ের আগুরী একসাথে থাকলে কি এমন হোত, পার্টি পলিটিকস্ যতই থাক্। গত বছর ভাসানে আগুরীদের সাথে গোওলাদের মারামারি হয়। এই নিয়ে দুই রাজনীতি পার্টি পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে আগুগী সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত। তাই পূজো আসছে না। মহালয়ার দিন, রাতের মিটিংয়ে শেষ আশাটুকু শেষ হয়ে গিয়েছে। সবশেষে শেষ কথাটা বোঝা গেল, রামপদ ও হারুবাবুর হাতে এ ব্যাপারটা আছে। মনেহয় তার পূজো না হলে গাঁটা সত্যিই নিরাপদ নয় যাবে, আর ঝগড়াটাও আরও দিন দিন বেড়ে যাবে। ভিখ করতে করতে, হারু বাবুর বাড়ী আসে ভিক্ষায়, সেখানেও সেই এক আলোচনা। বাড়ীর গিন্নী ভিখ দিতে এসে, কি মনে করে বলে -- এ বছর তাহলে ঠাকুর আসছে না।

গিন্নীমা — তাইতো মনে হচ্ছে। পূজোর কটা দিন যে কিভাবে কাটাবো ভাবতেই কান্না পাচ্ছে। এ বাড়ীতেই পূজোর সব ব্যবস্থা হোত। ঠাকুর গড়া থেকে সব কিছু।

কালু — সত্যি ভীষণ খারাপ লাগবে বৈকি। কালু জানায় প্রত্যেক বাড়ীর গিন্নী, বৌ, ছেলেদের, লোক জনের দুঃখের শেষ নেই দেখলুম। পূজো নিয়ে পলিটিকস্ করে কি লাভ হোল বুঝতে পারে না তারা। বাবু বাড়ীতে আছেন।

গিন্নীমা — ঐ তো বৈঠক খানার রয়েছে।

কালু — দেখি উনি কি করছেন।

একটু সংকোচ নিয়ে বলে, আসছি দাদা।

হাবু — এসো, তোমাকে দেখেছি, মাঝে মাঝে, তবে কি ব্যাপার।

কালু — আমি তো ভিখারী। ভিখ্ নিতে নিতে যেটুকু বুঝলুম, তাকে সেটা অনুমতি হলে বলতে পারি।

হাবু — কি ব্যাপারে।

কালু — পূজোর ব্যাপারে।

হাবু — ঐ ব্যাপারে আর কিছু নয়, চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়েছে।

কালু — যথার্থ ইচ্ছ বা চেষ্টা করলে কি না হয়।

হাবু — তুমি যে বেশ বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছ।

কালু — জানি, আপনাদের মানসিক অবস্থা ভাল নয়। তবুও একটু চিন্তা করে দেখুন, জেদাজেদি বাদ দিয়ে কি ভাবে পূজোটা হয় আলোচনায় বসুন। আপনারা একটু ছোট হন, তাহলেই মীমাংসা হয়ে যাবে।

জগা — তুমি ভাই বড্ড জ্ঞান দিচ্ছ, এমনিতেই মাথার ঠিক নেই। আবার তুমি নাক গলিয়ে মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছ।

হরা — তুমি যাও দেখি বাবু। আমাদের থানা পুলিশ, কোর্ট কাছারী চলছে, এসব এককথায় মীমাংসা কি হয় সহজে।

কালু — আমি, দেখুন ভিখারী, এতসব কি করে জানবো। তবে গাঁয়ের লোকেদের কথা ভেবে একপক্ষ একটু নরম হলে সব মিটে যাবে।

হরা — তুমি পারবে, পুজো আনতে।

কালু — দেখুন আমি ভিখারী আমার সে স্পর্ধা নেই। তবে আর একবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি!

হাবু — ক্ষতি কিছু নেই। ও পক্ষ একটুও নুইতে চাইছে না। এখানের বড় পার্টি, লোক জনও বেশী, লাঠির জোরও কম নয়।

কালু — যদি অভয় দেনতো একটা কথা বলি।

হাবু — বলই না।

কালু — ও পক্ষটির নেতা কে? তাহলে একটু কথা বলতুম।

হরা — রামপদ আবার কে? স্বজাতি হয়েও মুখে ঝাঁমা ঘসাতে পারাতে খুব খুশী।

জগা — কত হাঁতী গেল তল, — ভেড়া বলে কত জল . . .?

কালু হাসতে হাসতে বলে — ওসব কথা থাক্, আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহলে কথা বলতে পারি। কার দ্বারা কখন কি কাজ হয় বলা যায় না। আপনারা তো রাজী।

হরা — যান্ না। আমরা সবেতেই রাজী। পূজো নিয়ে ঘরে বাইরে গায়েতে অশান্তির শেষ নেই। পূজোর কটা দিন কোথাও যেতে হবে। আর কটা দিনই বা আছে, যোগাড় যন্ত্র হবে না।

কালু — কোথাও বাইরে যেতে হবে না। মা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে - সব ঠিক হয়ে যাবে।

জগা — আমরা তো বলছি তুমি যাওনা।

কালু — মামলা মোকদ্দমার কথা কি বলেছিলেন।

হাবু — মামলা তোলা হবে না, মার দিল, মার খেলুম, হসপিটালে থাকলুম। মারের কথা, বাঘান চুয়াড়ির কথা কি করে ভুলবো।

কালু — আর একটা কথা সাহস করে বলছি — ক্ষমার মতো এত বড় ধর্ম নেই। আর যে ক্ষমা করে সেই তো বড়। যার হৃদয় আছে সেই তো ক্ষমা করতে পারে। ত্যাগের মতো সুখ নেই।

জগা রেগে — তুমি যাও। বড় বড় কথা বলা সহজ, করা কঠিন।

কালু — আবার বিরক্ত করছি। অপরপক্ষ যদি একটু নরম হয় তাহলে কথা বলতে যাচ্ছি।

হরা — যেয়ে দেখতে পারো। তবে কিছু হবে না।

কালু — চেষ্টা করতে দোষ কি।

কালু — রামপদ বাবুর বাড়ীতে পৌছায় সেখানেও যেন আরও বেশী লোক আছ। একই কথা চলছে। পূজো, পূজো, পূজো . . . কিন্তু পূজো হচ্ছে না।

কালু — যদি অনুমতি করেন তো আমি।

রাম দাস — এসো। তোমার কি চাই।

কালু — অনেক কিছুই চাই, অনেক আশা নিয়ে আসছি, নিরাশ করবেন না।

রামপদ — তুমি বড্ড বেশী ভনিতা করছো। তুমি বলে ফেলো।

কালু — বড় কাজ, বড় ভনিতাই দরকার। যাক্ নিরাশ করবেন না।

শিবরাম — আবার ভনিতা করছো, ভাই। আমরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

কালু — দেখুন বলছি। সাহস করে বলছি।

রামপদ — তুমি যাও। বিরক্ত করো না। শুধু ভনিতা করছো।

কালু — প্রথমেই বলি, আমার ধৃষ্টতা ও সাহসের জন্য প্রথমেই ক্ষমা চাইছি। আপানাদের বোঝাবার ধৃষ্টতাও নেই।

মদন — আবার . . .।

রামপদ — বল, না হলে যাও দেখি বাবু।

ন্যাড়া — যাও! তুমি।

কালু — বাবু, যাব বলেতো আসিনি। আর কাজ আদায় করেই যাবো বলে এসেছি। বলছি, একটা কথা - এটা আপনাদের গাঁয়ের বৌ, ঝি, গিন্নীমা, ছেলেপুলে বুড়োবুড়ি সকলের কথা।

রামপদ — আবার সেই এককথা।

কালু — পূজোটা আসুক। যেটা একমাত্র আপনিই পারেন। আপনি রাজনীতির লোক শুনলুম, ছোট মুখে বড় শোনাবে কথাটা। ক্ষমার মতো ধর্ম নেই, ত্যাগের মতো আনন্দ নেই, একটু ছোট হোন, এটাই মহত্বের লক্ষণ।

ন্যাড়া — দারুণ বড় বড় কথা বলছো দেখছি।

কালু — বড় নয় ভাই। কে কয়দিন বাঁচবো, সামান্য একটু জেদের জন্য গোটা গাঁটা নিরানন্দ থাকবে। আপনাদের স্বজাতির পূজো, কিন্তু গোটা গাঁয়ের তিন চার হাজার লোকেরাই যেন নিজেদের পূজো। প্রত্যেকেই দুঃখ পারে। যেমন আপনারাও কম যন্ত্রনা পাচ্ছেন না। গোটা গাঁয়ের লোক কেউ ভাল চোখে দেখছে না। পূজোটাকে সবকিছুর উপরে রাখুন। কথাগুলো ব্যাথা পেলে ক্ষমা করে দেবেন। ভেবে দেখুন আপনাদের সকলের জেদেই দায়ী। কি আছে এতে . . ., গোটা গাঁয়ের লোককে নিরানন্দ করে কি লাভ আছে। হাবু বাবুদের মত আছে পূজোয়। পূজো না হলে আপনাদের দু পক্ষকেই লোকে থুথু দেবে।

রামপদ — আমরা কি পূজো চাই না।

কালু — দেখুন সকলেই ভীষণ ভাবে চান অথচ হচ্ছে না পূজো। সেটাই মুস্কিল।

রামপদ — তুমি কি করে মুস্কিলে আসান হবে বলছো।

কালু — আপনিই বয়সে বড়, হাবু বাবুর চেয়ে, সেই কারণ আপনার দায়িত্বই বেশী। আপনিই না হয় একটু ছোট হন। ওনারাও রাজী। মামলা, মোকদ্দমা মিটিয়ে দেন। এতে দুপক্ষেরই মঙ্গল হবে। শুধু যারা অন্যায় করেছে, তারা একটু অন্যায় স্বীকার করে নিতে দোষ কি। আর আপনারা একটু ক্ষমা করতে পারবেন না, যদি তাহলে এত উঁচু পদে উঠেছেন কিজন্য। আপনারা তো পাঁচজন থেকে আলাদা একটা কিছু গুনের জন্য। ক্ষমার তুলনায় কোন ধর্ম নেই, লাভ নেই, শান্তি নেই আনন্দও নেই।

রামপদ — ঐ পক্ষ কি বলছে?

কালু — ওনারাও মনে প্রাণে পূজো চায়। আমি চাই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক

নিজেদের জেদ ত্যাগ করে যারা অন্যায় করেছে, তারা একটু ক্ষমা চাক, আপনারাও ক্ষমা করে দেন। আর এটুকুর দরকারও আছে - দোষ বা অন্যায় করে পরে অন্যায় স্বীকার করলে কেউ ছোট হয় না আর এতে কম আনন্দ পাওয়া যায় না। অনুশোচনাইতো পাপের প্রায়শ্চিত্য।

ন্যাড়া — ভাই, ভাল কথা বলেছো। থানা পুলিশ, কোর্ট কাছারি বন্ধ হোক এতে উভয় পক্ষেরই পকেট খালি হচ্ছে। আর গাঁয়ে অশান্তি দিন দিন বাড়ছে।

শিবরাম — আসামীদের তুমি বলে দিলেই মিটে যায়। যাদের মেরেছিল তাদেরকে শুধু বলা · কিছু মনে করো না, সেদিন ভুল হয়ে গিয়েছিল। আর তুমি কেসের দেখভাল না করলে ওদের কি ক্ষমতা কেস চালায়।

মদন — ঠিক কথা বলেছে, শিবরাম দা।

কালু — আপনাদের তিনজনের মনে কথাটাই একই বাবুর ও মনের কথা। বোধহয় কথাটা শুরু করাই সমস্যা। দয়া করে এনারা যা ভাবছেন দয়া করে সেটাই ভাবুন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রামপদ — ন্যাড়া, আসামী চারজনকে ডেকে নিয়ে আয়তো। পারলে হাবু বাবু যদি আসতে চায় তো ডাকবি।

কালু — আমি বলি। আপনি তো, শিক্ষা দীক্ষায়, পদ মর্যাদায় অনেকটা উঁচুতে আপনিই যদি যান তাহলে আরও সুন্দর আর ভাল হবে। বড়োদেরই কর্তব্য ছোটদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া। আপনি ওখানে গেলে আপনারই মহত্ত প্রকাশ হবে। গাঁয়ের লোকের স্বার্থে আপনি কত বড় কাজ করলেন। শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্বেরই লক্ষণ। আপনি কথাটা ভেবে দেখুন, পরে রাজী হবেন। এটাই সর্বসেরা সুন্দর হবে। গোটা গাঁ এক হয়ে যাবে। শান্তি আসবে গাঁয়ে, প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখাই তো রাজার ধর্ম।

রামপদ বাবু মনে মনে ভাবেন কথাটার সত্যতা।

ন্যাড়া বলে — সত্যি কথা - তুমিই এতে বড়ো হবে।

মদন — ঠিক কথা।

শিবরাম — দারুণ কথা বলেছে। ন্যাড়া ও মদন যায়, কিছুক্ষণ পরে ওরা আসে। রামপদ ওদিকে বোঝায়। সাথে কালু, মদন, শিবরামেরাও।

আসামীরাও জানায়, গাঁয়ের পূজোর না হওয়ার জন্য আমরাই দায়ী সকলেই সেকথাটা বলছে। মদ খেয়ে সত্যি মাতলামির সাথে মারামারি ঠিক হয়নি।

কালু — দেখুন এই অনুশোচনাই আপনাদের বিচার হয়ে গেল। আর ঠিক এই কথাটাই ওদের কাছে বললেই তো সব মিটে গেল অশান্তি। দেখবেন আপনারাও কম আনন্দ পাবেন না।

আসামীরা এই কথাটা বলেই, অনেক যন্ত্রনা লাঘব হয়ে গেল। চল দেখি বাপু, ওদের সামনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবো।

রামপদবাবুরা আসামীসহ হাবু বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হয়, কালুকে নিয়ে। কালুও যদিও বলে — তার যাবার প্রয়োজন নেই, তাঁরাই যথেষ্ট। আরও বলেছিল আজকের দিনটা আপনাদের জীবনে স্মরণীয় থাকবে কারণ এদিনের মতো সুখ আর শান্তি আর কোন দিন পাওয়া যাবে না।

পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই কালু যায় ওদের সাথে। ওদের একসাথে দেখেই গাঁয়ের সকলেই উৎসুক হয়। হাবু বাবু ওদের সকলকে দেখেতো অবাক, কোথায় বসায় আর কোথায় রাখে এই নিয়েই ব্যস্ত। সকলে বলে রামপদবাবু আসার কারণ জানায়। হাবুবাবু হতভম্ব। জীবনে স্বপ্নেও যা কল্পনা করেনি তাই হচ্ছে। বাড়ীতে আগেই চা বানাতে বলে। জগাকে কয়েকজন লোককে ডাকতে বলে, যাদের এদের উপর ক্ষোভ আছে। লোক ভরে গেছে বৈঠক খানার চারপাশে। সকলেই জানতে চায় কিব্যাপার। যারা মার খেয়েছিল আর যারা মার দিয়েছিল সকলেই হাজির। রামপদবাবু জানায় আসার কারণ। হাবুবাবু জানায় আপনারা এসেছেন এতেই তাদের সমস্ত ক্ষোভ, অভিমান, রাগ সব জল। আর যারা মার খেয়েছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে বলে — কি আমার কথাই তোমাদের কথা।

তাদের মধ্যে তাপস যে হসপিটালে দিন কয়েক ছিল, সেই রায় দিল — আমদের আর কোন রাগও নেই, শত্রুতাও নেই। আমাদের জন্য পূজোটা বন্ধ হচ্ছে সেটাই খারাপ লাগছে। হাবুদা তোমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে নাও, কি গো রামপদদা। ওতেই হবে। ভুলতো মানুষেরই হয় আর সংশোধনও মানুষের দারস্থ হয়।

রামপদ বাবু — ঠিকই বলেছ তুমি। তুমি আমাদের একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দাও এবং মায়ের পূজোর ব্যাপারটা এখনই সেরে তবে বাড়ী ফিরব।

হাবু বাবু — নিশ্চয়, তোমাদের মিষ্টি মুখ না করালে চলে।

তাপস — আমিই আনছি, দেখি ময়রার দোকানে কি পাই।

রামপদ বাবু — যা পাবে তাই কিছু নিয়ে এসো, সকলেই ভাগ করে খাবো।

সকলের চোখ ছল্ ছল্ করছে। একজন আগামী ধনা কেঁদেই ছিল।

কালু — এটাই সবচেয়ে ভাল বিচারের রায় - শাস্তিই বলুন আর শান্তিই বলুন। সকলেই কালুর প্রশংসা করে। মিষ্টি আনে কেজি খানেক, লোক প্রায় শত খানেক। ভেঙ্গে প্রসাদের মতো বিতরণ করে। সকলেই খুশী।

পূজো আসছে, কথাটা ছড়িয়ে দিতে কয়েকজন উশখুশ করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে — আগে জানাও পূজো আসছে কি না?

রামপদ — মা আসছেন, এবং আমাদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা মিটিয়ে দিয়ে।

সকলেই দূর্গামায়ের নামে জয় ধ্বনি দেয়।

কালু — আপনারা, রামপদ বাবু আর হাবু বাবুর নামে একটু জয়ধ্বনি দাও।

জনতা আরো জোরে জয় ধ্বনি দেয়। ওরা দুজন খুব খুশী। শুরু হয় ঠাকুর গড়ার মিস্ত্রীর খোঁজ। মহালয়ার আগেই তারা জানিয়ে দিয়েছে তাদের দ্বারা মূর্ত্তিগড়া সম্ভব নয়। আর মাত্র পাঁচদিন। কয়েকজনকে বলা হোল রায়পুর যা, যাকে পাবি তাকেই নিয়ে আসবি, যত টাকা লাগে দেওয়া যাবে। কালু বাড়ী ফিরছে দেখে, সকলেই তাকে আটকে দেয়। সকলেই বলে, না খেয়ে যাওয়া চলবে না।

কালুও জানায় তার একার খেলেই হবে না, আর একজনের জন্য রাঁধতে হয়।

রামপদ বাবু জানায় তার জন্যে খাবার বেঁধে দেওয়া হবে। তুমি যাক এই মিটিংয়ে, তুমি আমাদের পূজোর হোতা।

কালু জানায় সে নিমিত্তমাত্র।

হাবু বাবু — তোমাকে ভাই যত দেখেছি, ততই ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। যদিও মায়ের ইচ্ছা তোমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে।

রামপদ বাবু — আমিও ঠিক একথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। সত্যিই তুমি ভাই যাদু জ্ঞান, গোটা গাঁ এক করে দিলে, আমদের মামলা মোকদ্দমার ফয়সলা করে দিলে। কম্ কথা। খাওয়া দাওয়া সেরে খাবার নিয়ে যাবে। ন্যাড়া বলে — আয়তো বাড়ীতে।

হাবু বাবু — তা হয় না, তুমি ভাই আমাদের এখানে খেয়ে খাবার নিয়ে যাবে।

রামপদ বাবু — তুমি আমাদের বাড়ীতে খাবে আর হাবু বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে যাবে। তোমাদের চেষ্টায় ইন্দ্রশোলের কালীমন্দির ও পূজোর কথা শুনেছি, আজ তোমার গুণের পরিচয় পেলুম।

তাদের মধ্যে অনেকেই বলে একটা মন্দির হয়েছে বটে, দেখাবার মতো একে বারে শ্বেত পাথরের। নানা জনে নানা কথা বলে কালু, মন্দির ও পূজো সম্পর্কে।

পূজোর আলোচনা চলছে। চাঁদা খুব তাড়াতাড়ি আগামী কালের মধ্যেই মিটিয়ে দিতে হবে। মাত্র তো আর পাঁচটা দিন। বাকি অনেককাজ। মিটিংয়ে শেষে মুখে বলে। একটা কথা বলি রাখলে তো বলি।

রামপদ বাবু — বল তুমি, রাখবার হলে নিশ্চয়ই রাখবো।

কালু — আজ শুভদিনে, নিশ্চয়ই মেনে নেবেন, যদিও এটা গাঁয়ের স্বার্থে আপনাদের সকলের স্বার্থে, এতে আপনারা পরস্পরের কাছে আসবেন, শান্তিতে থাকবেন।

হাবু বাবু — তুমি বল, কি বলতে চাইছো?

কালু — বলছি। পূজোয় একটা দিন, অন্তত সকলে একটা বেলা অন্তত খান, শাক ভাতই খান। বাড়ীতেতো খাচ্ছিলেন ভালমন্দ, না হয় মায়ের কাছে শাকভাতই খাবেন। এতে মায়ের কম আনন্দের কথা। সব ছেলেকে একসাথে খেয়ে দেখলে মায়ের কি কম আনন্দ। মায়ের আনন্দে যে গোটা সংশয় গোটা গাঁটা আনন্দে ভরে যাবে।

রামপদ বাবু — দারুণ কথা বললে যে ভাই তুমি। কথা দিচ্ছি তোমার কথা রাখা হবে। বিজয়ার দিন এমনি মনের কষ্টে থাকি। সেদিনই খিচুড়ী হবে, গোটা গাঁয়ের একসাথে। খাওয়া শেষে হবে মায়ের প্রতিমা বিসর্জন। হাবু ভাই তুমি রাজী হয়ে যাও।

হাবু বাবু — তোমার কথাই আমাদের সকলের কথা।

কালু — আপনাদের আনন্দ সকলের মধ্যে ভাগ করে নিন। খিচুড়ির চাল ডাল গাঁয়ের সকলের নিকট নিলে সকলেই এ উৎসবের অংশীদার হবে। সকলে আরও আপন করে পারে পরস্পরের কাছে। বিজয়ার স্বার্থকতা পরিপূর্ণ হবে।

হাবু বাবু — বিজয়ার দিনই হবে। বড্ড খারাপ লাগে বিসর্জনের পরে। ঐ দিনটাই ভাল।

রামপদ বাবু — ভালই হোল গোটা গাঁয়ে সেদিন এক সাথে।

খাওয়া দাওয়া সেরে খাবার নিয়ে বাড়ী ফেরে, প্রায় বিকেল হয়ে গেছে।

এদিকে গাঁয়ে আনন্দের সাইক্লোন চলছে, সব হিসেবকে তছনছ করে দিচ্ছে। কর্তা গিন্নীরা হিসেব করে কাপড়ের করে আনতে পাঠাবে কুটুমদের, মেয়ে জামাইদের। সকলেই

চিনতে চেষ্টা করে কালু ভিখারীকে। কত ভিখারী তো আসে যায়, ভিখ্ নেয় চলে যায়। কালু ভিখারীকে চিনতে পারে না। অনেকেই চিনে। চেনা অচেনা সকলেই প্রশংশা করে। অনেকে বলে ভিখারীকে মা-ই পাঠিয়েছিল। গাঁয়ে কাঁটা দেয় সকলের।

খবর নিতে মনটা ছট্‌ফট্ করে, কারা কেমন আছে। কখনও ছুটে যায় মন, রামানন্দের ছেলেকে দেখতে, কখনও সেই চঞ্চল নামে ছেলেটাকে দেখতে, লক্ষী সেনের কখনও মনিপুরের ছোট বৌএর হালে অন্নপ্রাশন হওয়া ছোট ছেলেটাকে দেখতে কখনও ভগড়া, কখনও সেই চারভাইএর বাড়ীতে, কখনও নাম না জানা গাঁ বা বাড়ীর সদর দরজার সামনে। কে কেমন আছে, ঝগড়াটা মিটে গেছে তো, না আরও গ্রাম্য পলিটিকসে জড়িয়ে পড়েছে, কখনও ছেলে কোলে নিয়ে আসা মায়ের ও ছেলের সুমধুর হাসি, কখনও শুনতে পায় কোন গিন্নীর মায়ের ব্যাজার মুখে বলতে শোনে - 'হাতজোড়া', কখনও গিন্নী মায়েদের স্নেহের সুরে বলা ''জল খাবে বাবা''। কখনও আবার কোন মহিলার চকিত হরিণ চাহনি, কত কি যে ঘটনা প্রবাহ, সেই প্রবাহের নিত্য নতুন রূপ। একবার ব্যথা লেগেছিল এক মাঝবয়সী লোক বলেছিল, এমন চেহারায় ভিখ মা গা শোভা পায় না, খেটে খেলেই ভাল ইত্যাদি আর কত কি . . .। কিছু উত্তর না দিয়েই ফিরে আসে সে বাড়ী থেকে। বুঝতে চেষ্টা করে ওদের যন্ত্রণা। ভাবে বোধ হয়, কাজের লোকজনের অভাবের জন্য ক্ষেতের কাজ করে যাচ্ছে, কিংবা বেতন বেশী, কিংবা মন চারটি চালও দিতে চায় না, হয়তো বা ভিখারী জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে পরশ্রীকাতর হওয়া থেকে . . .! কত কি যে মনে আসে, মন ভেবেই পায় না। যদিও কখনও ভাল লাগে কখনও খারাপ লাগে।

সেদিন সে কেশে হলুদ কানালি গাঁয়েতে যায়। এই গাঁয়ে এসে সেই বাড়ীতে যাওয়া চাইই চাই। ভদ্রমহিলা গেলে একটু মিষ্টি জল দিত। চার পাঁচদিন আগে এসেছিল - জ্বরে পড়ে ছিল। বিছানায় কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে - জ্বর কিনা। প্রবল জ্বর দৃশ নেই। পাশেই একজন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে ঔষধ এনে সরবত খাইয়ে সুস্থ করে, বিকেলের একটু আগে ফিরে আসে। তারপর দিনও এসেছিল সুস্থ প্রায়। সেদিন দুঃখের কথা সব শুনেছিল। চার ছেলে, সকলেই বাড়ীর বাইরে, চাকুরীজীবী ছেলে, বৌ এরা কোয়াটারে। বুড়িমা একা। ভাগের মা, কেউ পয়সা কড়ি পাঠায় না, আসেও না, খবরও নেয় না। ছেলের বাবা জমি জমা বিক্রি করে ছেলেদের লেখা পড়া শিখিয়েছিল, আর মাত্র বিঘে খানেক ছিল। বছর চার হোল বুড়ো ছেলেদের মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইহলোকে। বুড়িমা এখনও বেঁচে আছে একরকম লোকের দয়াতে। দুঃখের কথা জানায়। চার ছেলের চাকুরীও লেখাপড়ার যোগ্যতা, দুই বৌ আবার চাকুরী করে। দুঃখের বিষয় চাকরে ছেলেদের বাড়ীতে ঠাঁই হয় না একটা ঝি রূপেও। একটা টিনের বাড়ী দু উপরে নীচে চার কুঠুরি। আর ঘোরা বেড়া পাঁচীর দেওয়া বাড়ী। সম্বল মাত্র গোটা তিন টিনের থালাবাটি, হাঁড়িকুড়ি। পিতলের যা সব ছিল, বিক্রী বন্ধকেই গেছে, পেট চালাতে, কখন যে সোনার গহনা শেষ পরছিল মনেই পড়ে না। দুঃখের কত কি কাহিনী শুনতে

শুনতে উভয়ের চোখে জল আসে। সেদিন সে প্রস্তাব দিয়ে দিল, কিছু যদি না মনে করেন তাহলে আপনি আমার আশ্রমে চলুন, ছেলে যা খাবে মাও তাই খাবে। মা ছাড়া ভালও লাগে না। মায়ের কথা বারে বারে মনে পড়ে। অশ্রু ভেজা চোখের আবেদন, তার হৃদয়ে পৌঁছায়। আপনি ভেবে দেখুন। দিন চার পর আসব। দিন চার পর কোথাও ভিখ্ না করে, সেই বাড়ীতে যায়। গিয়ে জিজ্ঞেস — কি স্থির করলেন। আরও বলে যাই স্থির করুন - আমার সাথে যেতে হচ্ছে। নীরব থাকে বুড়িমা। কিছুক্ষণ পর কালু বলে — নিন রেডি হয়ে। কিছু নিতে হবে না। চাবি দিয়ে চলুন। জীর্ণ পরনের কাপড়গুলো একটা ব্যাগে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে বাড়ী থেকে বিদায় নেয়। কেউ জানলই না। শুধুমাত্র পাশের বাড়ীর এক গিন্নীকে বললো বাড়ীটা দেখো, আমি বাইরে যাচ্ছি। কথা বলার সুযোগই দেয় না। ভিতরে একটা পুঞ্জীভূত যন্ত্রনা তাকে যেকোন মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। চোখের জল লুকিয়েই, লুকিয়ে সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কালুর সঙ্গ ধরে। গল্পে ভরিয়ে রাখতে চায় কালু বুড়িমাকে। একথা সেকথায় তারা পৌঁছে যায় - আজ সকাল সকাল আশ্রমে। আজ ভিখও করেনি। রবিতো অবাক এতো সকালে কেন ফিরে এলো আবার সাথে এক বুড়ি। বুড়ি মা অবাক চোখে কালীমন্দির দেখে প্রণাম করে। কালু তার ডেরায় নিয়ে গিয়ে যায় এটাই আমার আশ্রম। আপনি এই ইন্দিরা আবাসেই থাকবেন। রবি চুপকরে দেখে যায়। রবিকে ঝাঁট্পাট্ দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে বলে। রবি পরিষ্কার করে দেয়। সেখানেই বিশ্রাম করে মা। আজ সকাল সকাল রান্না চাপাতে যায় কালু। মা কিন্তু আপত্তি করে নিরস্ত্র করে বলে — সে চান করে রান্না চাপাবে। স্নানে যাওয়ার আগে ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করে ছেলের ছন্ন ছাড়া ঘর। স্নান সেরে রান্না শুরু করে। আজ রবি ও কালু হেল্পার। কথায় কথায় রান্না হয়। রবিও মা মা করছে। সংসারে দুই ভাই আর মা। রান্না শেষে যত্ন করে খেতে দেয়। খাওয়া শেষে রবি জানায়, থালা ধোয়ার কাজটা তার বাঁধা থাকে যেন। এই অধম যেন থালা বাসন ধুয়ে একটু পুন্যি করতে পারে। শেষে মা খেতে বসে। রবি বলে — কালুদা, আজ দেখছো রান্নার স্বাদ।

কালু — মায়ের রান্নার সাথে কারও তুলনা চলে!

মা — হাসে।

কালু — এবার থেকে আর আমার চিন্তার কারণ নেই, রবিদা তোমার জন্য, থাকি আর না থাকি, মা রইলো।

রবি — তুমি না ফিরলে, আমার চিন্তা থাকবে না, কি যে বল।

কালু — তা থাকবে, কিন্তু তোমার ফেরার চিন্তার থাকবে না। রবিদা ওখানে একটা শাড়ী প্যাকেটে আছে না?

রবি — একটা প্যাকেট শাড়ীই আছে মনে হচ্ছে।

কালু — আগামী কাল মনে করিয়ে দেবে, দোকানে শাড়ীটা পাল্টে আর একটা শাড়ী নিয়ে আসবো মায়ের জন্য। আর কি কি লাগবে আমাকে বলে দেবেন।

মা — কিছু লাগবে না বাবা। এই তো বেশ, কিসুন্দর সবকিছু। মায়ের সন্তাদের যদি সব সুন্দর হয় তাহলে মাও সুন্দর থাকবে।

কালু — টুকিটাকি মসলাপাতি যা লাগে কিছু আনতেই হবে।

মা — মসলাপাতি যত কম তত ভাল।

কালু — তবুওতো কিছু সামান্যও চাই। কালই যেতে হবে রায়পুর।

বিকেলে, অনেকেই আসে বেড়াতে মাঝে মধ্যে। গোপালের ঠাকুমা, কালীপিসি, ভোলানাথের মা, রামচরণ খুড়োর স্ত্রী, আরও অনেকে আর পুরুষদের মধ্যে আসে রামচরন খুড়ো, কিংকর খুড়ো, ভোলানাথেরা সব।

প্রায় প্রত্যেকদিন দু চার জন আসে।

গল্পে গল্পে সময় পার হয়। সেদিন বৈকালে ওরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়। ভোলানাথ ও রামচরন খুড়োকে কালু বিস্তারিত ঘটনা বলে, আর এও বলে ইন্দিরা আবাসেই উনি য়াবেন না, যদি সকলে অনুমতি করেন। ওনারা একবাক্যে রাজী। মহিলারা জানায় কালুকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য্য হচ্ছি। মহিলারা পরিচিত হয়। ওরা বেড়াতে যেতে নিমন্ত্রণ করে। মহিলাদের বেড়াবার স্থানটা পাকাপোক্ত হোল। বিকেলে, তুলসী মঞ্চে ও কালীমাকে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখাবার ব্যবস্থা শুরু। সত্যিই মহিলারা ছাড়া গৃহ মানায় না, পুরুষদের সংসার ছন্নছাড়া, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়। মহিলার আর একাকী মনে হয় না, বরং খুব ভালই লাগে। যেন জীবনটাতে একটু হাওয়া লাগে।

পরদিন কালু বের হয় রায়পুরের পথে, স্ট্যান্ডে বাস ধরে যেতে হবে। চৌমাথা বাস স্ট্যান্ডে নামে। বুদো কুন্ডুর কথা মনে পড়ে। কি করবে ভাবছে, সেই সময় একটা রিক্সা এসে থাকে।

একভদ্র মহিলা বলে — দূর থেকেই চিনেছি, কালু ছাড়া আর কেউ হবে না। কালুকে অগত্যা বাড়ী যেতে হয়, স্নেহের টানে। ভদ্রমহিলা রিক্সাকে ছেড়ে দেয়। মহামায়া এখানের জাগ্রত দেবতা, পূজো দিয়ে ফিরছেন। হেঁটে বাড়ী পৌছে। বসতে দেয়। বাড়ীর দুই বৌমা এসেছে। এবং প্রণামও করে। জল্ টল্ দেয়। হাত পা ধুয়ে, জল খায়। ব্যাগটা রাখে। কথাবার্তা হয়। শুধু কালুর প্রশংসা। ভদ্রমহিলা আর কেউ নন। উনি সেদিন কালুদের ওখানে কালীপূজোতে গিয়ে ছিলেন। বুদো কুন্ডু গতকাল ছেলের কাছে কোন কাজে এসেছিল, সে তোমার গুণের কথা জানিয়ে গেছে। হলুদ কানালী না জামাবী গাঁয়ের পূজোতে মারামারি হওয়ায় থানা, মামলা মোকদ্দমা চলায় পূজো আসছিল না - কিন্তু কালু গিয়ে মামলা মোকদ্দমা মীমাংসা করে দিয়ে গেছে, মা দূর্গাও আসছে। গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। এখানে খাওয়া দাওয়া করে আশ্রমে ফিরতে আমন্ত্রণ জানায়। স্নেহের স্পর্শে না খেয়ে যেতে পারবে না। শাড়ী কাপড় দেখে, ভদ্রমহিলার কৌতুহল হয়। শাড়ী কাপড়ে কেন ব্যাগে জিজ্ঞেস করে।

কথায় কথায় সব কিছু ঘটনা বেরিয়ে পড়ে। ভদ্রমহিলা বলে তাহলে তিনজনের সংসার, শুনেছি পূজোয় চালটাল, পয়সা কিছু নাওনা। ভিক্ষায় সব চালাতে হয়। খুব কষ্টে চলছে তো।

মা — কোন রকমে চলে গেলেই হোল, মাকে পেয়ে আমার আর কোন চিন্তা ভাবনাই নেই, কি সুখে আছি আপনাকে বোঝাতে পারা যাবে না। আর পথে পথে আপনাদের মতো মায়েদের স্নেহ ভালবাসার স্বর্গ সুখের সন্ধান পাই। কি সুন্দর আছি, এই ভিক্ষুক জীবনে। আপনাদের আশীর্বাদে চারটি খেতে পরতে পেলেই হোল।

ভদ্রমহিলা — সবই বুঝলুম। তুমি একবার চল আমার সাথে।

কালু — কোথায় যেতে হবে মা?

ভদ্রমহিলা — তুমি এসো আমার সাথে। কোন কথা নয়।

গল্পে গল্পে অনুসরণ করে। একটা বিরাট দোকানে পৌছে। সকলেই তটস্থ। দুটো চেয়ারে দুজনে বসে।

ভদ্রমহিমা হুকুম করে — এই ছেলে একটা দর্জি ডেকে আনতো। দেখি জোড়া শাড়ী, একটা ভাল আর একটা মাঝারী। কি তোমার মা সধবা তো।

কালু — বিধবা।

ভদ্রমহিলা — সারু পাড়ের শাড়ীদে, একজোড়া সায়া ব্লাউজ, একটা গায়ের চাদর, শীত আসছে, তোমারও তো শীতের চাদর নেই।

কালু — এখন শীতের চাদর কিহবে।

ভদ্রমহিলা — বোকা ছেলে, শীত আসছে না, নদীর ধারে এবং পাহাড়ের শীততো জান না। তিনটে চাদর, আর দুটো ধুতি দাও, গেঞ্জি দাও। তুমি তো আর এদিকে মাড়াবে না। ভাগ্যিস দেখা হোল হঠাৎ। জিনিষ আসছে, একত্রে জমা হচ্ছে, দর্জি এলো বাউল পোষাকের মাপ নেওয়া হোল, আর একটা রবির জন্য রেডিমেড জামা বের করা হোল। দর্জিকে বলা হোল, একটার মধ্যে জামা চাই। দর্জি অবাক হয়, কিভাবে দেবে। না দিয়েও উপায় নেই। মাপা হয় ছিট্, দিয়ে যায় একটার সময় দিতে হবে জানিয়ে যায়। একটা ব্যাগে সমস্ত জিনিষ প্যাকিং হয়। আমার সময় বলে আসে - বুদো কুন্ডুকে তাদের বাড়ীতে যেন নিয়ে আসে একবার। বাড়ী ফিরে, বসে বসে কত কথা হয় কত গাঁয়ের, ভিক্ষার, মানুষের স্নেহ ভালবাসার কথা, অনেক সময় চোখে জল আসে। আধ ঘন্টার মধ্যে বুদো কুন্ডু হাজির, পূজোর ব্যস্ততার মধ্যে।

ভদ্রমহিলা — এসো বাবা। কালু এলো তাই ডাকতে পাঠালুম। বোকা ছেলে তোমার সাথে দেখা না করেই চলে যাবে। ছেলেটা কি করে সংসার চালাবে ভেবে পাই না। জামা ছিড়েছে। ভিক্ষায় একটি মাকে এনেছে। পূজোর কিছু জিনিষ নেয় না। ভিক্ষায় কিছু কি করে চলবে বুঝি না বাবা। তাই তোমাকে ডাকলুম, আপাদের এখানে এলে ছেলেটাকে কিছু দেব তার উপায় নেই। জোর করে কাপড় চোপড় দিলুম, নিতেই চায় না। ভাগ্যিস দেখা হোল।

বুদো কুন্ডু — সাংঘাতিক লোক মা এই ছেলেটা। সেদিন মনিপুরে, গোপী ঘোষের চারভাইএর থানা পুলিশ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে এসেছে। একসময়ে ভাঙ্গা হাঁড়ি গোটা করে দিয়ে এসেছে। কালই তো বলে গেলুম রামপদ বাবুদের গাঁয়ের পূজো নিয়ে মামলা মোকদ্দমা মিটিয়ে দিয়ে এলো বড় কথা গাঁয়ের একমাত্র পূজো পড়তে দিল না। মা, আমার ভীষণ ভিড় দোকানে, আসছি। কাউকে দিয়ে আমার দোকানে পাঠিয়ে দেবেন। কালু, তুমি না গেলে বাড়ীতে তোমার বৌদি আমাকে ঠ্যাঙাবে। যাবে ভাই। তোমার মতো লোক ঘরে গেলে ঘরটা পবিত্র হয়ে যাবে।

কালুকে রাজী করিয়ে চলে গেল। যত্ন করে মা খাওয়ালো সন্তানকে। নিরামিশ, রান্নার কত কি পদ, আর পরমান্ন। পরম তৃপ্তিতে খেল। খেয়ে ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ করে প্রণাম

করে। মা তো ভীষণ বকে, ব্রাহ্মণ হয়ে প্রণাম করার জন্য। কালু জানায় মাকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে জগতে। মহিলার দুই ছেলে বড় ব্যবসায়ী, ওদের পরিচয় হয়। ছেলেবৌ ওরাও প্রণাম করে। দর্জি জামা দিয়ে গেছে। ব্যাগটাতে ভরে মা, কালুর হাতে একশ টাকা দিয়ে, ব্যাগটা হাতে ধরিয়ে দেয়। সাথে দেয় ঘরের ঝিটাকে, ও বুদো কুন্ডুর দোকানে পৌছে দেয় কালুকে। কালু বুদো কুন্ডুর দোকান দেখে ছানাবড়া, এতো বড় গোলদারী দোকান, আর এতো ভীড়। বুদো কুন্ডুর এখনও বাড়ী ফিরতে দেরী ছিল ভাইদের বলে বাড়ী ফেরে। বাড়ী নিকটেই। বাড়ী পৌছায়। বৌদি ও তারা খুব আদর করে বসায়। এতখাবার জায়গা ছিল না — তবুও কিছু মিষ্টি খেতে হয়। ওখানে প্রথমে না খাওয়ার জন্য অভিমান হয় ওদের। অনেক কথা হয়। ওরা কালুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভাইরাও আসে। হাজির হয়। সকলেই খুশী। বাড়ী ফেরার সময় একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলে, নিয়ে যাও। স্নেহের দাবীতে নিতে হয়। স্নেহ ভালবাসার ধনে ভরে যায়, ভিক্ষার ঝুলি ও মন। আশ্রমে ফিরে মা ও রবিতো দেখে অবাক। কাপড়ের থলি তাদের পরিধানের ঠিক কোন জিনিষ নেই ভেবে পায় না। মুদির দোকানের থলিতেও যেন গোটা দোকান — তেল কেজি দুই, পোস্ত, ডাল, গুড়োমসশাপাতি, চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ, আর মায়ের জন্য নারিকেল তেলের কৌটো।

মায়ের হাতে, অন্য মায়ের দেওয়া একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিলে বলে, মা এটা রাখুন যখন যা লাগে খরচ করবেন। মা রাখতে চায় না, কালুর পীড়াপীড়িতে রাখতে হয়।

মা বলে — এত সব জিনিষ দিল বিনাপয়সায়, এরাকারা।

রবি বলে — বুদো কুন্ডু, গোলদারী দোকানের মালিক, আর কাপড়গুলো, মাড়োয়ারী মায়ের - খুব বড় ব্যবসাদার ওরা।

মা — টাকাটা কি মা-ই দিয়েছেন।

কালু — নিতে চাইলুম না, হাতে জোর করে গুঁজে দিল। দোকানের লোক ভয়ে তটস্থ। সদ্য কিনে, পূজোর ভিড়ে জামা তৈরী করে দিলেন। এমন সব মা থাকতে সন্তানরা কেন যে মাকে পর করে দেয়।

মায়ের চোখে জল। কালু ভুল বুঝতে পারে। তাই বলে — কিছু মনে করবেন না কি বলতে কি বলেছি।

মা বলে — জগতে তোমার মত যদি সকল সন্তান হোত তাহলে, পৃথিবীতে একটাই সংসাব থাকতো।

রবি — কালুদার তুলনা হয় না।

ষষ্ঠীর দিন দুটি লোক এলো, তাদের মধ্যে একজন ন্যাড়া, সেদিন রামপদ বাবুর বৈঠকখানায় ছিল। ন্যাড়া বলে — এই যে ভাই পূজোর চারদিন তোমার নিমন্ত্রণ।

কালু — কে নিমন্ত্রণ করেছে।

ন্যাড়া — কে করেনি বল। গোটা গাঁয়ের লোক তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। তোমার কথা লোকের মুখে মুখে। লোকে বলছে তুমি দেবতা, তুমি অসাধ্য সাধন করলে। আনন্দে গোটা গ্রাম টগবগ্ করছে।

সব পূজো যোগাড় প্রায় শেষ। মিস্ত্রী নিয়ে গোলমাল ছিল প্রথমে, অন্য মিস্ত্রী গড়েছে

কি ব্যাপার কে জানে একটা পয়সাও নেয়নি। শুধু বলেছে দরকার হলে রং এনে দিতে। এবং এও বলেছে যত দিন বাঁচবে প্রতিমা গড়ে দিয়ে যাবে বিনা পয়সায়। মায়ের মহিমা মা-ই জানে।

কালু — বিজয়ার দিন খিচুড়ী হচ্ছে তো?

ন্যাড়া — সে আবার বলতে। খিচুড়ীর যে চাল আদায় হয়েছে, তাতে খিচুড়ী হয়েও অনেক বেড়ে যাবে। তোমাদের মতো, ঐ দিন বন্দে যাচাই হবে।

জগা — না গেলে গাঁয়ের সব লোকই বকবে। শুধু হাবুদা বা রামপদদা নয়। এরই ফাঁকে জগা রবি ও মাকে বলেফেলেছে কালুর অসাধ্য সাধনের কথা।

ওদের চোখে বিস্ময়ের শেষ নেই। অন্য সকলের মতো, ঐশ্বরিক শক্তি ওর আছে ওরা মেনে নেয় আবারও। এদিকে ন্যাড়া ও জগা আজকের রাইপুরের পূজোর পার্বনী দেখে ওরা ভীষণ অবাক। এথ সহজে এত কিছু মানুষ দিতে পারে, তাও আবার কড়কড়ে একশো টাকার নোট। ওরা ভেবেই পায় না। মন্দির দেখে ওরাও কম অবাক নয়। কথায় কথায় জানায় এখন এমন সুন্দর মন্দির তারা জীবনে দেখেনি। ওরা দাওয়াতেই বসে। মা চা করে আনে। ওরা ভীষণ খুশী। যাবার সময় ওরা সকলকে জানায় নিমন্ত্রণ। ওরা বাড়ী ফেরে। বিকেলে যারা বেড়াতে এলো, ওরা পার্বনীর কথা শুনে খুশী। ভোলনাথের মায়ের সাথীরা আজ বেশী সংখ্যায়, বোধ হয় আশ্রমের মহিলাকে দেখতে। ওরা দেখতে চায়। দামী কাপড় চোপড়। তারপর এত মুদির দোকানের জিনিষ পত্র ওদিকেও আশান্বিত করে। মাড়োয়ারী ভদ্রমহিলা ও বুদোকুন্ডু যেতে এসব দিয়েছে। রবি জানায় মায়ের জন্য কাপড় আনতে গিয়েছিল রাইপুর, পথে ভদ্রমহিলার সাথে দেখা। তারপর ঘটনা বলে যায়। মায় একশো টাকার কড়করে নোটের কথা পর্য্যন্ত। সকলেই প্রশংসা করে বুদো কুন্ডু ও মাড়োয়াড়ী ভদ্র মহিলার। এ গাঁয়ের সকলেই জেনে গেছে কালুর প্রচেষ্টায় একটা গাঁয়ের মামলা মোকদ্দমা মিটে গেছে। দুর্গা ঠাকুর আসা বন্ধ ছিল, ঠাকুর আসছে। বেড়াতে আসা বুড়োরা কালুর কাছে জানে সব ব্যাপার, কথায় কথায় মনিপুরের ঘটনাটাও বেরিয়ে আসে, চার ভাইএর ঝগড়া, ভাঙ্গা হাঁড়ি গোটা করার ব্যাপার। সকলেই মুগ্ধ। ওরা বিস্তারিত ভাবে জেনে গেছে ফিরতি পথে, ন্যাড়া ও জগার কাছে। পরশুদিন পূজো। মা রবিকে কাজে লাগিয়েছে। মন্দির থেকে আশ্রম পর্য্যন্ত ঘাস ছাটা করাচ্ছে। নদী থেকে পলিমাটি এনে দাওয়া ইত্যাদি ধরিয়ে দিচ্ছে। আশ্রমের ? বেশ কিছু জায়গা চাঁচা হয়েছে। গোবরও কুড়িয়ে আনা হয়েছে গতকাল। এরপর ন্যাতা দেওয়া হবে আশ্রম থেকে মন্দির পর্য্যন্ত চাঁচা জায়গাগুলো। রবিরও কাজের উৎসাহের অন্ত নেই। মাকে কালু নিষেধ করে, মা নিষেধ শোনে না। এই চার দিনে পরিবশটার চার অবস্থা করেছে। একটা শান্তশ্রী রূপ নিয়েছে। বর্ষায় লাগানো গাঁদাফুলের কুড়ি এসেছে। এছাড়া রবি ও কালু হরেক রকম ফুলের গাছও লাগিয়েছে। নদী তীরের কাশ ফুল একে করে ঘর গোড়া পর্য্যন্ত। কাশফুলে মায়ের আগমনী বার্ত্তা আকাশে বাতাসে। নিউলি চারাটা বেশ বেড়েছে। সার দেওয়া হয়েছে। গাছগুলো তাজা। মা সুখেই আছে। এখনও ভোলানাথ গোপালের কিংবা রামচরনদের বাড়ী যাওয়া হয়নি। এগাঁয়ে দুর্গাপূজো আসে না। না আসুক ক্ষতি নেই এরা প্রতীক্ষায় থাকে কালীমায়ের পূজোর

জন্য। পূজোর স্মৃতি কারণে অকারণে গল্পের মাঝে আসে। এতেই গাঁয়ের ভীষণ আনন্দের ব্যাপার।

পূজো এসে গেল, পূজো কয়দিন, দুপুরে রান্না হয় নি। গাঁয়ের অনেকেই নিমন্ত্রণ করে গেল। ওরা মানে রবি ও মা যায়। কালু যায় ভিক্ষায়। কালুর চিরকালের নেশা পূজো দেখার। কালুর কাছে দুর্গাপূজো মানে একটা ভীষণ জিনিষ। সপ্তমীর দিন, পূজো সেরে, আখঘুটা দিদির বাড়ী। দিদিও ভীষণ আনন্দিত। দিদি জামাইবাবুর আদরের শেষ নেই। গল্পে গল্পে দিনটা কখন কেটে গেল বোঝা গেল না। বিকেলের একটু আগেই ফেরে। কোথাও রাত কাটাতে পারে না, সকালে নিত্তিসেবা আছে মায়ের। নিত্তিসেবা সেরে তরে বের হয়। অষ্টমীর দিন যাবো না যাবো না করেও হাজির হয় সেই ন্যাড়াদের গাঁয়ে। অষ্টমী পূজো সন্ধি ১২টায়। যখন পূজো মন্ডপে পৌছাল তখন পূজোয় বসে গেছে। সকলেই আনন্দের সাথে অন্তরের সাথে, পূজো মন্ডপে বসায়। কোথায় যে বসাবে ভেবেই পায় না। একেবারে প্রতিমার সামনে কম্বল পেতে বসতে দেওয়া হয়েছে। রামপদ বাবু, হাবুবাবু, ন্যাড়া, জগা, মদন ও চেনা অচেনা অনেকেই ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে। বাড়ীর কয়েকজন গিন্নীও ভালমন্ড জিজ্ঞেস করে এবং মায়ের আসার পিছনে অবদানের ও তাদের কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই দেখছে তাকে ঠাকুর পূজো বাদদিয়ে। চঞ্চলের জেঠিমাও এক ফাঁকে চোখে ও মুখে কথা বলে গেল। অনেকেই অনুরোধ করে চারটি জলযোগের জন্য। সে জানায় পূজো সারা হোলে তারপর জলযোগ। মন্দির ও তার সংলগ্ন আটচালা, সেটাও ছাদের, মেজে পিঁড়ে মোজাইক করা। জিনিষটা ভাল হয়েছে, আরও ভাল হোত কয়েকটা ধাপ থাকলে, সকলেই বলছে, তাড়াহুড়ো হলেও এবছরের মায়ের প্রতিমা সবচেয়ে ভাল হয়েছে। গাঁয়েতে কুটুমের আগমন বেশ বেশী বলছে। আসবে না আসবে না করে হঠাৎ আসা তারপরে খিচুড়ী বন্দে ব্যাপার গোটা গাঁয়ের। সকলকেই এবছরের পূজোটাকে একটু আলাদা করে দেখছে।

গোটা আষ্টেক উনুন, এখনও শুকোয়নি, চারপাশে কাঠ সাজানো রয়েছে। বিরাট পূজো প্রাঙ্গন, তিল ধরনের স্থান নেই। বৌ, ঝিউড়ি, গিন্নী ও ছেলেদের জমায়েতই বেশী। কালুর কাছেই বসেছে হাবুবাবু একটু পর রামপদবাবুও বসে। পূজোর গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুই বিপরীত মেরুর নেতাদের উপস্থিতিও সখ্যতায়। কালু একদৃষ্টে মা দূর্গার দিকে তাকিয়ে আছে। কানে পূজোর মন্ত্রের ধ্বনি, গম গম করছে ভিতরটা। পরিবেশটা যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ধারণ করেছে। ধূপ ধুনো গন্ধে সুবাশিত মন, পুলকিত পূজোর আনন্দে। শিহরণ বয়ে যায় এবছরের অষ্টমী পূজোর ফুল দেওয়াতে এতো সুন্দর ফুল কখনও দেয়নি। সকলের মুখে আনন্দের মা এবার দুহাতে করে এহাত দূরে ফুল ছুড়ে দিয়েছে। আসব না আসব না করে মা এসে খুব খুশী! কথাটা বলে হাবুবাবু। রামপদ বাবু — একেবারে খাঁটি কথা। সত্যি কথা বলতে কি এবারের মতো কোনদিন আনন্দ পায়নি। হাবু বাবু — যা বলেছ দাদা, এবারের মতো কোন দিন আনন্দ পাইনি।

কালু — মা আপনাদের গাঁয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়েছেন। তাই সকলের মুখে হাঁসি। অথচ বলছিলেন সময় নেই কি করে পূজো হবে। আপনাদের মতো লোক থাকতে গাঁয়ের

কিনা হবে। আর একটা কথা বুদো কুন্ডু মশায়কে এ ব্যাপারে না কথা বললে কি চলতো না।

রামপদ বাবু — সত্যি কথা বলতে দোষ কিছু নেই।

হাবু বাবু — সত্যিটা স্বীকার করাই, শুভবুদ্ধির লক্ষণ।

কালু — না বললেই হোত।

রামপদ বাবু — দেখা হয়ে ছিল নাকি।

কালু — দেখা আবার হয় নি। যদিও আমি দেখা করিনি। দেখা হয়ে গেল, পথে মাড়োয়ারী মায়ের সাথে আবার উনি বুদো কুন্ডুদাকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। মা আমাকে আমাদের তিনজনের সারাবছরের জামাকাপড়, শীতের চাদর দিলেন, বুদোদা মাস দুইএর মুদির দোকানের জিনিষ পত্র দিলেন। তারপর মা কড়কড়ে একশো টাকার নোট দিলেন। গাঁয়ের লোক দেখে, চক্ষু চড়ক গাছ।

রামপদ বাবু — সেদিন বলেন, দুজন, আবার একজন কোথায় গেলেন।

হাবু বাবু — ন্যাড়া আমাকে বলেছে। চার চাকুরে ছেলের মাকে নিয়ে এসেছে। উনিই কালুর কাছেই থাকে। তার মধ্যে একজন ডাক্তার।

রামপদ বাবু — আশ্চর্য্যতো। তোমাকে ভাই প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঠাকুর থান না হলে প্রণাম করতুম।

কালু — ওসব বলে ছোট করবেন না। সবইতো মায়ের ইচ্ছায় হয়। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। আপনি যদি আমাকে ভাই ভাবেন ক্ষতি নেই। তেমনি ওনাকে মা মনে করলুম। কি আদর যত্নই না করেন উনি। মায়ের মতো ভালবাসা আর কার কাছে? আমি ধন্য।

হাবু বাবু — তোমার সাথে কথা বলেও আনন্দ হয়।

রামপদ বাবু — ঠিক্।

সন্ধিপূজো সারা হয়। পূজোর প্রসাদের থালা নিতে ভীড় জমেছে। দুদশ জন ধুনো পোড়াবে, মন্দির চারপাশে পরিক্রমা করবে। ওরা সকলেই মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। রামপদ বাবু -- কালুকে মায়ের সামনেই হঠাৎ প্রণাম করে, দেখাদেখি, হাবুবাবুও। কালু যদিও জড়িয়ে ধরে। সবাই দেখলো, একজন অল্প বয়সী ভিখারীকে গাঁয়ের দুই প্রধান প্রণাম করছে। সকলেই আবাক। দুচোখ ভরে দেখলো ব্যাপারটা। রামপদ — ভাই কালু তোমার সান্নিধ্যে আসার পর ভীষণ শান্তিতে আছি। ভেবে দেখেছি কি ভুল না করছিলুম। ঝগড়াটিতে, তার দ্বন্দ্বে কিছু নেই। মিলেমিশে সুখে শান্তিতে সবটাই ভাল।

হাবুবাবু — একদম ঠিক। জান ভাই আমার দাদা ছিল না, তুমি আমাকে দাদা দিয়ে গেলে। দাদা থাকলে ভায়ের আবার ভয়কি। দাদার ভালবাসার আমি এখন পরম সুখী। এতে কি আনন্দ দেখাবার হলে দেখতুম।

রামপদ — হাউকাউ করে জড়িয়ে ধরে হাবু বাবুকে, ভাই কিছু মনে করিয়া না, জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জালিয়েছি, আর ভুল নয়। এমন ভাই থাকলে আমার কি চাওয়ার আছে। দেখিস ভাই মায়ের সামনে শপথ করছি আর কখন নয় তোর প্রতি অবিচার।

কালু — শুধু ওনার প্রতি নয়, সকলের প্রতি। এক ভাই পাওয়াতে কত আনন্দ পাচ্ছেন আর গোটা গাঁয়ের লোককে যদি ভাই করেন, তাহলে সকলে মাথার করে দাদাকে রাখবে।

বল দিয়ে, রাজনীতি দিয়ে ভয় সৃষ্টি করা যায় অপরের শান্তি বিঘ্নিত করা যায়, যায় না পাওনা ভক্তি, শ্রদ্ধা ভালবাসা। এতে সুখ আছে শান্তি আছে। এটাইতো জীবনের কাম্য। আর কিছু চাওয়া আর পাওয়া থাকতে পারে।

তিনজনকে দেখছে - ওদের চোখের জল দেখছে দেখছে বুকে জড়িয়ে ধরা। সকল মানুষ হতভম্ব। ভাল দৃশ্য দেখতে কার না ভাল লাগে। একটি মহিলা উঠে আগে দাওয়ায় কালুকে প্রণাম করে, রামপদবাবুকেও প্রণাম করে। শেষে হাবুবাবুকে বলে, আজ ভাই তোমাদের দুজনকেই আমাদের বাড়ীতে এখনই পদধূলি দিতে হবে, না হলে একপাও নড়ছি না।

রামপদ — তুমি ঠিক বলেছ। চলতো হাবু, চলতো কালু, আর ছাড়বি না - প্রাণের ভাইদের, সারা জীবন ভুলই করেছি আর নয়।

মহিলা — এতদিকে চোখ ফুটলো। দেখ কত আনন্দ আজ তোমাদের। ভাবছে আমি তোমাদের দেখিছি, সকলেই দেখেছে। সকলেই তোমাদের ব্যপার বুঝেছে। সকলেরই চোখ ছল ছল করছে। দেখ, কাছাকাছি যারা আছে, ছেলে, বুড়ো, বৌ, গিন্নী সকলের।

মহিলার কথায় ওদের চোখে জল। তাকিয়ে দেখে অবাক বিস্ময়ে শত চোখ তাদের দিকে। চঞ্চলের ঠাকুমার কাছে এসে কান্নায় ভেজা কণ্ঠে বলে — সত্যি মা আমাদের আজ যা দেখালেন গায়ে কাঁটা আসছে। গোটা গাঁয়ের লোক তারিফ করছে, তোমাদের দুজনের আচরণে সকলেই মুগ্ধ। আমি বলছিলুম — আমাদের বাড়ীতে তোমরা তিনজনই চল।

মহিলা — কাকীমা! কি রকম কথা হোল, আমি প্রথমে এসে বললুম, আপনি বলছেন পরে, আজ নয় পরে একদিন ওদের ডেকে নিয়ে যাবেন। দরকার হলে কালই নিয়ে যাবেন।

কাকীমা — ঠিক আছে, আগামীকাল নবমীরাতে তোমার শুদ্ধ নিমন্ত্রণ।

মহিলা — ঠিক আছে মা। দেখবেন ভুলে যাবেন না খোকাদের পেয়ে। আপনি বরং চলুন আমাদের বাড়ীতে আজ চলুন।

কাকীমা — দেখো মা ভুলব না।

রামপদবাবু — কাকী মা চল। মা তো গত হয়েছেন, তুমি আমার মা। ছাড়ছি না, যেতেই হবে।

কাকীমা — চল তবে চল্। তোদের অন্তরের ডাককে কি ফেলা যায়। আমিও তো চাই - মায়েদের ছেলেদের আদর করতে কি মন চায় না?

কাকীমা সহ সকলেই আসে। বুঝতে পারে উনি রামপদদার স্ত্রী। ওনারে বৌদি বলে। কি আনন্দেই না খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা বাড়ি ফেরে। কালুও আশ্রমের পথে ছাড়তে চায়নি। আগামী দিনে আসবো বলেই দিয়েছে। আরও কথা হয়েছে বিজয়ারদিন থাকতেই হবে। দরকার হলে নিত্তিসেবা করানোর জন্য ব্রাহ্মণ পাঠাবে। কালু জানিয়েছে নবমী রাতে থেকে পরের দিন ভোর ভোর আশ্রমে গিয়ে পূজো সেরে ফিরবে, পারলে রাতে থেকে পরের দিন বাড়ী।

নবমীর দিন পূজোর আগে লোকে লোকারণ্য। শেষ নবমীর দিন পাঁঠা বলীরও ব্যবস্থা আছে। দুপুরে হাবু বাবুদের বাড়ীতে রামপদ বাবু সহ সেবা হোল। রাতে চঞ্চলদের বাড়ীতে। চঞ্চলেরর ঠাকুমা আগেই থেকেই জানিয়ে দিয়ে গেছে। চঞ্চলেরা একটা বড় পাঁঠা দিয়েছে। নিমন্ত্রিত রামপদ বাবু সস্ত্রীক ও হাবু বাবু সস্ত্রীক আর ন্যাড়া, মদন, হাবু, জগা ও আরও

অনেকে। খাওয়াদাওয়া সেরে গল্প হয়। শুতে প্রায় রাত বারোটা। গল্পে গল্পে রামপদবাবু ও হাবুবাবুর দুটো পরিবারের মধ্যে মালিন্য ও গ্লানি, কালিমা ধুয়ে মুছে গেল, চোখের জলে। জলে যেমন সবকিছু পরিস্কার হয়, কিন্তু মন পরিষ্কার হয় না, কিন্তু চোখের জলে মনে পরিষ্কার হয়। পবিত্র হয় গঙ্গা জলের মতো। বাড়ীতে অনেক আত্মীয় স্বজন এসেছে। সকলেই কালুকে বিস্ময়ের চোখে দেখে। কালু শুয়েছে বাইরের দিকে বৈঠকখানায়। কালু ভোরে উঠে, আশ্রমের পথে পাড়ী দেবার আগে, মেজোবৌ এর সাথে দেখা হয়। দেখা হলে জানায় কত কথা জমে আছে। তা থাকুক। একটু অনুরোধ, মাঝে মধ্যে আসবে বাড়ীতে, তার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে। তাকে দূর থেকে দেখেও তার শান্তি। কালু ভাবে ভগবানই জানেন, কি আছে তার মধ্যে — ঠাণ্ডামণিরা, জবার মতো রমণীর জা, বড়গিন্নি আর আছে চোখের দেখাতেই তৃপ্ত এমন অনেক। বড্ড ভাল লাগে সেই ক্ষণটি। সেও একটা অজানা আকর্ষণে সেই দরজায় হাজির 'জয় রাধামাধব' বলে। ঝুলি ভর্ত্তি মনও ভর্ত্তি হয়। বরং ভাবে ভিক্ষুকের জীবন সকলের নিকট একটা ব্যাপার — এখন এ পথে মনে হয়, এই দেওয়া নেওয়া মাঝে এক অকৃত্রিম ভালবাস আছে, যা, ভিখারী জীবনের পরম প্রাপ্তি।

ভোর রাত থেকে খিচুড়ী চেপেছে। গত রাত্রে বন্দে তৈরী হয়েছে। সারারাত প্রায় জেগে ছেলে ছোকরারা। বুদোকুণ্ডু মহাশয় রাতে হাজির হয়েছেন জোর কদমে কাজ হচ্ছে। পূজো করে ফিরেছে কালু ১০টার সময়। ঘট বিসর্জ্জনও হোল। গোটা গাঁয়ের লোক মাকে বিসর্জন দিয়ে এলো বাজনা, শঙ্খ, হুলুধ্বনি ও আবীরে। গোটা গাঁ এক হয়ে গেছে এই উৎসবে। আবীরে আবীরে লালে লাল, যেন হোলি এসেছে। সকলেই হৃদয়ে রাঙিয়ে নিচ্ছে প্রাণের অনাবিল স্নেহ, ভালবাসায়, শ্রদ্ধায়।

বিসর্জন পর্ব শেষ। খাওয়া শুরু হবে। রাস্তা প্রাঙ্গন সব ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। ছেলে মেয়ে সকলেই হাত লাগিয়েছে। বুদোকুণ্ডু মহাশয়ের সাথে কথাবার্ত্তা হয় কালুর। কালু ঠাকুর দালানের একটা আসনের উপর বসে আছে। রামপদ ও হাবুবাবু ঘোরাঘুরি করে তদারকি করছে। ব্যাচের পর ব্যাচ আসছে খাচ্ছে যাচ্ছে, ছেলে বুড়ো, পুরুষ মহিলা, উচ্চ নীচ সকলেই এক পঙক্তিতে খাওয়ার আগে দুর্গামাতার নামে জয়ধ্বনি দেয়, জয়ধ্বনি দেয় রামপদবাবু ও হাবু বাবুর নামে। শেষে কালু বৈরাগীর নামে। সকলেই খুশী তরকারী, খিচুড়ী ও বন্দের প্রশংসায়। বন্দে যাচাই। সকলেই ধন্য ধন্য করছে। এরকম মিলনের দিন কখনো আসেনি এ গাঁয়ে। সাতজন ছোকরা এসে কালুকে প্রণাম করে। কালু প্রণাম করতে দেয় না জড়িয়ে ধরে। ওরাই সকলেই আসামী। কিন্তু চারজনের নামে মামলা হয়েছিল। সকলেই জানায় এ আনন্দ থেকে গাঁয়ের লোক বঞ্চিত হোত, আপনি না থাকলে। আর বঞ্চিত হোত আমাদের জন্য। ভীষণ পাপ হোত। কালু জানায় — কিযে মহৎ কাজ করলে তোমরা ভাই এখনও জান না। পরে উপলব্ধি করবে। অপরের অশান্তি সৃষ্টি করলে নিজেরও অশান্তি হয়। আজকে যে একসাথে এত লোক আনন্দ করে শান্তিতে সেবা করছে, দেখে তোমাদের আনন্দ হচ্ছে না, পূজোতে এত আনন্দ করলো গোটা গাঁ তাতে তোমরা আনন্দ পাওনি। আজ অধিকাংশ মহিলা, পুরুষ, ছেলেপুলে খাওয়ার আগে ও পরে মাকে প্রণাম করে যাচ্ছে তার সাথে কালুকেও। কালুর খারাপ লাগছে তবুও বাধা দিতে পারে না। হাসি মুখে প্রণাম করে যাচ্ছে অন্তরের সাথে এতে কালুরও ভাল লাগছে অবশ্যই। এটা একটা স্বীকৃতি। অনেক বৌ,

ঝিউড়িরাও পরিবেশন করছে আমোদে। অনেক মহিলা পুরুষ দর্শক হিসেবে পরিবশনে রয়েছে। এটা এক মিলন মেলা। অবশেষে শেষ হয়। এবার পরিবেশনকারীরা, মাতব্বরেরা, পাচকেরাও, বুদোকুণ্ডু, কালুরা পরিবেশন করছে গিন্নী ও বৌঝিরা, যারা আগেই সেবা করেছে। এদের খেতে অন্য ব্যাচের চেয়ে বেশী সময় লাগে। কারণ ওরা গাঁয়ের নূতন জন্মান্তরের কথা মশগুল। ওদের তৃপ্ত হৃদয়ের আনন্দ কানায় কানায় উপচে যাচ্ছে। আলোচনার শেষ হয় কালুতে। বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সকলেই। ওর মাঝে সায় দেয় বুদোকুণ্ডু মহাশয়। খাওয়া দাওয়া শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা। লোক গণনার ভার যাকে দেওয়া হয়েছিল সে জানায় সাড়ে চার হাজারের উপর লোক খেয়েছে। এক গামলা খিচুড়ী, তরকারীও আছে, আছে কিছু বন্দে। বলা হোল যারা ভাসাবে তারাই খাওয়া দাওয়া করে যাবে। সকলেই খুশী আনন্দিত। গাঁয়ের ইতিহাসে বেশি এই দিনটাতে সকলেই হেসেছে আনন্দ করেছে খুশীতে। সকলের মুখ ঝল্ মল্ করে। সেটা বোঝা যায়, কাজে, আভাসে, ইঙ্গিতে, হাসিতে......। রামপদবাবু ও হাবুবাবুর হুকুম মদে কেউ হাত দেবে না। মদ খেয়ে মাতলামি করলে হাজার টাকা ফাইন। পটকা ফুটছে, মাইক বাজছে সাথে বাজনা বাজনার তালে তালে নাচ হচ্ছে চার পাঁচটা দলে। কালুকে বাড়ী যেতে দেয় না। বুদোকুণ্ডু মহাশয় অনুরোধ করে সে থাকতে। অবশেষে থাকতেই হয়। রাতে খাবার প্রয়োজন ছিল না, অনুরোধে খেতে হয় হাবু বাবুদের বাড়ীতে, রামপদ বাবুও নিমন্ত্রিত। রাতে খেতে খেতে বুদোকুণ্ডু মহাশয় বলে — "কালু ভাই তুমি যা খেলা দেখালে, তাতে তো তুমি এখানে আর ভিখ্ করতে পারবে না।"

রামপদবাবু — "আজ আবার উনি ভিখারীর আসনে নেই, আজ উনি আমাদের পরম গুরুজন। গুরুজনেরাই তো তাদের অনুগামীদের আপদে বিপদে পথ দেখান'।

হাবুবাবু — ঠিক কথা বলেছ দাদা। যদি পূজো না হোত তাহলে দিনগুলো কীভাবে কাটতো কেজানে।

বুদোবাবু — গাঁয়ের সকলে তোমাদের দুজনকে গায়ে থুতু দিত।

রামপদবাবু — দারুণ বাঁচিয়েছ ভাই কালু।

কালু — আর এমন করে বলবেন না। এবার অন্য কথায় আসুন।

বুদোবাবু — কালু ছাড়া গীত নাই। যা গান লাগিয়ে দিয়েছ না আসছে বছর দেখবে কি হয়।

বিদায় হয় সকলে, কালুও আশ্রমে পৌছে শোনে কালু পূজো সেরে বিজয়ার দিন বের হওয়ার পর, মায়ের ডাক্তার ছেলে টাটা সুমোয় হাজির হয় মাকে নিয়ে যাবার জন্য। মা কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়নি। শুধু বলেছেন 'আমি যে আনন্দময় জীবনের সন্ধান পেয়েছি, তাকে হাতছাড়া করতে রাজী নই। কথাগুলো অভিমানে, রাগে, ব্যাথায় বলছি না। একয়দিনের উপলব্ধি থেকেই বলছি। গার্হস্থ্য জীবনের পর, সন্ন্যাস কিংবা বানপ্রস্থই দরকার। এটা আমার বানপ্রস্থ। তোমরা আমাকে প্রলোভন দেখিও না। ভগবানের আরাধনা করতে করতে যেন তোমাদের কোলে শেষে মরতে পারলেই ভাল হয়।

নাতি, নাতনী, বৌমা ও ছেলের শত অনুরোধে টলেনি, অনেকেই যারা খবর পেয়ে এসেছিল, তারা সকলেই ভেবেছিল চলে যাবে। সকলেই আশ্চর্য্য হয় ভদ্রমহিলার কাজে।

নাতি নাতনীদের আদর করে। প্রসাদী মিষ্টি থাকেই। তাই দিয়ে মিষ্টি মুখ করায়। খেতে খেতে অনুরোধ করে, রবিও অনুরোধ করে। রবি ও কালী পিসি, ভোলানাথের মা, গোপালের মা খবর পেয়ে গেছে । ওদের সকলের অনুরোধে থেকে যায়। ভোলানাথের মা বাড়ীতে মাছ আনতে বলে রবিকে আর সাথে এক মাঝারি হাঁড়ি ও কড়াই আনতে বলে। রান্না বান্না হয়। মায়ে বেটায় কথা হয়, নাতি নাতনীরাও কত কথা বলে। বৌমা শহুরে শিক্ষিতো রমণী উনিও ডাক্তার। উনি কথা ও কাজের চেয়ে প্রকৃতির নির্জনতার মাঝে হারিয়ে যায়। নীল পাহাড়ে, বনানীতে আর গিরিখাত মতো কংসাবতীতে......। এত অপরূপ জায়গা আছে ভাবতেই মন চায় না। গোপালের মাও ভোলানাথের মাও কালী পিসিরাই রান্না করে। রবি প্রায় কেজি দুই এর মতো একটি বড়ো রুইমাছ এনেছে। ওরা মাছ দেখে নাতনীরা খুশী। নদীতে স্নান সেরে মহানন্দে, খাওয়া দাওয়া রীতিমতো ভোজের মতো, সবেতেই মায়ের স্পর্শ। মাই নিজে খেতে দেয়। সন্তানকে খেতে দেওয়া এটা একটা জীবনের প্রতিটি মায়েরই সবচেয়ে প্রিয় কাজের অন্যতম। অন্তরের বেদনা, বাইরের মুখে হাসি দেখিয়ে বিদায় নেয়। যাবার বেলায় নাতি নাতনীরা বলে গেল, ঠাকুমা বাপীকে নিয়ে আবার আসবে। আসবে কিনা তারাই জানে, তবে অন্তরাটা সব পাওয়ার পরও যেন হারানোর বেদনায়, বিজয়ার দিনে মনটা ভরে যায়। তবুও তো দেখা হোল। এটাই বা কজন রত্নগর্ভা মায়েরা পায়? আবার ভাবে রত্ন না করে ছেলেরা যদি আস্ত গর্দভ হোত তাহলে কেমন হোত? এখানে এসেই প্রায়ই শুনেছে ? গোড়াবাড়ীর কংসাবতী জলাধারের কথা। একদিন গোপালকে নিয়ে বের হয়। বাসে যায়। বাস চলেছে কংসাবতীর কিনারে কিনারে। অপূর্ব দৃশ্য, উত্তর দিকে নদী। ওপারে বিশাল মালভূমি টিলা, সেই পাহাড় আবর দক্ষিণে বনানী বেষ্টি নীল শৈলশিরা......। গোটা বাড়ীতে এক ভিক্ষুক বাসে চাপে। একজন প্যাণ্ট পরা চাকুরী বাবুর পা মাড়িয়ে দেয়। বাবুর বলা হোল, এই ভিখারীদের জন্য পথে বেরোনোই দায়। কালুর মন প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু কি ভেবে বিরত থাকে। তার মনে হয় যেন বলে, জগতে কে নয় ভিখারী? যারা ভিখারীর ড্রেস পড়ে খুব কম ভিক্ষায় শান্ত তারাই ভিখারী। আর যারা ভিখারী নয় তারা ভদ্রলোকের ড্রেস পড়ে খুব কম ভিক্ষায় শান্ত নয় তারাই ভদ্রলোক। তারা যে অন্তরে ভিখারীর চেয়ে অধম। তাই তারা ভিখারী নয়। কালু ভাবে জগতে কে আর ভিখারী নয়। শেষে পৌছোয় মুটুক মণিপুর। মৃত কঙ্কাল সার কুমারী ও কংসাবতী পার হয়ে। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। চাটা খেয়ে ওরা হাঁটাতে থাকে। বাঁধে হাঁটতে চোখে পড়ে দক্ষিণে রাণীবাঁধ থানা আর পুরুলিয়ার বাঁদোয়ান থানার নীল শৈলশিরা — সবুজ বনানী পশ্চিমে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, সমুদ্রের মহিমায়। নীল পাহাড় বনানী যেন জল খেতে খেতে নেমেছে সাগরে। মাঝে ছোট ছোট দ্বীপও দেখা যায়। অপূর্ব মনোরম মনে হয়। আর ড্যামের মাঝামাঝি যেখানে কুমারী ও কংসাবতী সংযোগ স্থলে হবে একটা টিলা রয়েছে টিলার উপরে পূজিত শিলা মূর্ত্তি। টিলা থেকে চতুর্দিকে তাকালে শিহরণ বয়ে যায়। উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে সমুদ্র, সবুজ বনানী আর নীল পাহাড়ের নীল মধুরিমা অপূর্ব মাধুর্য্য এনে দেয়। পূবে দেখা যায় ড্যামের নীচে ছোট ছোট ধানক্ষেত্রে মনোরম শোভা, শেষ শরতে কোথাও সোনালী ধান, কোথাও সবুজ ধান। সোনালী আর সবুজের

বোনা কার্পেটের মতো মনে হয়। এখানে কি নেই, অনন্ত নীলাকাশ, শরতের নীল জলরাশি নীল পাহাড়ের সারি, সবুজ বনানী আর সোনালী ও সবুজ — গালিচা, এক কথায় এত সৌন্দর্য্যের সমন্বয় কোথাও কি একসাথে পাওয়া যায়? তার জানা ছিল না। পুরুলিয়া জেলার একটা বনানী অংশ সবুজটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েও পারেনি। নৌকায় পার হয় সেই জলরাশি, অবতরণ করে বনানীতে, যেথানে ডিয়ার পার্ক। দু একটা চকিত চঞ্চলা হরিণী সহ হরিণ দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। ইচ্ছা ছিল নৌকা করে ভ্রমণ বনানীর ও পাহাড়ের গা ধরে বনের ও পাহাড়ের শোভা দেখা। কিন্তু সাধ্যে কুলায় না, যদিও বা সাধ্যে কুলায় কোথায় সেই তরণী। হয়না তরণী বাওয়া, অগত্যা জলে কিছুক্ষণ স্নান করে নিজেদের শান্ত করে। যাওয়া হয় না বাঁধের অপর সীমানায়। বাঁধ চৌদ্দ কিলোমিটারের মতো লম্বা। সুতরাং আরও সাত কিলোমিটার হাঁটাও হয় না। খিদেরও উদ্রেক হয়েছে। এতেই প্রায় দেড়টা বেজে গেছে। এরপর তার চারটি খেয়ে জলের গেট, বাগান, পাহাড়ের শিখর দেখে বাড়ী ফিরবে। দেখতে দেখতে আরও ঘণ্টা দেড় পার হয়, চারটের সময় বাসে চেপে ফিরে আসে অপূর্ব কি মনোরম জগৎ থেকে। বাঁধের বসে বসে ভাবতে বেশ ভাল লাগে, দেখতে ভাল লাগে বড় ঢেউ ওঠা, তার মাঝে জেলেদের ডিঙি নৌকা বাওয়া। ফিরতে ফিরতে ভাবে যদি সাগরে জল খেতে আসা পাহাড় ও বনানীর মাঝে একেবারে জলাধার ঘেঁষে একটা তার পর্ণ কুটীর থাকতো তার বসবাসের জন্য, এক ভালই না লাগতো। রাতে আরও মনোরম হোত বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে। আবার মনে হয় অমাবস্যার ঘোর আঁধারে সব কিছু আঁধারের মাঝে ডুব দিতে কি মজাই না হোত, শুধু রাতচোরা ও আর ঝিল্লীর রব শোনা যেত। দেখা যেত জোনাকীর আলোর দীপ মালা। ঢেউয়ের ছলছলাৎ শব্দে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তুম জানতুমই না। কি মজাই না হোত। মনে হয় প্রকৃতি কত উদার, আর আমরা ভিখারী, প্রকৃতি বাঁচবার সামগ্রী দিতেই ক্ষান্ত নয়, অকাতরে সে দেয় উপহার, সৌন্দর্য্যে ভরা পটচিত্র। মনে হয় প্রকৃতি ভিখ দিয়ে ভিখারী, আর আমরা ভিখ্ নিয়ে ভিখারী। আমরা সবাই ভিখারী, স্বীকার করি বা না করি আমরা চির ভিখারী। ভিখারী বলেই আমরা ভিখারীর মতো ভিখ্ নিয়ে এত আনন্দিত। ফিরেও রেশ কাটে না রূপ বৈচিত্রের। মন বার বার আসার অপেক্ষায় থাকতে চায়। দেখতে দেখতে পরকূল পরব আসে পিঠে পরবের সাথে। গোপাল এবারেও সাথী। টুমু পরব ও দেহাতী আদিবাসীরাও অংশ নেয়। আদিম বন্য জীবনের ছোঁয়া জীবনের পড়তে পড়তে মহুয়ার নদ অএন্যতম ভাবে তাদের আদিম বন্য হতে দেয়। বড্ড ভাল লাগে, নদী গর্ভের ক্ষয়জাত শিলাস্তর, যেন মহাকালের প্রহরীরা স্থিতজ্ঞ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কালের প্রহর গুণছে। ওরা ফিরে আসে বাড়ীতে বিকেলে। পথে দেখা ঠাণ্ডা মণিদের, পথে দেখা যায় সেই কংসাবতী নদী গর্ভ। সেই নীল পাহাড়ের সারি সেই বনানী বার বার ভাল লাগে যাওয়া আসার পথের ধারে। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর সেই প্রিয় বেঞ্চটিতে বসে। শীতের হিমেল রাত। শীতটা এখানে একটু ? একমাত্র দার্জিলিং জলপাইগুঁড়ির চেয়ে কম। হাড় কাঁপানো শীতেও কিছুক্ষণের জন্য বসে। বোধ হয় ষষ্ঠী সপ্তমীর চাঁদ উঠছে। আকাশে মেঘ নেই। এতক্ষণ ছিল আকাশে তারাদের বাহার। এতক্ষণ নদীর ওপারে টিলা সহ বনানী নদী মনটা চুরি করবে বলে,

ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায়। চাঁদ উঠেছে, মায়াবী জোছনায় ভরে যায় অপেক্ষায় থাকা টিলা, বনানী, নদীগর্ভ এবার সত্যিই মনটাকে চুরি করে। রাতচরা পাখী কিংবা পেচকের ডাক, সাথে ঝিল্লিরবে হারিয়ে যায় গত ও অনাগত জীবনে। আবার ভাবে প্রকৃতি যা ভিখ্ দেয়, হিসেব না করে দুহাত ভরে, সেখানে মানুষ দেয় হিসেব করে। প্রকৃতির অকৃপণতা আমরা মনে রাখি না। কারণ মানুষ বড় স্বার্থপর। নিঃস্বার্থ ভিক্ষার মাঝে ঠাগুা মণির দলও যেন স্থির হয়ে আছে ঐ টিলার মতো, বনানরী মতো আর ওদের অন্তরের মাঝে স্নেহ ভালবাসার ভিক্ষার ফল্গু ধারা বয়ে যায় কংসাবতীর মত। কংসাবতী যেন ঠাগুামণির দল। এবছর হেমন্ত ধান ভাল হয়েছে, এক বিঘে জমিতে প্রায় পনেরো বস্তা ধান। কিন্তু খরচ নেই বললেই চলে। চা পান যা লেগেছ এর তার কাছে দু-দশ টাকা নিয়ে হয়েছে। মুনিবেরও খরচ নেই। খড় আড়াই কাহন সেটাও কিছু পয়সা দেবে। কালী পিসির জমি মোটামুটি বেশ আয়ও হবে। প্রণামী বাক্সও তিন হাজারের উপর। চাল হয়নি হয়নি করেও প্রায় তিন বস্তা। সুতরাং আট দশ হাজার টাকা হচ্ছে, এরপর গাঁয়ের চাঁদা। পূজো এবার জমবে ভালই। গাঁয়ের ছেলেরা একদিন যাত্রা করবে। পূজো আর পূজোর পর দিন সাঁওতাল নাচ শুধু খয়রাগোলের সাঁওতাল নয়, ওরা ওদের কুটুমদের খবর দেবে, যারা ভাল নাচতে গাইতে পারে। দু চারটে মিষ্টি ও মণিহারী দোকান বসবে। একটা নাগরদোলা আসবে। পূজো মেলার রূপ নেবে। লোকও এবার বেশী হবে। দুর্গা পূজো এবার নতুন বন্ধু রূপে যাদের পেয়েছে — যেমন রামপদ, হাবুঁ বাবু, চঞ্চলদের......আর নানা গাঁয়ের কিছু ভগড়ারর তিন ভাইয়েরা, মণিপুরের চার ভাইয়েরা, আবার সেই দুই জা, যার একজনের মাঝে সে দেখতে পায় মৃতা স্ত্রী জবাকে। আরতো ছিলই গত বছরের যারা এসেছিল তারাও। ভিক্ষায় গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসে, ওরা সকলেই আসবে। ভোলানাথের মা গোপালের মা বলেছে কোন চিন্তা নেই, গ্রীষ্মকাল কোনমতে হয়ে যাবে। তবে আগে অবশ্য গাঁয়ের রামচরণ খুঁড়ো, ভোলানাথেদের কাছে অগ্রিম পারমিশন করে নিয়েছে। তাছাড়া তো এবারে মা তো আছেনই। সকলেই খুশী বাইরের লোকে আসুক, দেখুক কেমন তাঁদের গাঁয়ের পূজো হয়। কালু ভাবে আনন্দ সকলে ভাগ করে নিক। দুটো গাঁয়ের লোক নতুন উদ্যমে কাজ করছে। খয়রা সোলের লোক বেশী যেন আরও আগ্রহী। এবছর গাঁয়ে ঝগড়াঝাঁটি নেই, রোগজ্বালা নেই, ফসলও ভাল — এসব মনে করে তারা মা কালীকে পূজো করার ফল। — উৎসাহ তাদেরই বেশী। পূজোর আগে থেকে দশ বারো হাজার পাতা তৈরী করেছে। আগে ভাগে একদিন এসে পূজো প্রাঙ্গন পরিষ্কার ও ন্যাতা টান দিয়ে গেছে। এরপর বলে, আমাদেরকে ওরা হারিয়ে দিচ্ছে। শশাদের মেয়েরা পর পর দুদিন দিয়ে গেছে। রতনরা ও মনাদের মহিলারাও এসেছে। এবারের পূজো প্রাঙ্গন আরও পরিস্কার আরও ঝকঝকে। এলেই মন বসে যায়। মন্দিরের চারপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে পরিষ্কার করে ন্যাতা দেওয়া হয়েছে। এবার মা নিজে থেকে উঁচু নিচু লেবেল করিয়েছে। গাঁয়ের লোক মা বলতে অজ্ঞান। মায়ের আর রবির পূজো নিয়ে কত চিন্তা — যেন চিন্তার শেষ নেই। দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল। গাঁ দুটোর সকল মানুষ দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গত বছরের মত ঠাকুর বিসর্জনে। আলোর রোশনাই কংসাবতী ও বনানীকে নতুন রূপে সাজিয়েছে। এবার

গেটে বসেছে হাঁতী গণেশ বাবাজীকে মালা পড়াচ্ছে। আর তো আছেই নানারকম আলোর কারসাজি। মাইকে মাইকে দুটো গাঁ আলোড়িত। দুটো গাঁয়ে মাইক লাগানো হয়েছে। আর পথের দুধারে রুল লাইট দিয়ে একদিকে যেমন যাতায়াতের সুবিধা হবে তেমনি সাজানো হবে। এবার নিমন্ত্রিত কুটুমও প্রায় দ্বিগুণ। সকলেই বলেছে একবছরে আরও হাজারের উপর ব্যবস্থা করতে হবে। কালীর নিমন্ত্রিত সকলেই এসেছে। কেউ গাড়ী চড়ে, কেউ হেঁটে, প্রায় সমস্ত সপরিবারে। একমাত্র কালুর নিমন্ত্রিতরা এখানেই খাবে। বুদোকুণ্ড ও মারোয়াড়ী পরিবার পূজোর বিকেলেই এসেছে। আরও নূতন এসেছে পানচূড়, ছরডাঙ্গা, পাথরডি, জেমরা পাড়া, হলুদ প্রনালী, রায়ডি......পার্শ্ববর্তী প্রায় সকল গাঁয়ের থেকে কেউ না কেউ এসেছে। এবার মারোয়াড়ী বুদোকুণ্ডু মহাশয়রা এসেছেন টাটা সুমোয়। সাথে কুণ্ডু মশায় একটা ছাগল। বদরী ভট্টাচার্য মহাশয়রাও এসেছেন। পূজোয় বসেছে, মাইকে মন্ত্র প্রচার চলছে। প্রতিধ্বনি শুধু মন্দিরের নয়, প্রতিধ্বনি গিয়ে পড়ে দুটো গ্রামে নদী প্রান্তরে ও বনানীতে। প্রাণবন্ত মনে হয় সবকিছু। বাইরের লোক যারা মন্দির প্রথম দেখলো সকলেই চমকিত হয়। পূজো শেষ, প্রসাদ বিতরণও শেষ। মেলার রূপ নিয়েছে। নাগরদোলা, বিভিন্ন দোকানে......। খুশীতে ফেটে পড়েছে দুটো গ্রাম। এবার পাঁঠা পড়েছে কুড়ির উপরে, একজন গুণে বললো বাইশটা। গাঁয়ের কুটুমে ও বহিরাগতের আগমনে নূতন মাত্রা পেয়েছে। পূজো শেষে দ্রিম দ্রিম ধামসায় সাঁওতাল নাচ শুরু হয়ে গেছে। সকলেই নিজেদের উজার করে দিচ্ছে কাজে, আনন্দে। এদিকে বন্দে তৈরী চলছে। বুদোকুণ্ডু মহাশয় সকলের উর্দ্ধে পরিচালনা করছে। এক ঝাঁক মহিলা পায়রার মতো বকম্ বকম্ করতে করতে তরকারী কুটছে। এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে কাশীপেল, গোপালের বৌ, আর আখামুটোর দিদি, ছায়া, বুদোকুণ্ডু মশায়ের স্ত্রী তরকারী কোটা শেষ হলে ওরা ফিরবে। আর একটা সুবিধা, মাতো আছেনই, এসেছে জবা রূপিণী দুই জা, চঞ্চলের ঠাকুমা সহ মেজ জেঠিমা, মা, কাকীমারা, ভোগড়ার পরিবার, যে সকল পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা আছে তারা সকলেই। ছেলেদের ভার বিভিন্ন কাজে। ডালডার গন্ধে বরে গিয়েছে চারদিক। হাবু বাবু ও রামপদবাবু ও বুদোবাবুর সাথে দেখভাল করছে। ভোলানাথ ও রামপদ খুঁড়ো, গোপালের কাকা, বাবা, বংশী, মুরালিরা শুধু দেখভাল করছে। পরিচালনা করেছ গাঁয়ের কৃষক ও ছেলেদের কাজের। কালু এবার জানায় আমি রামপদ খুড়ো ও ভোলানাথ বাবুদের অনুমতি নিয়েই বলছি — যারা দয়া করে এসেছেন গ্রামের বা বহিরাগত তারা সকলে যদি কাজের মধ্যে হাত লাগান তাহলে দেখবেন আরও আনন্দ পাবেন। নিয়মিত বহিরাগত পুরুষ ও মহিলারা হাত লাগিয়েছে। মহিলারা কুমড়ো, আলু কাটাচ্ছে, আর পুরুষেরা মিষ্টি তৈরী করতে আর সাহায্য করছে, এটাও বলা হোল, রাত ১ টার পর খিচুড়ি চাপবে। পুরুষেরা একটু সাহায্য করবে। গত বছরের যারা বহিরাগত ছিল তারা আরও বেশী উৎসাহে কাজে নেমে পড়েছে। রান্নার প্রধান হালুইকর জয়দেবও হাজির। তাদের সাথে গোপালের ঠাকুমা, ভোলানাথের মা, সাথে চঞ্চলের ঠাকুমার মতো গিন্নিরাও যোগ দিয়েছে, আটচালার শ্বেত পাথরের চাতালে। কালু কাকে বাদ দিয়ে কার সাথে কথা যে বলবে ভেবে পায় না। কখনও চোখে চোখে কথা হয় কখনও কথায় কথা হয়। এখানে আশ্রমের মায়ের সাথে পরিচয় হয়। যখন কারণ জানে তখন কালুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। প্রায় ১১টা বেজে গেল তরকারী কুটতে। এবার খাবার পালা,

সকলেই বসে পড়ে প্রায় শতাধিক। বিশেষ কালুর নিমন্ত্রিতরাও যারা তরকারী কাটা ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল তারাও খেতে বসেছে। জন চার পাঁচ লোক খেতে দিচ্ছে। কথায় কথায় বারোটাতেও খাওয়া হয় না। তৃপ্তিতে খেয়ে গাঁয়ের মহিলারা বাইরের সকল মহিলাদের নিয়ে গেল। টাটাসুমোতে রায়পুরের ওদের সাথে ভোলানাথের ঠাকুমা, গোপালের ঠাকুমার মতো বৃদ্ধারা গেল। এরই মধ্যে সকলে যে আপনার হয়ে গেছে। এমন ভাবে পরস্পরের সাথে কথা হচ্ছে যেন কতদিনের কথা। শেষ রাত পর্য্যন্ত সাঁওতাল নাচ চলেছে। সকালে ঠাণ্ডামণির দল সমস্ত প্রাঙ্গন ঝাঁট পাট ও ন্যাতা দিয়ে ওরা বাড়ী ফেরে। ওরাও কয়েকজন রাতে ভাত খেয়েছিল। সবাই নয়। বাইশটা ছাগলের মাংস ছাগলের মাংস তৈরী হয়। বুদো বাবু নির্দেশে জয়দেব ভাল করে কষে কম ঝোলে রান্না করে কুমড়ো তরকারীর সাথে মিশিয়ে দেয়। এখানে যারা ছিল সকালে তাদের মুড়ি খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। রান্না প্রায় শেষ। বারোটায় খাওয়া শুরু হয় শেষ হয় প্রায় চারটা হবে। আবার লুচির জন্য রেডি হতে হবে। কর্মীর অভাব নেই। পুরুষ মহিলা সকলেই। মা কালীকে খিচুড়ি তরকারী দিয়ে পূজো সারা হতে, খাওয়া শুরু হয়। গতবারের মত মহিলারাই পরিবেশন করবে। বহিরাগত কয়েকজন হাত লাগিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে কয়েকজন মহিলাকে খেয়ে নিতে, কারণ তাদের বসতে হবে লুচি বেলতে। সকলেই রান্নার প্রশংসা করে। বিশেষ করে তরকারীর। বাইশটা ছাগলের মাংসে কুমড়োর তরকারী ভাল না হয়ে পারে এরকম মাংসের তরকারী। ব্যাচের পর আসছে খাচ্ছে, যাচ্ছে, ভোজন দেখছে। দুগাঁয়ের লোক খাচ্ছে। আজ কারও বাড়ীতে রান্না হবে না। মহিলারা অসীম আনন্দে পরিবেশন করছে। কালীপিসি, গোপালের মা আরও কয়েকজন তদাকরি করছে। লাইন ভাগ করে খেতে দিচ্ছে কয়েকজন। বৌঝিরাই বেশী, এবছর বহিরাগত বেশ কিছু লেগে গেছে বুদো কুণ্ডু মহাশয়ের স্ত্রী আছেন, দিদি আছেন, জবারা দুজায়ে, চঞ্চললের মেজো জেঠিমা কত নাম আর বলবো, ভোলানাথের, গোপালের ঠাকুমা, চঞ্চলের ঠাকুমা ও অন্যান্য বৃদ্ধারা আটচালায় বসে দুচোখ ভরে ভোজন দর্শন করছে। মহিলারা কলকাকলিতে ভরিয়ে দিচ্ছে পরিবেশন। ভোলানাথেরা দেখভালে ব্যস্ত, রামচন্দ্রবাবু ও হাবু বাবুরাও দেখভাল করছে কুণ্ডু মহাশয়ের সাথে। পরিবেশনকারী মহিলারাই পাতা পরিস্কার করে ঝাট পাট দিচ্ছে মহানন্দে। শেষ ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে। অমল রিপোর্ট দিল পাঁচ হাজার তিনশত মতো খেয়েছে। পরিবেশনকারীরাও পাচকেরা বসেছে। তার সাথে মাড়োয়ারী মহিলা অন্যান্যেরা। কি আনন্দ স্ফুর্তি করেই না খাচ্ছে ওরা, হাবু ও রামপদবাবুরাও ভীষণ পুলকিত। সকলেই যেন আপন হয়ে গেছে কাজের মাঝে। বুদোকুণ্ডুকে লক্ষ্য করে বলে, —আজ যাচ্ছি না এতো আনন্দ ছেড়ে বাড়ীতে গিয়ে কি করবো।

বুদোকুণ্ডুর স্ত্রী—আমিও যাচ্ছি না। কাল সকালে যাব সবাই একসাথে সব গাঁয়ের বহিরাগতরা। সত্যিইতো এতো আনন্দ ছেড়ে যাবই না।

রামচরণ খুড়ো—মহাভাগ্যি আমাদের।

ভোলানাথ— এটা নিজেদের করে নিতে পেরেছেন জেনে কি যে আনন্দ হচ্ছে আমাদের।

মুরালি— দেখুন, আমাদের গাঁয়ের পরম সৌভাগ্য। সত্যি কালুভাই ম্যাজিক জানে, মনে হচ্ছে যেন আমরা সকলেই একটা পরিবারের।

একজন শেষে বলে—সকলেই থাকবেন দরকার হলে আমরা চাঁদা করে আপনাদের সেবা নেব।

মহিলারা — হৈ হৈ করে—সাপোর্ট করে। স্থির হয় আগামী কাল দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ী ফিরবে বহিরাগতরা। আর যারা পরিবেশন কারিনীরা ব্যবস্থাপনায় সকলে। ওরা অনুরোধ করে জয়দেব অন্য সব পাচকেদের। ওরাও রাজী। খেয়ে দেয়ে ওরা নদীর ধার দিকে গেল। সেখানেই চাঁদা ফেলা হোল, মেনু করা হোল, মাছ ভাত একটা তরকারী, চাটনি। সকালে মুড়ি তেলেভাজা। বংশী ও মুরালিরা ওদেরকে উৎসাহ দেয় কয়েকজন। কয়েকজন লুচি বেলতে গেছে, রাতে আলোয় আলোময়। সাঁওতাল নাচ শুরু হয়েছে। রাতের পূজো শীতল সন্ধ্যারতি হচ্ছে। গোটা গা ভেঙ্গে এসেছে। কালু খোল করতাল অজনাবাদ্যে নাচের ভঙ্গিমায় আরতি করছে তন্ময় হয়ে। রাত আটটায় পরিবেশন শুরু হয়। এবারও মহিলারা পরিবেশন করছে। লোকে লুচি তরকারী বন্দে দম ভরে খাচ্ছে। দুটোগাঁয়ের আত্মীয় সজনেরা অবাক হয়ে দেখছে কর্মকাণ্ড। শশা শেষ ব্যাচে বেয়াইকে নিয়ে বসেছে। গতবারের মতো বেয়াইকে বেকায়দায় ফেলতে দায়। কিন্তু বেয়াই সতর্ক। অবশেষে শেষ হয়। শেষ ব্যাচে পরিবেশন কারীনিরা ও পাচকবৃন্দ। ভোলানাথ পটুদের জিজ্ঞাসা করে কিরে সব কুটুম খেয়েছে। কি বলছে ওরা। পটু বলে এসব দেখে চোখ ছানা বড়া।

আজও সারা রাত ধরে নাচ চলবে। লুচি, বন্দে বেড়েছে প্রচুর। গতবারের মতোই বিলিয়ে দেওয়া হোল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারা হোল মহিলাদের তদারকিতে। বহিরাগত সকলকে অনুরোধ করা হোল যাত্রা দেখে আগামীকাল। কিছু থেকে যায়। কিছু চলে যায়। যাদের না গেলে চলবে না তারাই গেল। মারোয়াড়ী মহিলা চলে গেল। এবার শীতলের সময় দুটো পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে গেছে। যাত্রা শেষ, পুজোও শেষ। দুই গাঁয়ের মানুষেরা আবার অগামী বছরের বছরের অপেক্ষায় থাকবে। মনে হয় যেন এরা এই দিনগুলোর জন্য বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষ্য। ঠাণ্ডামণিরাও কম আনন্দ পায়নি নাচে গানে। ঠাণ্ডামণি দ্বিতীয় দিনে কালুকে ডেকে নিয়ে নাচ দেখিয়েছিল। কালু নিজে থেকে না যাওয়াতে ওদের কি রাগ। রাগ মেটাতে গিয়েছিল রাত বারোটার পর। সত্যিই সুরে, বাজনায় ছন্দ আছে সকলেই বলবে। কিন্তু ওদের শরীরেই যে ছন্দ আছে, যা দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হ্যালোজেন আলোয় ওদেরকে ইন্দ্রপুরীর মেনকা রম্ভা মনে হয়। কালুর দেখাদেখি অনেকেই এসেছে, সকলেই তারিফ করছে। দুটো দলের নাচ হচ্ছে। পটুকে বলা হোল, তোমাদের ও কুটুমদের দলের মধ্যে যাদেরটা ভাল হবে, তাদেরকে একশ টাকার পুরষ্কার দেওয়া হবে। বুদোকুণ্ডু, হাবুবাবু, রামপদবাবু বিচারক। বিচারে ঠাণ্ডমণিরা জিতে যায়। কারণ এরা তো এক গাঁয়ের। আর কুটুমরা তো বিভিন্ন গাঁয়ের। যদিও উনিশ বিশ। রামপদ খুড়ো জানায় যারা পারলো না প্রথম হতে যদিও দুই দলই প্রায় সমান সমান তারা তাদেরকেও একশ টাকার পুরষ্কার দেবে। ওরাও ভীষণ খুশী। যাত্রা উৎসব সব শেষ। এখনও নাগরদোলা ও কয়েকটা দোকান আছে। বিকেলে বহু লোক আসে নাগরদোলা চড়তে ও মণিহারী জিনিষ কিনতে। এখনও রেশ চলছে। ঠাণ্ডামণিরা প্রতিদিন পরে আসে, কালুর সাথে দেখা না করে বাড়ী ফেরে না। একদিন দোকান নাগরদোলা উঠে গেল। উৎসব একেবারে শেষ। মন্দির

প্রান্তরে মরুর নীরবতা আনে। নিয়মিত ভিক্ষায় যায়। কাছে পিঠের সব গ্রামেতেই। আজ একটা নতুন গাঁয়ে যায়। নাম পানচূড়। এই গাঁয়ের শিক্ষিতের হার খুব বেশী। ছোট গাঁ। হাজার খানেক লোক মেরে কেটে। কিন্তু নয় নয় করে গোটা দশ ডাক্তার আছেন বেশ নামকরা। কিন্তু হলে কি হবে, গাঁয়ে কেউ থাকে না। বাবা মারা সবই প্রায় দেশের বাড়ীতে। জমি জমা, বাড়ী নিয়ে ভুলে আছেন নিজেদের। ভাল লাগে তার ঠাকুর খেলা। সেখানে চৈতন্য দেবের ও জগন্নাথের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরও মনোরম। এখানের দেবতা ভক্ত মানুষকেও ভাল লাগে বেশ ঈশ্বরের নাম গান নিয়ে আছে। একটা ঘটনা গাঁয়ে আলোড়ন তুলেছে। এক মা তার সন্তানদের মেরে নিজেও মরতে চেয়েছিল, পারেনি মহিলা নিজে মরতে। মরেছে সন্তানেরা। বাবা, দাদু, ঠাকুমার অর্ন্তজ্বালা কে বুঝবে? মহিলা পাগল হলে কিছু বলার নেই। আর পাগলই যদি হয় তবে সংসার করা কেন? মা হয়ে সন্তানকে মারে কোন কারণে। সত্যিই মানুষগুলো যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। এইতো সেদিন পেপারে দেখলো বাঁকুড়া জেলায় কোতলাপুরের কোয়াল পাড়ায় বাবা মাকে বিয়ের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে তিন বোন নিজেরা আত্মঘাতী হয়। মুখে বড় বড় কথা, পণপ্রথার অভিশাপ, আর তারাই পণপ্রথা নেয় সকলের সামনে। কাগজে বের হচ্ছে নিউক্লিয়ার সংসার হার্টের অসুখের একটা কারণ। সমাজ ও রাজনীতি যা চলছে কোথায় পৌঁছুবে কে জানে? পেপারে ধর্ষণের হাজার গণ্ডা খবর। বোধ হয় আমরাই দায় টি.ভি., সিনেমা, সংবাদ মাধ্যম। মহিলারা যত কম পোশাকে টাইট সোজ্জা করবে ততই আধুনিক ও সভ্য। সবাই যেন গড্ডলিকা প্রবাহে চলেছে। সন্তান মা বাবাকে হত্যা করবে। মা বাবা সন্তানকে। ভাই ভাইকে। স্বামী স্ত্রীকে। স্ত্রী স্বামীকে। মানুষ নির্দয় হয়ে যাচ্ছে। কিসে সুখ আর কিসে শান্তি বোঝাই যায় না। বড় হওয়ার লম্বা দৌড়। বড় নয় ধনী হওয়ার। প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা । এই যেমন গাঁয়ের লোক এক বাড়ীর এক বৌকে বলে আজ বড় গিন্নী ছটা কাপ ডিশ্ কিনেছে অমনি ছোট গিন্নী বারোটা কাপ ডিশ্ কিনে ফেললো। যদি ছোট গিন্নী দুটো বিছানার চাদর কিনেছে জানে তাহলে বড় গিন্নী কম করে চারটে চাদর কিনবেই। ভাইয়ের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, দাদা চেষ্টা করে ছেলেকে কিভাবে ডাক্তার তৈরী করবে। ইঁদুর দৌড়ে শিশুরা প্রাণহীন রোবটে পরিণত হচ্ছে বলেই। শিক্ষিত সন্তানেরা মা বাবাকে ভাত দিতে কাতর। ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফেরার পথে, বাঁশকোপার হরি মন্দির নজর কাড়ে, এখন বন্ধ। বেশ কয়েকটা সিঁড়ির উপর মূল মন্দির। অদ্ভুত লাগে। জমিদারী গেছে। মন্দিরও ভেঙ্গে যাবার পথে। কিন্তু মন্দিরের গঠন শৈলী টানে মনকে। ঘুরতি পথে হাজার চিন্তা। কাছাকাছি একটা গাঁয়ে ঘরে চাবি দিয়ে আগুন লাগানোর রাজনৈতিক ঘটনা পীড়া দেয়। রাজনীতি তো আরও জঘন্য। শুধু রাজনীতির দলের নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাডার খুনোখুনি করে মরছে, আর উচ্চ পদে আসীন নেতারা এক টেবিলে বসে পানীয় নিয়ে দিব্যি আছে। মাথায় বেল ভেঙ্গে চলেছে। ঠোকানোই এখন মূল মন্ত্র রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বস্তরের। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে মানুষকে, সমাজকে, রাজনীতিকে একটু একটু করে চিনেছে। ততই যেন কেমন মনে হয়! এর পরিণাম যে ভয়ানক। সেটা সে অনুভব করে। যেমন সে অনুভব করে নিজের মায়ের কথা , আশ্রমের মায়ের কথা ভেবে। তার মাও কিনা দুমুঠো অন্নের কাঙাল। মাথায় আসছে যাচ্ছে যদি

মাকে আনা যায়। ভাবে ভাবে কখনও কখনও দাদারা নিশ্চয়ই মাকে কাঁদাচ্ছে না, জগৎকে বৃহৎ করে ভাবলে, সকলেই তো পরমাত্মীয়, ভাবলে সকলেই নিজের, এই আশ্রমের মাকে তো নিজের মা বলেই মনে হয়। যদি সকলে এরকম ভাবতে পারতো। মনটা ভাল নেই, পূজোয় জনারণ্যে থেকে এখন যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মনটাও যেন কেমন। এখনও অনেক বেলা আছে, টর্চ নিয়ে বের হয়, ঠাণ্ডামণিদের গাঁয়ের মাঝ দিয়ে, পটুকে ডেকে নেয়। পটু রাজী হয়। বাঁশী নেয়। একটা লাঠিও নেয়। ওখানে জন্তু জানোয়ারের পাল্লায় কোন সময়ে পড়তে পারে। এখন পলাস শিমুল লালে লাল, সরু পথ বেয়ে দুজনে হাঁটতে থাকে। অজানা ফুলের সুবাসে বাতাস আমোদিত। তরু বীথির সুশীতল ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছে যায়। মুখে হাতে জল নিয়ে বসে সেই দিনের সেই গাছটায়, শালগাছে নূতন কচি কচি পাতা আসছে। পাতাগুলো যেন শিশুদের চোখে অবাক হয়ে অবাক পৃথিবীকে দেখছে। বাতাসে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগে বাঁধের জল সবসময় ভর্ত্তি। কারণ পাহাড়ের বা টিলার একটা ঝর্ণা পড়েছে বাঁধে আর বাঁধ উপচে পাথরের উপর বেয়ে ঝর্ণায় আবার গিয়েছে — ঝর্ণাটা পূর্ব ধারে। জলে সাপলা শালুকের সমারোহ। কাজল কালো জল। নানা পাখীর ডাক। শাল, মহুয়া, পিয়াল জলের উপর ঝুঁকে জলের উপর ছায়া ফেলে কাজল কালো জল আরো কালো। দুটো রঙিন পশালের আর শিমূলের প্রতিবিম্ব। সামান্য হাওয়া ঢেউয়ে আরও সুন্দর লাগে। শালুক, সাপলার সমাবেশ। পানকৌড়ি, দলপিপি, ডাহুকের সন্তরণ বেশ ভাল লাগে। তারপর পটু আদিম সুরে বাঁশীতে টান দিয়েছে। এখানের সবকিছু স্বতফুর্ত্ত স্বাভাবিক, নৈসর্গিক......। বড় সুন্দর লাগে পরিবেশ — সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়। শাল পিয়াল কুঞ্জেও ...... বাঁশীর সুরে সে আজ অন্য জগতের বাসিন্দা। অনেকক্ষণ বসে থাকে। প্রথম দিনের ঘটনাগুলো ভাবতে থাকে। ঠাণ্ডা মণিরা একে একে বস্ত্রহীন করে নিজেদের। শরীরে গঠণ যেন এক একটি ভেনাস মূর্ত্তি। সেই জলপরীদের সন্তরণ কি ভোলা যায়। সোনালী সন্ধ্যায়। পটু তাগাদা দেয় ফিরতে ও জানায় জায়গাটা ভাল নয়। কত রকমের জানোয়ার আসতে পারে। তাছাড়া ওদের এক দেবতাও আছে। উঠতে মন চায় না। দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে সিঁদুরে রাঙা মেঘের অপূর্ব জলছবি অপূর্ব মনে হয় কাজল কালো জলে। বাঁশীর সুরের মূর্ছনায় জল, স্থল, অন্তরীক্ষ যেন বিমোহিত। উঠতে মন চায় না। এদিকে আবার পঞ্চমী কি যষ্ঠীর রূপালী চাঁদ দেখা যায় আকাশে। চাঁদের ম্লান ছবিও জলে। বাধ্য হয়েই উঠতে হয় তাগাদায়। কোন কথা নেই। প্রকৃতি যেন বোবা করে দেয়। বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে পটু। সুরের মূর্ছনায় অবগাহন করতে করতে ফিরে আসে। খাড়তায় একটা টেলিফোন গাইড দেখে বের করায় গাঁয়ের একজনের নাম্বার, কোন করায়। ফোনে জানতে পারে পিসিমা, দাদারা কালই আসছে। মাও তার আসার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। খুব ব্যাথ পেয়েছিল, দুদিন কিছু খায়নি, কাউকে কিছু বলেওনি। শুধু পড়েছিল বিছানায়। আস্তে আস্তে মাতৃ বিয়োগ ব্যাথা ভুলতে থাকে। এই মায়ের স্নেহের স্পর্শে। এক এক সময় মায়ের মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী মনে হয় নিজেকে। তাই সে এই মাকে আরও স্নেহ যত্নে ভরিয়ে দেয়। এই মায়ের মাঝেই মাকে খুঁজে পায়। ব্যথা আস্তে আস্তে ভুলতে থাকে। এমনি করে দিন যায় মাস যায় বছর যায়। ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে। ভিক্ষার সাথে পূজো, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার স্নেহ ভিক্ষা নিতে নিতে কখন

যে পনেরোটা বছর পার হয়ে যায় বুঝতেই পারেনি। গোপালের ঠাকুমা গত হয়েছেন, গত হয়েছে কিংকর খুড়ো, নিতাই খুড়ো, রমাচরণ খুড়োরা......মনে হয় তাদের আত্মা যেন এই শ্মশানের প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়ায়। ওরা বলে, আমরা আছি ভয়কি, তুমি যেমন আছ, তেমনিই থাকো এগিয়ে যাও। পরের কাছে যেমন ভিখ নাও তেমনি ভিক্ষার পরিবর্তে ভালবাসা দিয়ে জ্ঞান দিয়ে তুমি সকলের উপকার করে যাও। তুমি শত শত মা, বোন, ভাই, বাবা, সন্তান পেয়েছো এটা কি কম কথা। পরের মাকে মা, পরকে আপন করতে কিছু দিতেও হয়। তুমি সেদিক থেকে রাজ ভিখারী, ভিখারী শ্রেষ্ঠ। তোমার চোখে বৃহৎ সমাজের স্বপ্ন তাইতো তুমি জ্ঞান ভিক্ষা দিয়ে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ মিটিয়ে ভাঙ্গা হাঁড়ি গোটা কর। মানুষে মানুষে ভালবাসতে শেখাও, পরের মাকে মা বলতে শেখাও। তুমিতো দাদার আসনে — সমাজের সংসারের, গাঁয়ের ভাল করার জন্য তুমি জ্ঞান ভিক্ষা দাও, সেটা কি কম। ভিখারীরা শুধু নিয়েই যায় না দিয়েও যায়। কি পেলুম, আর কি দিলুম দেনা-পাওনা, লাভ-ক্ষতির হিসেব পুরোপুরি মেলে না। গরমিল থেকেই যায়। তাই বলি, তোমার মত এমন যদি ভিখারী হতে পারতুম, তাহলে আমরা আনন্দে ধন্য হতুম। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সেদিন গা এলিয়ে দেয় সেই বেঞ্চটায়। মনে পড়ে যায় রামচরণ খুড়োদের আত্মার বাণী অন্তরের মাঝে শুনেছিল যেদিন, সেই বাণী যখন তখন মনে পড়ে যায়। পূব দিকটা পরিষ্কার হতে থাকে, নদীর ওপারে সামনের টিলাটা জাগতে থাকে। বন্য প্রকৃতি জেগে উঠেছে, জেগে উঠেছে নদী প্রান্তর ও নদী জলে ঝিল মিল দেখা যায় রূপালী চাঁদের উদয়ে। কোকিলের কুহু তানে ঝিল্লী রবের সাথে মৃদু মন্দ দখিনা বাতাস শাল মহুয়ার মাতাল হাওয়ার সুবাস। প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জীবনের পদচারণা করে। ফেলে আসা অতীত স্বপ্ন হয়ে যায়। শৈশব, কৈশোর, দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি সংসার জীবনের মা বাবার ভালবাসা, ভাইদের ভালবাসায় বোকা ঝকার ও আত্মীয়দের স্মৃতিও মনকে আলোড়িত করে। আবার ভিক্ষুক জীবনের স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, প্রীতি নাড়া দেয়......। কখনও সন্তান সম চঞ্চল, কখন অন্নপ্রাশনের রাহুল পিতৃহৃদয় ভরিয়ে দেয়, গিন্নী কর্তাদের স্নেহ ভালবাসা সন্তান হৃদয় দেয় ভরিয়ে, আবার ঠাণ্ডামণির ভালো লাগার মানুষের দুহাত ভরে নিঃশর্ত প্রেমে প্রেমিক হৃদয় ভরে যায়, আর এই অকৃত্রিম আকাশ, বাতাস, এই নদী প্রান্তর, গোড়াবাড়ীর সাগর বেলা, ভালুকা বাঁধের কাজল কালো জল, আর এই শ্মশান মন্দির আর এক কংসাবতীর ভালবাসা, নীল শৈল সারির হাতছানি কি দেয়নি ভিখারী জীবনে। তাই কালুর মনে হয়, আবার আসিব ফিরে, এই কংসাবতীর তীরে এই মন্দিরে, এই নীড়ে এই মায়ের ক্রোড়ে, যুগ ধরে, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। মা কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, কালু শোবে চল্ অনেক রাত হোল, হিম পড়ছে। কংসাবতীর তীরে কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এই মায়ের স্নেহ সুধায় অবগাহনে ধন্য মন আবার বলে ওঠে আবার আসিব ফিরে, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে, এই কংসাবতীর তীরে, এই শ্মশান বটছায়ে এই মায়ের কোলে। সাধ জাগে শুধু পরের জন্মে নয়, জন্ম জন্মান্তরে হইব ভিখারী।

— o —